প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

দ্বাদশ বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জুলাই-সেপ্টেম্বর

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, *প্রথম আলো*

নির্বাহী সম্পাদক
ফারুক ওয়াসিফ

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, *প্রথম আলো*

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ১০০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
July-September Issue, 2022; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 100 Taka
Prothom Alo Bhaban, 19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81, 09613113366

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

রাজনীতি

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতার এক দশক ৯
বার্ট স্যুকেন্স ও আইনুল ইসলাম

সাক্ষাৎকার

রাজনৈতিক বন্দোবস্ত না বুঝলে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ২৩
ড. মুশতাক হুসাইন খান

অর্থনীতি

বাংলাদেশে উঠতি মধ্যবিত্তের বিকাশ এবং স্থানীয় শিল্পায়নের সম্ভাবনা ৪৯
মাহা মির্জা

আন্তর্জাতিক

ইউক্রেন যুদ্ধের জরায়ু ৬৭
টনি উড

ইতিহাস

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং বাংলাদেশে 'দালাল'দের বিচার : একটি পর্যালোচনা ৮৯
মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান

সাহিত্য

স্বপ্নকথা, রাইনের সোনা ও রক্তকরবীর যক্ষপুরী : ধনতন্ত্র ও তিন জাদুর জগৎ ১১১
এস আমিনুল ইসলাম

বইআলোচনা

মুক্তিযুদ্ধের দিকে বিশ্বের 'ভালোবাসায় বাড়ানো হাত' ১৩১
রওশন জামিল

মধ্যবিত্তের দুই চরিত্র, স্বৈরতন্ত্রের রাজনীতি ও ব্রিন রোজেনফেল্ডের অটোক্রেটিক মিডল ক্লাস ১৩৯
সামজীর আহমেদ

দলিলপত্র

জেনারেল নিয়াজি ও শ্যাম মানেকশর বার্তা বিনিময় ১৪৫

পত্রিকা আর সংকলনের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য আছে। পত্রিকাকে নিয়মিত হতে হয়। সময়ের দাবি মেটানোর দায়িত্ব রয়েছে তার। সংকলন নিয়মিত না-ও হতে পারে। কোভিড-১৯ দুর্যোগের প্রভাব কাটিয়ে গত সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা* আবার নিয়মিত হওয়া শুরু করেছে। মিটিয়ে চলেছে বর্তমান সময়ের বিশ্লেষণ হাজির করার চাহিদা। জাতীয় জীবন বিশ্লেষণ করে যাচ্ছে বলেই *প্রতিচিন্তার* প্রয়োজন থাকছে।

জাতীয় নির্বাচন আসন্ন, সংঘাতের আশঙ্কাও আসন্ন। ক্ষমতার বিন্যাস বদলায়, বদলায় সহিংসতার ব্যাকরণও। বাংলাদেশের ইতিহাস দেখায়, নির্বাচনের বছর সহিংসতার পারদ চড়ে যাওয়ারও বছর। যে দেশে ভিন্নমত ও বিবাদের মীমাংসার ব্যবস্থা যত পক্ষপাতমূলক, সেই দেশের রাজনীতি ততটাই সহিংস। জনমত, যুক্তি বা সামষ্ঠিক স্বার্থ নয়, এই রাজনীতি বলপ্রয়োগের ক্ষমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বলপ্রয়োগের চর্চায় সরকারি সংস্থাগুলো একচেটিয়া নয়, বিরোধী দলেরও রয়েছে সহিংসতার ইতিহাস। নিকট ইতিহাসে ২০০২ থেকে ২০১৩ সাল এবং ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল রাজনৈতিক সহিংসতার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি পর্ব। এই সময়ের ওপর জরিপভিত্তিক নিরপেক্ষ গবেষণা খুবই বিরল। এর মধ্যে বার্ট স্যুকেনস ও আইনুল ইসলামের গবেষণা তথ্য ও অন্তর্দৃষ্টিতে খুবই সমৃদ্ধ। প্রধান প্রধান দল, রাষ্ট্রীয় সংস্থা বনাম বিরোধীরা, গ্রাম-শহর, নির্বাচন ও জরুরি অবস্থা বিষয়ে অনেক প্রশ্নের জবাব দেয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতার খতিয়ান নামের গবেষণাপত্রটি।

পরিবর্তন অনেকেরই চাওয়া। তবে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার বিন্যাস কী অবস্থায় আছে, দাপুটে শক্তিগুলোর সত্যিকার চাওয়া কী; এসব না বুঝে পরিবর্তন আশা করা অবাস্তব। বাস্তবসম্মত নীতি ও কৌশলের অভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা বুমেরাংও হয়। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নামক ধারণাকাঠামোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া তাই দরকার। শুধু বাংলাদেশেই নয়, উন্নয়নশীল দেশের শিল্পায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন

এবং গণতন্ত্রায়ণের সংকট ব্যাখ্যা করায় দেশে-বিদেশে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের ধারণা প্রভাবশালী হচ্ছে। এই চিন্তার উদ্ভাবক অর্থনীতিবিদ মুশতাক খানের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়ে জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে এই সংখ্যায়। বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ব্যাখ্যায় কাজে আসবে সাক্ষাৎকারটি।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধকে এ-যাবৎ পরাশক্তিগুলোর ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা হিসেবেই দেখা হয়েছে। কিন্তু সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস এবং ইউক্রেনের ভেতরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপড়েনও যে যুদ্ধটিকে অনিবার্য করে তুলেছিল, সেই মূল্যায়ন আছে 'ইউক্রেন যুদ্ধের জরায়ু' প্রবন্ধে। এই যুদ্ধে ইউক্রেন আক্রান্ত হলেও ভুক্তভোগী সারা বিশ্ব। লেখক টনি উড দেখিয়েছেন, কারও হাতই পরিষ্কার নয়। সোভিয়েত-পরবর্তী যুগে রাশিয়ার পুনরুত্থান তার চারপাশে যে ভূরাজনৈতিক ভূমিকম্প ঘটিয়ে চলেছে, তারও কার্যকারণ এখানে খোঁজা হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈষম্য কমানোয় শিল্পায়নই মূল পথ বলে স্বীকৃত। বিশ্বায়নের ধারণা বলছে, শিল্পায়ন হতে হবে রপ্তানিমুখী। কিন্তু অর্থনীতি-গবেষক মাহা মির্জা বলছেন, স্থানীয় শিল্পায়নভিত্তিক কর্মসংস্থান ছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ হবে কীভাবে? বাংলাদেশের উন্নয়নের নীতির গুরুতর একটা ফাঁক হলো, এই নীতির মধ্যে শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্তের অস্তিত্বটা ভুলে থাকা হয়। অর্থনীতির তত্ত্বের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান ও সর্বজনের স্বার্থ মেলানো আলোচনা যেখানে বিরল, সেখানে মাহা মির্জার প্রবন্ধটি সমস্যা ও সম্ভাবনাকে একসঙ্গেই ধরতে চেয়েছে।

জাতীয়তাবাদ এবং উন্নয়নের বয়ানের লক্ষ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি আবার তাদের দ্বারাই এসব বয়ান চাঙা থাকে। গণতন্ত্রের সংগ্রামের সামনের সারিতেও মধ্যবিত্তকেই আশা করা হয়। কিন্তু এই শ্রেণির মধ্যেও রয়েছে দুটি বিপরীত ধারা। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্রীয় চাকরি ও পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া মধ্যবিত্তকে দেখা যায় কর্তৃত্ববাদের পক্ষে দাঁড়াতে। তাদের একটু নিচেই মেলে মধ্যবিত্তের ছোট তরফটিকে, যারা জীবনমানের উন্নতি ও অধিকারের জন্য সোচ্চার। গণতন্ত্রের ডাকে সাধারণত এরাই সাড়া দেয়। ব্রিন রোজেনফিল্ডের 'দ্য অটোক্র্যাটিক মিডল ক্লাস' বই ধরে মধ্যবিত্তের এই দুই চেহারা নিয়ে আলোচনা তুলেছেন সামজীর আহমেদ।

গত শতকে ছিল আধুনিকতার জয়জয়কার। অথচ বিশ শতকের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে হুঁশিয়ার করেছিলেন যে এই যান্ত্রিক প্রগতি নির্দয় ও অন্ধ। এমনকি চূড়ান্ত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য যেখানে জমা হচ্ছে, ধনতন্ত্রের সেই যক্ষপুরীতেও আলো নেই, প্রেম নেই। এমনকি যক্ষপুরীর রাজা যিনি, তিনিও আত্মাহীনতার যন্ত্রণায় কাতর। রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী নাটক *রাজা* কিংবা *রক্তকরবী*তে দেখা যায় এরই হুতাশন। *রক্তকরবীর* চেতনা কি আধুনিক, পাশ্চাত্যমনা? নাকি এই নাটকে ধনতান্ত্রিক পশ্চিমা বিশ্বের লোভ ও আত্মাহীন যান্ত্রিকতার বাইরে উত্তরাধুনিক দিশা খোঁজা

হয়েছে? জার্মান নাট্যকার স্ট্রিন্ডবার্গের *আ ড্রিম প্লে* এবং জার্মান গীতগুরু ভাগনারের *দ্য রিং অপেরা*র সমান্তরালে রেখে *রক্তকরবী*কে বিচার করেছেন সমাজবিজ্ঞানী ও সাহিত্যতাত্ত্বিক এস আমিনুল ইসলাম। *রক্তকরবী*র মর্মে তিনি দেখতে পান ধনতন্ত্রের বিপরীতে বহমান প্রেম ও প্রকৃতির মুক্তির ডাক।

সময়ের এসব জ্বলন্ত প্রশ্নগুলো মানুষের ভাবনায় বিঁধে আছে। মানবিক দেশ, সমাজ ও পৃথিবীর ডাক তো বহুদিন বেজে চলছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকেও উঠেছে এই ডাক এবং বিশ্ব তা শুনেছে ও সাড়া দিয়েছে। এই আলোড়ন বাংলাদেশের পাশে টেনে এনেছিল গত শতকের ষাটের দশকের সেরা সব শিল্পী, লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবী এবং মানবতার মহান মনীষীদের। বাংলাদেশের গণহত্যা থামানো এবং মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পক্ষে শুধু 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'ই নয়, আরও অনেক তৎপরতা এক করেছিল সে সময়ের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদীদের। রাজনীতি ও দেশের সীমানা পেরোনো সেসব মানুষ কীভাবে 'বিশ্বমানবতা' নামের ধারণাটিকে হৃদয়কাড়াভাবে বাস্তব করে তুলেছিলেন, সেই ইতিহাস বলে গেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সম্পাদক মতিউর রহমান তাঁর '*ভালোবাসায় বাড়ানো হাত*' বইটিতে। এই বইয়ের আলোচনা কেবল বাংলাদেশের যুগান্তকারী ইতিহাসের কথাই বলে না, অন্য এক পৃথিবীর স্বপ্নবান মানুষের আদলও মনের ভেতর ফুটিয়ে তোলে। রাজনৈতিক ইতিহাস আর শিল্পের রাজনৈতিকতা কীভাবে মিলে যায়, এই বইয়ের আলোচনায় সেটাই তুলে এনেছেন রওশন জামিল।

যুদ্ধ শেষ হলেও তার জের রয়ে যায়। ১৯৭২ সালের দালাল আইনে অভিযুক্তদের বিচার ও পরবর্তী সময়ে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার মধ্যে সেই থেকে যাওয়া জেরের জটিলতা দেখা যায়। এই আইন ও বিচারপ্রক্রিয়া নবীন রাষ্ট্র, তার রাজনৈতিক শ্রেণি, জনগণ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে জটিলতায় ফেলেছিল। নবীন বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব, প্রশাসন, আইনজীবী ও বিচারিক ব্যবস্থা এবং জনমত দালালদের বিচারকে কীভাবে দেখেছিল, রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কী রকম টানাপড়েনের সৃষ্টি হয়েছিল, সেসবের পর্যালোচনার জন্য পাওয়া গেছে ১৯৭২-৭৩ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দুটি প্রতিবেদন। অতীতে অনালোচিত প্রতিবেদন দুটির ওপর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারবিষয়ক গবেষক মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান।

খাতি রাজনীতি চিন্তা

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতার এক দশক

বার্ট স্যুকেন্স ও আইনুল ইসলাম

সারকথা

রাজনৈতিক সহিংসতা আদতে বলপ্রয়োগের রাজনীতিরই একটি ফল। যে দেশে ভিন্নমত ও বিবাদের মীমাংসার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যত দুর্বল বা পক্ষপাতমূলক, সেই দেশের রাজনীতি তত সহিংস হয়ে ওঠে। এটা বোঝায় যে জনমত, যুক্তি বা সমঝোতার ওপর নয়, এ রাজনীতি বলপ্রয়োগের ক্ষমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ বলপ্রয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্র বা সরকারি সংস্থাগুলোকে একচেটিয়া বলে দেখা যায় না। বিরোধী দলেরও থাকতে পারে বলপ্রয়োগ, হরতাল, সহিংসতার ক্ষমতা। বাংলাদেশের কাছে যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০০২ থেকে ২০১৩ সাল রাজনৈতিক সহিংসতার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি দশক। এ দশকে রাজনীতির সব ওলট-পালট বিপুল আকারে সহিংসতার জন্ম দিয়েছিল। তার জের এখনো চলমান। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ে জরিপভিত্তিক নিরপেক্ষ গবেষণা খুবই বিরল। এর মধ্যে বার্ট স্যুকেনস ও আইনুল ইসলামের গবেষণা তথ্য ও অন্তর্দৃষ্টিতে খুবই সমৃদ্ধ। প্রধান প্রধান দল, রাষ্ট্রীয় সংস্থা বনাম বিরোধীরা, গ্রাম-শহর, নির্বাচন ও জরুরি অবস্থার ওপর অনেক প্রশ্নের জবাব দেয় 'দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অব পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স ইন বাংলাদেশ' শিরোনামের দীর্ঘ গবেষণাপত্রটি। গবেষণায় উঠে আসা মূল অনুসন্ধানগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন **ইফতেখারুল ইসলাম**।

বাংলাদেশ এখন সেসব দেশের তালিকাভুক্ত, যেখানে রাজনৈতিক সহিংসতার ইতিহাস এখনো চলমান। এই সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে একটি দশক তুলে আনা কঠিন কাজ। আবার সেই দশকের সহিংসতার রূপ, প্রকরণ, মাত্রা ও ব্যাপ্তি বিচার করে রাজনৈতিক সহিংসতা সম্পর্কে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে আসাও যথাযথ হয় না। তবে এ থেকে সহিংসতা সম্পর্কে সাধারণ বিবরণ তৈরি করা যায়।

আমাদের এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতার সুদীর্ঘ সময়ের বহু উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া চারটি ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকা থেকে ২০০২ থেকে ২০১৩ সালের ১৪ হাজার ১৮৭টি রাজনৈতিক সহিংস ঘটনার ভিত্তিতে সহিংসতার কাল ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ঘটনাস্থল, মূল হোতাদের সম্পৃক্ততা এবং প্রাণঘাতী ও অপ্রাণঘাতী সহিংসতার কারণসহ অন্যান্য অন্তর্দৃষ্টি এখানে তুলে ধরা রয়েছে। ২০০২ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে রাজনৈতিক সহিংসতায় কম করে হলেও ১ লাখ ২৬ হাজার ৩০০ জন আহত এবং ২ হাজার ৪০০ জন নিহত হয়েছেন।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা নানা বর্ণে রঞ্জিত এক ঘটনা। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ এবং একে অপরিণত কিংবা অনৈতিক রাজনৈতিক শ্রেণির লক্ষণ বলেও বিবেচনা করা হয়। হরতালের (সাধারণ ধর্মঘট) ব্যাপকতা নিয়ে গণমাধ্যম ও ডোনারদের পক্ষ থেকে আক্ষেপ করা হয়ে আসছে যে এটা কেবল স্বাভাবিক রাজনীতিতে ভাঙন আনে না, অর্থনৈতিক উন্নয়নেও বাধা তৈরি করে।

এই প্রতিবেদন দেশের রাজনৈতিক সহিংসতার ব্যাপারে উল্লিখিত দৃষ্টিকোণগুলো সমর্থন কিংবা অস্বীকার কোনোটাই করে না। তবে এসব বিষয়ে আলোচনার জন্য অধিকতর স্পষ্ট পাটাতন এগিয়ে দিতে চায়। এই প্রতিবেদনে রাজনৈতিক সহিংসতা, সহিংসতার আঞ্চলিক বণ্টন, জড়িত কুশীলব এবং ২০০২ থেকে ২০১৩ সালের হরতালে সংঘটিত সহিংসতার বিশেষ ধরন বিষয়ে প্রাথমিক উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। তুলে ধরা সব উপাত্তে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা এবং তাতে হতাহতদের ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে। এর আগে ধারাবাহিকভাবে সংগৃহীত এ ধরনের প্রাথমিক তথ্য বিভিন্ন আলোচনা, সমালোচনা ও বিতর্কের মধ্যে উঠে আসেনি।

প্রতিবেদনের উপাত্তগুলো বাংলাদেশের রাজনীতির গণতান্ত্রিক ধারায় (১৯৯১ সাল থেকে) ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ে পরিচালিত একটি প্রকল্পের প্রাথমিক ধাপের ফলাফল মাত্র। উপাত্তগুলো ২০০২ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত চারটি পত্রিকার (*ডেইলি স্টার*, *ইনকিলাব*, *ইত্তেফাক* ও *প্রথম আলো*) সব প্রসঙ্গের খবর থেকে ছেঁকে নেওয়া হয়েছে।

উপাত্তগুলো অংশত ২০০৬ থেকে ২০১৩ সালের বড় ধরনের সহিংসতার পরিচিত বণ্টন এবং ২০০৭ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে সহিংসতার স্পষ্ট বিরতির ওপর আলোকপাত করেছে। একইভাবে দেখা

যায়, ১৫ শতাংশ সহিংস ঘটনা ও জখম নিয়ে ঢাকা বিভাগের যে প্রাধান্য দেখা যায়, তা প্রত্যাশিতও বটে। এসব সহিংস ও জখমের ঘটনা সহিংসতার ব্যাপকতাকে যথাযথভাবে দেখিয়ে দেয়। তবে মারাত্মক হতাহতের তথ্য দেখায় যে তীব্র সহিংসতার ঘটনাগুলো ভিন্নভাবে বণ্টিত। এক-চতুর্থাংশের বেশি মারাত্মক হতাহতের ঘটনা নিয়ে এ ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে আছে খুলনা বিভাগ।

অন্যদিকে বড় বড় শহরসহ জেলাগুলো, যেমন চট্টগ্রাম, রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ বা সিলেটও হতাহতের ঘটনায় বেশ এগিয়ে আছে। এসব উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতার প্রকৃতি বিচিত্র ধরনের। হতাহতের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে থাকা চট্টগ্রাম জেলায় সহিংসতার ঘটনা ও হতাহতের হার মাত্র ৫ শতাংশ। তা ছাড়া প্রাণঘাতী সহিংসতার ঘটনার দিক থেকে ঢাকা জেলায় হতাহতের হার ১০ শতাংশের কম। 'গ্রামীণ' পর্যায়ের জেলাগুলোর মধ্যে কুষ্টিয়া, পাবনা বা রাঙামাটিতে উচ্চ হারে হতাহতের ঘটনা ঘটে। যদিও সিটি করপোরেশনগুলোতে প্রায়ই দৃশ্যমান সহিংসতা ঘটলেও তা মূলত মোট ঘটে যাওয়া সহিংসতার মাত্র এক-চতুর্থাংশ এবং প্রাণহানির ঘটনার বেলায় তা ১৫ শতাংশের একটু কম। যাবতীয় সহিংসতার মধ্যে সিটি করপোরেশন আছে এমন জেলাগুলোর ভাগ আবার অনেক বেশি—৪০ শতাংশের ওপরে। এটা আবার এসব সহিংসতার কারণে ঘটা মোট প্রাণহানির ঘটনার ৩০ শতাংশের কম।

মূলত প্রধান রাজনৈতিক দল, যেমন আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং তাদের ছাত্র ও যুব শাখা সহিংসতায় আধিপত্য করে থাকে। জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সহায়ক সংগঠনগুলো রয়েছে এর পরের স্থানে। সহিংসতার ঘটনায় রাষ্ট্রীয় কর্তাব্যক্তিদের ভূমিকা নির্ধারক। প্রাণহানির ঘটনার ৫০ শতাংশেই তাঁরা জড়িত ছিলেন। (সাবেক) বিদ্রোহী দলগুলো সীমিতসংখ্যক ঘটনায় অংশ নিলেও এসব ঘটনার ধরন অত্যন্ত প্রাণঘাতী। এমন গুটিকয় ঘটনায় হতাহতের হার ছিল এক-চতুর্থাংশ। অনেকগুলো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে উপদলীয় বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যকার সহিংসতা।

হরতালের সহিংসতা থেকে আসে মোট সহিংসতা ও জখমের ঘটনার এক-চতুর্থাংশ। তবে এগুলো কিছুটা কম প্রাণঘাতী। কয়েক বছর ধরে হরতাল রাজনৈতিক সহিংসতার প্রধান ঘটনা হিসেবে জারি থেকেছে। ২০০৫ সালের

হরতালের ঘটনা মোট সহিংসতার ৩০ শতাংশের জন্ম দেয়। ২০০৪ সালে এই হার ছিল প্রায় ৪০ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে হরতালজনিত সহিংসতার হার ছিল মোট রাজনৈতিক সহিংসতার ৫০ শতাংশ। ২০০২ থেকে ২০১৩ সালের নথিবদ্ধ হরতাল-সংশ্লিষ্ট মোট ঘটনার অর্ধেকই ঘটেছে এই কালপর্বের শেষের বছরগুলোয়। প্রত্যাশিতভাবেই হরতালের প্রভাব প্রধান প্রধান শহরেই বেশি পড়ে। তাহলেও কিন্তু প্রাণহানির ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছিল সাতক্ষীরায়। বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা হরতালের ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন। এর মধ্যে সরকারি কুশীলবেরা জড়িত, এমন ৫০ শতাংশ ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর সংশ্লিষ্টতা ছিল। যেখানে প্রাণঘাতী ঘটনায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম বলে নথিবদ্ধ, সেখানে অর্ধেকের বেশি মারাত্মক জখমের ঘটনায় জামায়াতে ইসলামী জড়িত ছিল। হরতালকালীন ৭৫ শতাংশের বেশি হতাহতের ঘটনায় রাষ্ট্রীয় কর্তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

২০১৩ সালে সহিংসতার পরিমাণ ছিল লক্ষ করার মতো। এ বছর ৩০ হাজার হতাহত হয় এবং এর মধ্যে ৭৫০টির বেশি প্রাণঘাতী ঘটনাও আছে। যেমন সাতক্ষীরার মতো জেলায় সহিংসতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি সহিংসতার বিদ্যমান ধারাটিও এই বছরে আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। ২০১৩ সালের আগে, সহিংসতার ঘটনায় আওয়ামী লীগই ছিল সবচেয়ে প্রবল শক্তি এবং জামায়াতে ইসলামী জড়িত ছিল মাত্র ১০ শতাংশ ঘটনায়। হতাহতের তালিকায়ও তাদের ভাগ ছিল ওই ১০ শতাংশের মতো। ২০১৩-এর আগে যেসব ঘটনায় তারা (জামায়াতে ইসলামী) জড়িত ছিল, সেসব থেকে প্রাণঘাতী ঘটনা ঘটেছে ৪ শতাংশের কম। ২০১৩ সালে তারা মোট ঘটনার তিন ভাগের এক ভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, অথচ এসব ঘটনা থেকে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে প্রায় ৫০ শতাংশ।

সহিংসতার হিস্যা

হরতালজনিত সহিংসতায় চারটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর প্রাধান্য দেখা গেছে। বিএনপি ও রাষ্ট্রীয় কলাকুশলীরা জড়িত ছিল ৪০ শতাংশ ঘটনায় এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত সংগঠনের অংশীদারি ছিল তিন ভাগের এক ভাগ। জামায়াতে ইসলামীর অংশ এখানে কম, পাঁচ ভাগের এক ভাগ। আহতদের অর্ধেকই এসেছে বিএনপির ডাকা হরতালের ঘটনা থেকে। আর আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে আহতের পরিমাণ তুলনায় কম—৪০

শতাংশের মতো। আর প্রাণঘাতী ঘটনায় উভয়ের মধ্যে বিএনপির ৩০ শতাংশ এবং আওয়ামী লীগের ছিল ২৪ শতাংশ। জামায়াতে ইসলাম-সংশ্লিষ্ট সহিংসতায় আহতের সংখ্যা তুলনামূলক কম (১৩.৪ শতাংশ) হলেও, প্রাণহানির ঘটনার অনুপাতে তারা ছিল মোট অর্ধেকের বেশি। যেসব ঘটনায় রাষ্ট্রীয় বাহিনী জড়িত ছিল (৪০ শতাংশের বেশি), সেসবে হতাহতের পরিমাণ অনেক বেশি। আহত ও নিহত দুই দিক থেকেই তা ছিল ৭৫ শতাংশ দাগের ওপরে।

বিএনপি তার রাজনৈতিক গোষ্ঠী সহিংসতার ৪৮.৬ শতাংশ ঘটনায় জড়িত হলেও তাদের আহতের পরিমাণ ছিল ৫৬.৩ শতাংশ এবং মোট প্রাণঘাতী ঘটনার ৩০ শতাংশ ঘটেছে এসব ঘটনায়। রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো ৪৩.১ শতাংশ ঘটনায় জড়িত, তাতে আহতের পরিমাণ ৭৫.৫ শতাংশ আর প্রাণঘাতী ঘটনায় তাদের অংশগ্রহণ ছিল ৭৬.৫ শতাংশ। আওয়ামী লীগ ৩৭.৭ শতাংশ ঘটনায় জড়িত, তাতে আহতের পরিমাণ ৪০.৯ শতাংশ এবং প্রাণঘাতী ঘটনা ঘটে ২৪ শতাংশ। জামায়াতে ইসলামী যে ২১.৭ শতাংশ ঘটনায় জড়িত, সেসবে আহতের অনুপাত ছিল ১৩.৪ শতাংশ কিন্তু প্রাণঘাতী ঘটনা ঘটে ৫০.২ শতাংশ।

২০০৬ সালের সহিংসতার ঘটনায় বিরোধী দলে থাকা আওয়ামী লীগ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে ৬০ শতাংশ সহিংসতার ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। এসব থেকেই আসে মোট আহতের ৭০ শতাংশ। প্রাণঘাতী ঘটনায় তাদের হিস্যা ৩৬ শতাংশ হলেও মোট সহিংস ঘটনায় তাদের মোট হিস্যার তুলনায় কম। তবে সার্বিকভাবে প্রাণঘাতী ঘটনার শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অংশভাগ ২০ শতাংশ।

তবে সরকারি ক্ষমতায় আসীন থাকা সত্ত্বেও সহিংসতার ঘটনা, আহত ও নিহত—এই তিন দাগে বিএনপির ভাগ তুলনায় বেশি। যথাক্রমে ৫০.৫ শতাংশ ঘটনা, ৫৮.৯ শতাংশ আহত এবং ৩১.৩ শতাংশ নিহত। রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো জড়িত ছিল, এমন ঘটনা থেকেই এসেছে মোট প্রাণহানির ৬১ শতাংশ।

২০১৩ সালের রাজনৈতিক সহিংসতা

এই সমীক্ষাজাত গবেষণায় পাওয়া অনুসন্ধানের ওপর ২০১৩ সালের সহিংসতার বেশ প্রভাব রয়েছে। আমরা ২০১৩ সালের ঘটনাবলির গতিধারার ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হাজির করার বদলে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় উপাদান চিহ্নিত ও পুনর্ব্যক্ত করতে চাই। এগুলো ২০০২ থেকে ২০১৩ সালের সহিংসতার সার্বিক ফলাফল আরও বেশি ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।

অবশ্য প্রথমে বলা দরকার ২০১৩ সালে আহত ও প্রাণহানির ঘটনার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এ সময়ে ৩ হাজার ৮০০ ঘটনা থেকে আহতের সংখ্যা পাওয়া গেছে ৩০ হাজারের বেশি এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে ৭৫০টির বেশি। এসব কারণে এ সময়ের মধ্যে ২০১৩ সাল সবচেয়ে সহিংস বছর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ২০০৬ সালের ঘটনাগুলোকে ব্যতিক্রম ধরে নিলে এই হিসাব অন্য বছরগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে। তা ছাড়া এই মেয়াদে হরতালের মোট ঘটনার প্রায় ৫০ শতাংশ ঘটেছে ২০১৩ সালে। এটাও হরতালের সহিংসতার সার্বিক মূল্যায়নে প্রভাব ফেলেছে।

ছক ১ : জেলাভিত্তিক সহিংসতার হার (২০০২-১২)

	প্রাণহানির ঘটনা	ঘটনা
কুষ্টিয়া	১২.৩%	৩.০%
ঢাকা	৮.৬%	১৬.৫%
পাবনা	৭.৮%	২.৮%
খুলনা	৬.৬%	২.৭%
রাঙামাটি	৪.৬%	১.০%
ঝিনাইদহ	৪.৪%	১.৮%
চুয়াডাঙ্গা	৩.৮%	০.৮%
চট্টগ্রাম	৩.৫%	৪.৪%
নারায়ণগঞ্জ	৩.৩%	৩.৪%
রাজশাহী	২.৬%	৩.৮%
মেহেরপুর	২.৫%	০.৬%
যশোর	২.৫%	১.৮%
নওগাঁ	২.৩%	০.৬%
নাটোর	১.৮%	১.৫%
লক্ষ্মীপুর	১.৬%	১.২%
অন্যান্য জেলা	৫.৭%	১.৩%

দ্বিতীয়ত, জেলাভিত্তিক সহিংসতার আলাদা উপাত্তের ক্ষেত্রে ২০১৩

সালের ঘটনা ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ২০১৩ সালে কিছু অঞ্চলে আহতের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি কিন্তু প্রাণহানির ঘটনা ছিল তুলনামূলকভাবে কম (যেমন রাজশাহী বা সিরাজগঞ্জ)। আবার কিছু অঞ্চলে সহিংসতা ছিল অনেক বেশি প্রাণঘাতী, তবে আহতের পরিমাণ ছিল তুলনামূলকভাবে কম (যেমন সাতক্ষীরা)। একইভাবে কিছু জেলায় সীমিত প্রভাব ছিল। যেমন বরিশাল ও চুয়াডাঙ্গা।

আগের ছকে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত উপাত্তগুলোর বিবরণও উঠে এসেছে। ২০০২ থেকে ২০১২ সালে স্পষ্টত ঢাকায় সবচেয়ে বেশি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং প্রাণহানির ঘটনায় কুষ্টিয়া ছিল তখন দ্বিতীয়। ২০১৩ সালে এটা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। যদিও এখনো অধিকাংশ ঘটনা ঢাকা জেলায় ঘটে (তবে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.৫%)। সবচেয়ে প্রাণঘাতী ঘটনার ক্ষেত্রে ঢাকার অবস্থান চতুর্থ। সবার ওপরে আছে সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম ও বগুড়া। ২০১৩ সালের প্রাণঘাতী সহিংসতার পরিমাণ ২০০২ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী প্রথম সারির ১৫টি জেলাকে ছাড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া ২০০২ থেকে ২০১২ সালে মোট হতাহতের ৮.৫ শতাংশের বেশি ঢাকা জেলায় পাওয়া গেছে, তবে সেটাও শুধু ২০১৩ সালের প্রায় অর্ধেক। ২০১৩ সালে 'প্রান্তিক' জেলাগুলোর মধ্যে সাতক্ষীরা, যশোর বা নোয়াখালী প্রথমে জায়গা করে নেয়। মোট প্রাণঘাতী ঘটনার ১৫ শতাংশের বেশি 'অন্যান্য জেলা'য় ঘটেছে। দেশজুড়ে বড় ধরনের সহিংস ঘটনাগুলোর পরিমাণ মোটামুটি ১ শতাংশের মতো, তবে তুলনামূলকভাবে এ ধরনের ঘটনা দুর্লভ বলা চলে। ২০০২ থেকে ২০১২ সালে এ ধরনের ঘটনা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

প্রধান রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে ২০১৩ সালে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মতো। ২০০২ থেকে ২০১২ সালে আওয়ামী লীগ ৫০ শতাংশের বেশি ঘটনায় সম্পৃক্ত হয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে, যা ২০১৩ সালে অর্ধেকে নেমে এসেছে। প্রধানত জামায়াতে ইসলামীর কারণে সংঘটিত ঘটনাগুলো ২০০২ থেকে ২০১২ সালের চেয়ে ২০১৩ সালে এসে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যবর্তী ফাঁকটা পূরণ করেছে রাষ্ট্রীয় কুশীলবেরা। বিএনপির অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বা একই থাকলেও (তাদের অংশগ্রহণ কিঞ্চিৎ বেড়েছে), ২০১৩ সালে তারা মোট ঘটনার অর্ধেকে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের প্রভাবশালী উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ওদিকে ২০১৩ সালে বিদ্রোহী দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনাগুলো প্রায় নাই হয়ে যায়।

ছক ২ : জেলাভিত্তিক প্রাণহানির ঘটনা ও ঘটনার হার (২০১৩)

	প্রাণহানির ঘটনা	ঘটনার হার
সাতক্ষীরা	৭.৯%	৩.২%
চট্টগ্রাম	৬.৬%	৭.১%
বগুড়া	৬.০%	৩.৫%
ঢাকা	৪.৮%	১৩.৫%
নারায়ণগঞ্জ	৩.২%	৪.২%
যশোর	৩.০%	২.০%
নোয়াখালী	২.৯%	৩.০%
সিরাজগঞ্জ	২.৮%	২.৯%
লক্ষ্মীপুর	২.৬%	১.৯%
গাইবান্ধা	২.৬%	১.৪%
জয়পুরহাট	২.৬%	১.৫%
নবাবগঞ্জ	২.৪%	১.৫%
নীলফামারী	২.৩%	১.১%
রাজশাহী	২.২%	৪.৭%
মেহেরপুর	২.২%	০.৭%
অন্যান্য জেলা	১৬.৪%	১.১%

আহত ও প্রাণহানির ঘটনা বিবেচনায় নিলে চিত্রটি খুব লক্ষ করার মতো। কেবল জামায়াতে ইসলামীর সম্পৃক্ততার কারণে [এসব জেলায়] সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রাণহানির ঘটনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যা ২০১৩ সালে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেখানে দেখা যায়, ২০০২ থেকে ২০১২ সালের ৩.৬ শতাংশ আহত ও প্রাণহানির ঘটনা ২০১৩ সালে গিয়ে ৫০ শতাংশের বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বছর আহত হওয়ার ঘটনায় [উল্লিখিত জেলার লোকজন] তিন গুণ বেশি অংশগ্রহণ করেছে। এই গবেষণা আরও দেখায় যে, ইসলামপন্থী সংগঠনের সন্ত্রাস ছিল কম প্রাণহানিকর। তারা যতটা সহিংস ঘটনায় জড়িত, সে তুলনায় হতাহতের ভাগে তাদের অংশের পরিমাণ তুলনায় অনেক কম।

ছক ৩ : রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রধান রাজনৈতিক গোষ্ঠী (২০০২-১২)

	ঘটনা	আহত	মারাত্মক জখম
আওয়ামী লীগ	৫১.৫%	৫০.৬%	২১.৮%
বিএনপি	৪২.২%	৫১.২%	২৪.১%
রাষ্ট্রীয় বাহিনী	২১.৭%	৩৬.৬%	৪৭.২%
জামায়াতে ইসলামী	৭.৬%	৯.৮%	৩.৬%
(সাবেক) বিদ্রোহী দল	৫.৬%	০.৬%	৪১.৬%
ইসলামি-গোঁড়াপন্থী দল	১.২%	২.৫%	৩.৪% (জামায়াত বাদে)

যেসব ঘটনায় রাষ্ট্রীয় কর্তাব্যক্তি বা বাহিনী অংশগ্রহণ করেছে, উল্লেখযোগ্যভাবে আহত ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে সেগুলো থেকেই। এবারও বিদ্রোহী দলগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তুলনামূলকভাবে কম করে হলেও ২০১৩ সালে ইসলামি-গোঁড়াপন্থী দলগুলোর উত্থান ঘটেছিল, যারা এখনো কিছু কিছু ঘটনায় অংশগ্রহণ করছে। প্রাণঘাতী ঘটনায় তাদের সম্পৃক্ততা দ্বিগুণ বেড়েছে, যা ৩.৫ থেকে ৬.৫ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছক ৪ : রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রধান রাজনৈতিক গোষ্ঠী (২০১৩)

	ঘটনা	আহত	মারাত্মক জখম
বিএনপি	৪৯.২%	৫৬.২%	৩১.৯%
জামায়াতে ইসলামী	৩৩.৬%	২৯.২%	৫১.২%
রাষ্ট্রীয় কর্তাব্যক্তিরা	৩৩.৩%	৬৫.৬%	৬৫.৭%
আওয়ামী লীগ	২৬.৬%	৩৩.১%	২৩.৩%
ইসলামি-গোঁড়াপন্থী দল	২.২%	৫.৮%	৬.৬% (জামায়াত বাদে)
(সাবেক) বিদ্রোহী দল	০.৩%	০.১%	১.৮%

ছাত্রসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সহিংসতা (১৯৯১-২০১৮)

বাংলাদেশি রাজনীতিতে ছাত্ররাজনীতি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজনৈতিক ভাগে বিভক্ত শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। দেশের রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় ছাত্রদের অবদান ব্যাপক।

১৯৯১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ঘটা মোট রাজনৈতিক সহিংসতায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল ২৫ শতাংশ। রাজশাহী ও সিলেটের মতো বিশেষ কিছু নগরে এই হার ৫০-৬০ শতাংশ। বিশেষ কিছু সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতা তুঙ্গে ওঠে : নতুন ক্ষমতাসীন সরকার যখন তার ক্ষমতা সংহত করতে যায়, শিক্ষার্থীরা যখন কোনো ক্রান্তিকালে বোধ করে যে সরকারের আইন পরিবর্তনের দ্বারা তাদের ভবিষ্যৎ সুযোগ সংকুচিত হয়ে যাবে এবং লক্ষণীয়ভাবে নির্বাচনের সময়ে। বেশির ভাগ বাংলাদেশি (বেশির ভাগ ছাত্রকর্মীও) মানে যে সন্ত্রাস করা নৈতিকভাবে ভুল কাজ। তারপরও এই সহিংসতা খুব গভীরে প্রোথিত এবং অনেকের কাছেই একে অনিবার্য বলে মনে হয়।

আগেই বলা হয়েছে, ১৯৯১-২০১৮ মেয়াদে সব রাজনৈতিক সহিংসতার চার ভাগের এক ভাগেই ছাত্রসংগঠনগুলো জড়িত ছিল। আমরা যদি নির্দিষ্ট সংগঠনের ভূমিকার দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব বেশির ভাগ সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত ছিল ছাত্রলীগ (১৭.৯ শতাংশ)। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের হিস্যা তুলনায় অনেক কম (মাত্র ১০ শতাংশ)। এই সময়ে ইসলামপন্থী সংগঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল ইসলামী ছাত্রশিবির। এই গবেষণা থেকে এটাও পরিষ্কার হয় যে ইসলামপন্থী সংগঠনের সন্ত্রাস ছিল কম প্রাণহানিকর। তারা যতটা সহিংস ঘটনায় জড়িত, সে তুলনায় হতাহতের ভাগে তাদের অংশের পরিমাণ তুলনায় অনেক কম।

১৯৯১ থেকে ২০১৮ সময় পর্যন্ত ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক সহিংসতার বেলায়ও শীর্ষে রয়েছে ২০১৩ সাল। বেশ কিছু ইসলামপন্থী ছাত্রসংগঠন এতে জড়িত ছিল। এটা কেবল নির্বাচন-পূর্ববর্তী বছরই ছিল না, জামায়াতে ইসলামীও এ বছর তাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীগুলোও দেশের বিভিন্ন অংশে তাদের ওপর দমন চালায়। পাশাপাশি এই বছরে ইসলামপন্থী হেফাজতে ইসলাম ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তনের দাবিতে বড় আকারের বিক্ষোভের আয়োজন করে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী তাদের দমন করে। সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাতিলকারী সংশোধনীর বিরুদ্ধেও ব্যাপক প্রতিবাদ হয়। সাধারণভাবে নির্বাচনী বছরে (১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮) ছাত্রদের সহিংসতা বেড়ে থাকে।

২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে কম সহিংসতা ঘটে। ছাত্রগোষ্ঠীদের জন্য সবচেয়ে সহিংস বছর ছিল ২০১৩ সাল। অবশ্য ২০১৫ সালে

বেশ কিছু মারাত্মক ছাত্র-সহিংসতা ঘটে। ছাত্রলীগ এ বছর তাদের ক্ষমতা সংহত করায় নামে। ক্ষমতা সংহত হয়ে যাওয়ার পরে, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে তুলনামূলক কম সহিংসতা ঘটে। ২০১৮ সালের নির্বাচনী বছরে সহিংসতা আবারও বাড়ে। তবে অন্যান্য নির্বাচনী বছরের তুলনায় এর মাত্রা ছিল কম। বাংলাদেশের বেলায় সহিংসতা সবচেয়ে তীব্র হয়, যখন নির্বাচন প্রকৃতপক্ষেই প্রতিযোগিতামূলক থাকে।

ছক ৫ : রাজনৈতিক সহিংসতার সংগঠনভিত্তিক খতিয়ান (১৯৯১-২০১৮)

	ঘটনা	আহত	প্রাণহানি
আওয়ামী লীগ	৩০.২%	৩৭.৭%	২২.৩%
বিএনপি	২৫.২%	৩৪.৩%	১৫.৬%
আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা	১৮.০%	৩০.৬%	৩৩.১%
ছাত্রলীগ	১৭.৯%	১৪.৭%	১০.০%
ছাত্রদল	১১.৫%	১০.৫%	৬.০%
দুষ্কৃতকারী	১০.৮%	২.৩%	২১.২%
বিএনপিকেন্দ্রিক জোট	৯.৭%	৯.৭%	৫.৩%
ইসলামী ছাত্রশিবির	৫.২%	৫.৮%	৩.৮%
যুবলীগ	৪.৯%	৩.০%	৭.১%
আওয়ামী লীগকেন্দ্রিক জোট	৩.৪%	৭.২%	২.৭%
জামায়াতে ইসলামীকেন্দ্রিক জোট	৩.২%	২.৮%	৪.৮%
জামায়াতে ইসলামী	২.১%	২.৮%	২.০%
বিদ্রোহী ইসলামী গোষ্ঠী	০.৮%	১.৬%	৪.৭%

সম্ভাব্য উপসংহার ও পরবর্তী ধাপ

এই প্রতিবেদন বাংলাদেশের সহিংসতার বৈচিত্র্য তুলে ধরেছে। এখানে দেখা যায় যে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো প্রধান শহরগুলোতে সহিংসতার মাত্রা সবচেয়ে বেশি হলেও সার্বিক চিত্রটি বেশ ছড়ানো বা বিস্তৃত। বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলেই সহিংসতার ঘটনা ব্যাপকভাবে বণ্টিত হয়ে আছে। প্রধান রাজনৈতিক দল ও তাদের অঙ্গসংগঠনগুলো রাজনৈতিক সহিংসতার সার্বিক চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বা ঘটক হিসেবে দেখা গেলেও তাদের (সহিংস) সংঘাতের চরিত্র বিচিত্র ধরনের।

একই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা এবং উপদলের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ সংঘাত ঘটে চলে। এই কালপর্বে রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও দলের প্রাধান্যও বিভিন্ন রকমের। কেউ যদি বিশেষ কোনো সহিংসতা, যেমন হরতাল-সহিংসতার ওপর জোর দেয় (অথবা শিক্ষার্থীদের মধ্যকার সহিংসতা বা বোমা বিস্ফোরণ), তখনো দেখা দেখা যায় যে সহিংসতার অন্যান্য ধরনেরও উদ্ভব হচ্ছে।

এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ২০০২ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে রাজনৈতিক সহিংসতার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা এবং প্রাথমিক উপাত্তের ভিত্তিতে সহিংসতার ধরন বিষয়ে বোঝাপড়া তৈরি করা হলেও, অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি রয়ে গেছে।

যেভাবে বলা আছে, রাজনৈতিক সহিংসতা ও এর টিকে থাকা নিয়ে বিদ্যায়তন ও নীতিনির্ধারক মহলে উভয় ক্ষেত্রে বেশ তর্কবিতর্ক রয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রে বিষয়টি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়। এই প্রতিবেদনের লেখকেরা বিশ্বাস করেন, এসব জটিল কারণ, যুক্তিগত অবস্থান ও রাজনৈতিক সহিংসতার লক্ষ্যগুলো অধিকতর ভালোভাবে অধ্যয়নের জন্য পরবর্তী ধাপ গ্রহণ করা উচিত। রাজনৈতিক সহিংসতাকে উপেক্ষা না করে বরং এগুলো ভালোভাবে বোঝা দরকার। উল্লিখিত অনুসন্ধানে প্রাপ্ত উপাত্ত পুনর্ব্যক্ত না করে আমাদের উপসংহার হলো এই প্রশ্ন বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করা এবং এই সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার মতো বহুবিধ পথের হদিস করা।

প্রথমত, তথ্যগুচ্ছ দলীয় ও ক্রিয়াকারী শক্তিগুলোর রাজনৈতিক সহিংসতার বণ্টন বুঝতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে সহিংসতার বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বা ঘটনাকাল বিষয়ে একাধিক হাইপোথিসিস পরীক্ষা করতে সহায়তা করে। কাজের প্রথম ধাপ হলো উপাত্তগুচ্ছের সঙ্গে প্রাপ্ত অন্যান্য উপাত্ত মিলিয়ে দেখা, যেমন জনশুমারি প্রতিবেদন, সমাজ-অর্থনৈতিক বা নির্বাচনী উপাত্ত এবং বিশ্লেষণের কয়েকটি মডেল ব্যবহার করা। অন্তত পক্ষে এসব প্রকল্পের মাধ্যমে হরতালের বিদ্যমান অবকাঠামো সম্বন্ধে বিচিত্রমুখী জিজ্ঞাসা নিয়ে পরীক্ষা চালানো উচিত।

দ্বিতীয়ত, এটি একইভাবে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ও ফলদায়ক যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংঘবদ্ধ সহিংসতার পেছনে সূক্ষ্ম কারণ ও যৌক্তিকতা বুঝতে আমাদের গুণগত উপাত্ত সংগ্রহ করা দরকার। এই কাজ করতে গিয়ে বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বা যারা এগুলো ঘটিয়েছে, তাদের ওপর গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা

চালাতে হবে। এই অনুসন্ধানে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতার বিচিত্র চরিত্র, জড়িত শক্তিগুলো এবং সহিংস ঘটনায় তাদের জড়িত হওয়ার কারণগুলো তুলে ধরা উচিত।

মূলত, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু মূল সঞ্চালক রয়েছে। যেমন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও নির্বাচন। তবে প্রায় প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক সহিংসতার ঘটনা ঘটে, যার সঙ্গে এসব বড় সঞ্চালক বা ট্রিগারের সম্পর্ক কম বলে মনে হয়। এতে করে রাজনৈতিক সহিংসতার সরল খতিয়ান করা আরও চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে যায়। তবে এগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধিকতর দৈনন্দিন সহিংসতা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। এই প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বিদ্যায়তন, গণমাধ্যম ও নীতিনির্ধারণী মহলে আলোচিত বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক উপাত্ত দিতে পারব বলে আশা রাখি। যেখানে আমাদের উপাত্তগুলো উন্মুক্তভাবে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। আমরা প্রতিবেদনটির মধ্য দিয়ে এই ব্যাখ্যা তৈরির একটি সাধারণ পাটাতন সরবরাহের আশা রাখি।

গ্রন্থপঞ্জি ও অন্যান্য পাঠের তালিকা

চৌধুরী, এম (২০০৩), ভায়োলেন্স, পলিটিকস অ্যান্ড দ্য স্টেট ইন বাংলাদেশ, কনফ্লিক্ট, সিকিউরিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ৩(২), ২৬৫-২৭৬।

দত্ত, এস (২০০৫), পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স ইন বাংলাদেশ : ট্রেন্ডস অ্যান্ড কজেস, স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালাইসিস, ২৯(৩), ৪২৭-৪৩৮।

এঙ্গেলসেন রুউড, এ (২০১০), টু ক্রিয়েট আ ক্রাউড : স্টুডেন্ট লিডার্স ইন ঢাকা, ইন পাওয়ার অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স ইন ইন্ডিয়া (পৃষ্ঠা ৭০-৯৫), নিউ দিল্লি : রুটলেজ।

এঙ্গেলসেন রুউড, এ (২০১৪), দ্য পলিটিক্যাল বালি ইন বাংলাদেশ, ইন প্যাট্রোনেজ অ্যাজ পলিটিকস ইন সাউথ এশিয়া (পৃষ্ঠা : ৩০৩-৩২৫), দিল্লি : কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

হাসান, এম (সম্পাদিত) (২০০৬), দ্য স্টেট অব গভর্ন্যান্স ইন বাংলাদেশ ২০০৬ : নলেজ, পারসেপশনস, রিয়েলিটি, ঢাকা : সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ।

হোসাইন, এ (২০০০), অ্যানাটমি অব হরতাল পলিটিকস ইন বাংলাদেশ, এশিয়ান সার্ভে, ৪০(৩), ৫০৮-৫২৯।

ইসলাম, এস এ; আহমেদ, আই; মুর্তজা, জি; ও এআই, ই (২০০৫) : বিয়ন্ড হরতালস : টুয়ার্ডস ডেমোক্রেটিস ডায়ালগ ইন বাংলাদেশ, ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা : ইউএনডিপি বাংলাদেশ।

লুইস, ডি (২০১১), বাংলাদেশ : পলিটিকস, ইকোনমি অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি, কেমব্রিজ : কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

মনিরুজ্জামান, এম (২০০৯), পার্টি পলিটিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স ইন বাংলাদেশ : ইস্যু, ম্যানিফেস্টেশন অ্যান্ড কনসিকুয়েন্সেস, সাউথ এশিয়ান সার্ভে, ১৬(১), ৮১-৯৯।

রহমান, এম এম (২০০৭), অরিজিনস অ্যান্ড পিটফলস অব কনফ্রন্টেশনাল পলিটিকস ইন বাংলাদেশ, সাউথ এশিয়ান সার্ভে, ১৪(১), ১০১-১১৫।

রাশিদুজ্জামান, এম (১৯৭৭), পলিটিক্যাল আনরেস্ট অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ, এশিয়ান সার্ভে, ৩৭(৩), ২৫৪-২৬৮।

স্যুকেন্স, বি (২০১৫), জাঙ্গাল, স্কুয়ার্টাস, জমিদার, রিয়েল স্টেট, পার্কস : দ্য টেম্পরাল ডাইমেনশনস অব বস্তি প্রোপার্টি রেজিমস ইন চিটাগং, বাংলাদেশ, ক্রিটিক্যাল এশিয়ান স্টাডিজ।

স্যুকেন্স, বি (২০১৫), দ্য ল্যান্ড দ্যাট ডিজঅ্যাপিয়ার্ড : ফোর্সফুল অকুপেশন, ডিসফিউটস অ্যান্ড দ্য নেগোসিয়েশন অব ল্যান্ড লর্ড পাওয়ার ইন আ বাংলাদেশি বস্তি, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড চেঞ্জ, ৪৬(৩)।

স্যুকেন্স, বি, অ্যান্ড ইসলাম, এ (২০০৩), হারতাল অ্যাজ এ কমপ্লেক্স পলিটিক্যাল পারফরম্যান্স : জেনারেল স্ট্রাইকস অ্যান্ড দ্য অর্গানাইজেশন অব (লোকাল) পাওয়ার ইন বাংলাদেশ, কন্ট্রিবিউশনস টু ইন্ডিয়ান সোশিওলজি, ৪৭(১), ৬১-৮৩।

ভ্যান সেন্ডেল, ডব্লিউ (২০০৯), আ হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ, কেমব্রিজ : কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

কনফ্লিক্ট রিসার্চ গ্রুপ কর্তৃক এই লেখকদ্বয়ের দুটি বিস্তৃত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ২০১৫ ও ২০২০ সালে। এই রচনা সেই প্রতিবেদন দুটির ভিত্তিতে লিখিত।

● **ড. বার্ট স্যুকেন্স** সহযোগী অধ্যাপক, সংঘাত ও উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঘেন্ট ইউনিভার্সিটি, বেলজিয়াম।

● **ড. আইনুল ইসলাম** সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাক্ষাৎকার

রাজনৈতিক বন্দোবস্ত না বুঝলে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

ড. মুশতাক হুসাইন খান

ড. মুশতাক হুসাইন খান প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিশাস্ত্রের একজন অগ্রণী গবেষক। বাংলাদেশি-ব্রিটিশ এই অর্থনীতিবিদ রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ধারণার উদ্ভাবক। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেশটির অর্থনীতি ও রাজনীতির উন্মোচন ঘটায় এই তত্ত্ব। উন্নয়ন, সুশাসন, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিষয়ে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পেয়ে আসছে। দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনীতি, দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন, দুর্নীতি ও উন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা, প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক তাঁর গবেষণার বিষয়। দুর্নীতি দমন ও সুশাসন বিষয়ে তিনি ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্বব্যাংক ও এডিবির ধারণার সমালোচক। বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে দুর্নীতি দমন, গণতন্ত্রায়ণ ও বিকেন্দ্রীকরণ সফল উন্নয়নের জন্য জরুরি নয়। মুশতাক খান বাংলাদেশ, ভারত, তানজানিয়া ও থাইল্যান্ডের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নিয়ে গবেষণা করেছেন। অর্থনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময় ব্রিটেনের মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটির পরামর্শক ছিলেন, বক্তব্য দিয়েছেন ব্রিটেনের হাউস অব কমনসে। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, এডিবিসহ বিভিন্ন দেশের সরকারি সংস্থার সঙ্গেও কাজ করেছেন। গবেষণা প্রবন্ধের জন্য বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো *রেন্টস, রেন্ট-সিকিং অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট*, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০; *স্টেট ফেইলিউর ইন উইক স্টেটস রুটলেজ*, ১৯৯৫ এবং *স্টেট বিল্ডিং ইন প্যালেস্টাইন*, রুটলেজ, ২০০৪।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ফারুক ওয়াসিফ**

প্রতিচিন্তা : পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট বা রাজনৈতিক বন্দোবস্তের ধারণা এখন অনেকেই ব্যবহার করছে। এখান থেকেই ডেভেলপমেন্টাল বার্গেইন, এলিট

বার্গেইন, এলিট প্যাক্ট কথাগুলো আসছে। কোন বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতে এই ধারণা ব্যবহার করা হচ্ছে?

মুশতাক খান : পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট তত্ত্বের উদ্ভাবক হিসেবে শুরুতে আমি আমার পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক একটু ব্যাখ্যা করি। আমি কয়েকটা বড় প্রশ্ন নিয়ে শুরু করি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক পরিক্রমার মধ্যে এত পার্থক্য কেন? কেন কোনো কোনো দেশে অনেক দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে, কোনো কোনো দেশে উন্নয়ন হচ্ছে না বা ব্যাহত হচ্ছে। কেন কোনো কোনো দেশ গৃহযুদ্ধে নেমে পড়ছে, রাষ্ট্র ভেঙে পড়ছে। অর্থনৈতিক ভেরিয়েবল কী ছিল, সুদের হার কী ছিল, এক্সচেঞ্জ রেট কী ছিল, ম্যাক্রো ইকোনমিকস কী ছিল—এসব দিয়ে বিষয়গুলো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ইমিডিয়েট অর্থনৈতিক সূচক দিয়ে ডেভেলপমেন্ট ব্যাখ্যা করতে চাইলে তা খুব একটা সন্তোষজনক হবে না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শাসনব্যবস্থা, দুর্নীতি, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, আনুষ্ঠানিক নিয়ম কোথায় এবং কতটা লঙ্ঘিত হচ্ছে, এই প্রশ্নগুলো আসে। তখন প্রশ্ন জাগবে কেন দেশে দেশে এই পার্থক্যগুলো হচ্ছে? দুর্নীতিরও অনেক রকম আছে, বিনিয়োগেরও বিভিন্ন ধরন আছে। কে কোন আইন ভাঙছে, কোনটার কী ভূমিকা, তা বুঝতে সমাজের ক্ষমতার বিন্যাস অর্থাৎ পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনকে বিশ্লেষণের মধ্যে আনতে হবে। এ প্রশ্নটিকে এখন অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। এখন বিতর্কটা হচ্ছে কীভাবে বিষয়টা বিশ্লেষণে আনা হবে এবং এটার ফ্রেমওয়ার্কটা কী? তো এটা একটা বড় বিশ্লেষণের জায়গা এবং এখানে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। এখানে যে ছোট ছোট পার্থক্য, সেসব আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার ফ্রেমওয়ার্কে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অর্থ হলো ক্ষমতার বিন্যাস। যেকোনো সামাজিক বিশ্লেষণের জন্য প্রাসঙ্গিক সব আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) এবং অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্ষমতার বিতরণটাই সেই প্রশ্নের জন্য প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত।

প্রতিচিন্তা : যেমন উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে সঠিক ডেভেলপমেন্ট বার্গেইন, এলিট প্যাক্ট, এলিট সেটেলমেন্টের কথাও আসে। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের সমাধান হিসেবেও রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা আসছে। রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রশ্নে এসব ধারণার ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

মুশতাক খান : এখানে বিশ্লেষণের পার্থক্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাতে আমার বিশ্লেষণের সঙ্গে অন্য অনেকের বড় পার্থক্য ঘটে যায়। এলিট প্যাক্টের কথা

হয়তো কেউ কেউ বলছেন, কিন্তু আসলে কাজের ক্ষেত্রে, করণীয়র ক্ষেত্রে এবং পলিসির ক্ষেত্রে এটার কী অর্থ দাঁড়াচ্ছে? আমার তো মনে হয় না একটা সমাজে এলিট নামক কোনো সম্প্রদায় অর্থ বা সম্পদ ভাগ করার জন্য কোনো প্যাক্ট বা বার্গেইন করে। বরং ক্ষমতাসম্পন্ন সংগঠনের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আর সংঘর্ষই স্বাভাবিক। আমি তিন দশক আগে পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট নিয়ে কাজ শুরু করেছি। এটা স্বীকৃত যে পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টের পাইওনিয়ার হচ্ছে আমার কাজ। তবে আমি কখনোই পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টকে এলিটদের মধ্যে একটা চুক্তি বা দর-কষাকষি হিসেবে দেখিনি। প্রথমত এলিট জিনিসটাই সন্তোষজনক বর্গ নয়। এলিট কে তা কে বলবে? মূল বিষয় হচ্ছে যে সাংগঠনিক ক্ষমতা কীভাবে গড়ে ওঠে। একটা সমাজ কীভাবে সংগঠিত হয়ে আছে, তা আমাদের বোঝা লাগবে। কার্ল মার্ক্সের বিশ্লেষণে সাংগঠনিক শক্তিটা মূলত শ্রেণিভিত্তিক হয়। কিন্তু একই সঙ্গে মার্ক্স এটাও বলছিলেন যে সংগঠিত না হলে শ্রেণির কিন্তু কোনো ক্ষমতা নেই। এখন আমরা দেখছি যে উন্নয়নশীল দেশে শ্রেণির বাইরে অনেক রকমের সাংগঠনিক শক্তি আছে, আবার শ্রেণিভিত্তিক শক্তিও আছে। উন্নয়নশীল দেশে এই সাংগঠনিক কার্যক্রম অনেক সময় অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রকাশ্য লেনদেনের ভিত্তিতে হয়। একে আমরা ইনফরমাল অর্গানাইজেশন বলি। আপনি যদি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত একটা দেশ দেখেন, সেখানে বেশির ভাগ অর্গানাইজেশন হচ্ছে ফরমাল বা বিধিবদ্ধ। বিধিবদ্ধ মানে যেটার আইনি রূপ আছে। একটা পলিটিক্যাল পার্টি, একটা স্কুল বা একটা ব্যবসা, তা বিধিবদ্ধভাবে চলছে। আইনে বলা আছে, তারা কীভাবে টাকা আয় করবে আর কীভাবে তা খরচ করবে। এবং কর্মকর্তারা কে কোন পদে আছেন, কার কী ক্ষমতা ইত্যাদি। এর বাইরেও অনেক কিছু সেখানে হয়। কিন্তু আইনটা মূলত একটা মেরুদণ্ড। সেই আইনের বাইরেও অনেক রকম ইনফরমাল লেনদেন থাকে। তবে ইনফরমালটা যখন আইনের পরিপন্থী হয়, তখন আদালতে গেলে আইনটাই টিকবে, ইনফরমালটা টিকবে না। আর যেখানে আইন দুর্বল, আইনের শাসন দুর্বল, সেখানে ইনফরমালিটিই বেশি চলে। সেখানে অযোগ্য লোক চাকরি পেয়ে যায়, কন্ট্রাক্ট পেয়ে যায়, ঋণ পেয়ে যায়। যোগ্য লোক তাকে সরাতে পারে না। পার্থক্যটা এখানেই ঘটে। এবং কেন সরাতে পারে না, সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট এটার একটা ব্যাখ্যা দেয়। ব্যাখ্যাটা এ রকম যে যখন একটা দেশ উন্নত হতে শুরু করে, সেখানে উৎপাদনশীল সংগঠনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এখানে উৎপাদনশীল সংগঠন বলতে শুধু

মিল-ফ্যাক্টরি বলছি না। ইউনিভার্সিটিও উৎপাদনশীল। কারণ, সে সরাসরি মুনাফা না করুক, তাকে তার খরচের চেয়ে বেশি মূল্যের শিক্ষা আর গবেষণার সেবা বাজারে দিতে হয়। একটা পত্রিকাও উৎপাদনশীল। কারণ, সে প্রফিট বানায়। সেখানে সবার হাতেই উদ্বৃত্ত আছে এবং সবার ক্ষমতা আছে। যখন সমাজে হাজার হাজার সংগঠন চলে আসে যারা উৎপাদনশীল এবং ক্ষমতাশালী; তখন তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে একটা চেক অ্যান্ড ব্যালান্স শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন হাজার হাজার সংগঠন আপনার সমাজে আছে যারা আইনের শাসনটাকে কোনো আদর্শিক বা নৈতিক কারণের জন্য নয়, নিজেদের স্বার্থেই সমর্থন করে, তখন সে সমাজে কেউ যখন আইন ভেঙেছে বলে ধরা পড়লে সে বেকায়দায় পড়ে। আইন কার্যকর করার দায়িত্ব যে কোর্ট বা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ বা যারই হোক, সেই কর্তৃপক্ষ যদি আইন কার্যকর করতে না-ও চায়, তাকে সরিয়ে ফেলা হবে। যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প চেয়েছিলেন ইউএসএর আইন ভেঙে ক্ষমতায় থেকে যেতে। কিন্তু তাঁর নিজের দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট আর তাঁর নিজের নিয়োগ করা বিচারপতিরা একটার পর একটা বিচারে বললেন আসলে কিন্তু ভোট চুরি হয়নি। কেন তাঁরা এটা করলেন? কারণ, ট্রাম্পের প্রতি তাঁদের আনুগত্য যা-ই হোক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প ছাড়াও লাখ লাখ ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আছে, যাদের সঙ্গে তাঁদের কাজ করতে হয়। অর্থাৎ মার্কিন সমাজে ক্ষমতার বিন্যাস অনেক বিস্তৃত। তাই নিজের স্বার্থে তাঁরা আইন মেনে চলেন। তখন আইনের শাসন হয়।

প্রতিচিন্তা : আমাদের দেশে যে আইনভঙ্গ হয়, দুর্নীতি হয়, আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় না, এসবের রাজনৈতিক বন্দোবস্তটা তাহলে কী?

মুশতাক খান : আমাদের মতো দেশের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত এই প্রশ্নগুলোর কী উত্তর দেয়? এখানে অনেক ক্ষমতাশালী সংগঠন আছে, যারা উৎপাদনশীলও না আর ফরমাল সেক্টরেরও না। তারা আইনের কোনো গঠনের মধ্যে আসে না। তাদের ক্ষমতা আসছে ইনফরমাল লেনদেনের ভিত্তিতে, প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট বা উমেদারি নেটওয়ার্কের ভিত্তিতে। এই নেটওয়ার্কগুলো সংগঠনের ভেতরে-বাইরে দুদিকেই কাজ করতে পারে। একটা রাজনৈতিক দল থাকতে পারে যেটার পদ আছে, পদে লোক বসানো আছে, কিন্তু আসল ক্ষমতা যারা ভেতরের লেনদেন করছে তাদের হাতে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কোনগুলো ক্ষমতাশালী, সেটা নির্ভর করবে তাদের ইনফরমাল নেটওয়ার্ক কার সঙ্গে, কোন ব্যাংকের সঙ্গে, কোন মন্ত্রীর সঙ্গে আছে তার ওপর। এখানে ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা আসছে

এসব নেটওয়ার্ক মোবিলাইজ করার মাধ্যমে। এই পাওয়ারফুল লোকগুলো নিজের স্বার্থেই চায় না আইন সব সময় কার্যকর হোক বা মানা হোক। কারণ, তাদের আইনের প্রয়োজন নেই। তাদের যে বিজনেস মডেল, সেখানে আইনসম্মত চুক্তির মাধ্যমে করা লেনদেন থেকে আসা মুনাফার মাত্রা অনেক কম। বেশির ভাগ আয় হচ্ছে আইন ভেঙে, ব্যাংকের টাকা নিয়ে ফেরত না দিয়ে, বিশেষ সুবিধায় ঠিকাদারি পেয়ে বা কন্ট্র্যাক্টের দাম বাড়িয়ে নিয়ে। উন্নয়নশীল দেশে বেশির ভাগ অর্থ এভাবে সঞ্চিত হয়, উৎপাদনের মাধ্যমে করা মুনাফা তুলনামূলক কম। কিন্তু যত উন্নত হয় দেশটা, উৎপাদনের প্রফিট তত বাড়তে থাকে। আমরা এখন এই রূপান্তরের মধ্যে আছি। পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টের বক্তব্য হচ্ছে আইনটা কারা করছে, কারা ভাঙছে এবং কীভাবে ভাঙছে, তা বুঝতে হলে আমাকে সেই ইনফরমাল পাওয়ার স্ট্রাকচার বুঝতে হবে। বুঝতে হবে যে পাওয়ারফুল কারা? যদি দেখি বিচারপতি কে, প্রধানমন্ত্রী কে, কোম্পানির মালিক কে, ব্যাংকের মালিক কে—আমি কিন্তু আসল পাওয়ারটা বুঝব না। কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক পাওয়ার বা ফরমাল পাওয়ারের পেছনে ইনফরমাল নেটওয়ার্ক কাজ করছে। কে কীভাবে কার সঙ্গে লেনদেন করছে, সেই ইনফরমাল লেনদেনের ভিত্তিতেই আসল পাওয়ারটা আসে।

প্রতিচিন্তা : পাওয়ার বলতে এখানে জোর বা ক্ষমতা নাকি নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বোঝানো হচ্ছে?

মুশতাক খান : পাওয়ার বলতে মাঝেমধ্যে আমরা সংঘর্ষ বা সংঘাত করে জয়ী হওয়ার ক্ষমতাকে বোঝাই। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, পাওয়ার বলতে বার্গেইন বা দর-কষাকষির সামর্থ্য বোঝানো হচ্ছে। ধরেন একটা কেক দুজনের মধ্যে ভাগ করতে হবে। এটা কি সমান ভাগ করা হবে, নাকি একজন বেশি কেক খাবে, অন্যজন কম কেক খাবে। তাত্ত্বিকভাবে এটা নির্ভর করছে যখন কেকটা ভাগ করা হচ্ছে তখন কে তার ভাগের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে আর এই অপেক্ষা করার সময় অপর পক্ষকে বেশি অসুবিধায় ফেলতে পারে। এই যে অপেক্ষা করার ক্ষমতা (ইংরেজিতে হোল্ডিং পাওয়ার), এটা হচ্ছে মূল জিনিস। অপেক্ষাটা শুধু কেক ভাগের বেলায় নয়, সংঘাত শেষ হওয়ার অপেক্ষাও একটা অপেক্ষা। এই সংঘাতে কে বেশিক্ষণ টিকতে পারে, সেটাই হচ্ছে ক্ষমতার উৎস। আমি খেয়েদেয়ে এসেছি, কেক এখনই ভাগ না করা হলেও আমি মরছি না। কিন্তু যে ক্ষুধায় মরছে সে বলবে ভাই আমাকে ছোট একটা টুকরা দেন, আমার এখনই দরকার। আবার সংঘাত যখন চরম হয়ে যায়, তখন যার অর্থ

বেশি সে অস্ত্র নিয়ে আসতে পারে। কেক ভাগের জন্য যদি তার লাঠিটা আপনারটার চাইতে বড় হয়, তাহলে আপনি কম সময় টিকতে পারবেন। অর্থাৎ টিকতে হলে শুধু ভরা পেটের দরকার নয়, অস্ত্রও দরকার। কিন্তু টাকাই শুধু ক্ষমতার উৎস নয়। সাংগঠনিক শক্তিও একটা ব্যাপার। যাঁরা সংগঠন করতে পারেন, তাঁদের যে বেশি টাকা আছে, তা নয়। বিপ্লব হয় কেন? যারা গরিব শ্রেণি তারা যখন সংগঠিত হতে পারে, তখন কিন্তু তাদের ক্ষমতার স্থায়িত্ব বেড়ে যায়। তখন তারা মার খেয়েও সরে পড়ে না। যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামের যুদ্ধ হলো। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ও টাকা অনেক বেশি ছিল, কিন্তু ভিয়েতনামের যোদ্ধারা যেহেতু বেশি সংগঠিত ছিল, তাই মার খেয়েও তারা সরে পড়ত না। কেকের ভাগের জন্য বসে থাকত। শেষ পর্যন্ত মার্কিনরাই সরে পড়ল। টাকা বেশি থাকলেও ভিয়েতনামে মার্কিনদের সাংগঠনিক ক্ষমতা কম ছিল এবং আমেরিকান সমাজও ওই যুদ্ধ সমর্থনের জন্য সংগঠিত ছিল না। তালেবানের বেলায়ও একই ঘটনা হয়েছে। সুতরাং সংগঠন হলো ক্ষমতার দ্বিতীয় নির্ধারক। তৃতীয় জিনিসটা হচ্ছে আইডিওলজি। আপনি কোন আদর্শের জন্য, কোন বিশ্বাসের জন্য যুদ্ধ করছেন, সেটা। আপনার আদর্শটা যদি আপনার দলকে অনুপ্রাণিত করে, আপনার সংগঠন যদি ঠিক থাকে, তাহলে পয়সা কম হলেও জিততে পারবেন। আবার আপনার পয়সা যদি অনেক থাকে, অনেক সময় আদর্শ না থাকলেও আপনি জিতে যাবেন। অর্থাৎ এই তিনটা জিনিস একসঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে যে আমার সমাজের সংগঠনগুলো কোন ধরনের এবং তাদের ক্ষমতার ভিত্তিতে কোনটা কত পরিমাণে আছে। যাদের টাকা বেশি তাদের লবিং পাওয়ার বেশি, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাবিকাঠি তাদের হাতে, আর্থিক চাবিকাঠিও তাদের হাতে। ব্যাংক ইত্যাদি তাদের হাতে। সে জন্য নতুন কোনো সুযোগ তারাই নিয়ে নেয় ও বেশি লাভবান হয়। সেই লাভ থেকে তারা তাদের নেটওয়ার্কের ক্ষমতা রিপ্রোডিউস বা পুনরুৎপাদন করায় কিছু খরচ করে। ওই টাকার ভাগ তারা সমর্থকদের দেয়, বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনকে দেয়। ভাগ দিলে পুরো নেটওয়ার্কের পাওয়ার নতুন করে জন্মায়। তাই একবার ক্ষমতার বিন্যাস গঠিত হয়ে গেলে তা টেকসই হয়, তবে পরিবর্তনও সম্ভব।

প্রতিচিন্তা : রাজনৈতিক বন্দোবস্তে অর্থ, মতাদর্শ, বলপ্রয়োগের এ ক্ষমতার বিন্যাস কীভাবে বদলায়? রাজনৈতিক বন্দোবস্তে পরিবর্তন আসে কী করে?

মুশতাক খান : রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মানে এটা নয় যে সব স্থির থাকবে। নতুন গোষ্ঠী এবং সংগঠন তৈরি হচ্ছে, নতুন দল তৈরি হচ্ছে, নতুন পার্টির

মধ্যে নতুন নেতৃত্ব বের হয়ে আসছে। তাদেরও ভাগ দিতে হচ্ছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন ধরনের বাজার সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে নতুন কোম্পানি তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ ক্ষমতার বিন্যাসটা পরিবর্তনশীল কিন্তু আপনি একে একেবারে ঢেলে সাজাতে পারছেন না। এটা একটা ক্রমবিকাশমান প্রক্রিয়া, ইভল্যুশনারি প্রক্রিয়া। এটা সাধারণত রেভল্যুশনের প্রসেস নয়। রেভল্যুশন হচ্ছে আপনি সবকিছু ভেঙে আবার নতুন করে শুরু করছেন। ইভল্যুশনটা কোন দিকে যাবে, সেটা বোঝার জন্য আপনাকে যেকোনো একটা সময় একটা ম্যাপ করতে হবে যে বর্তমান অবস্থাটা কোথায় আছে। এখানে পাওয়ারের ভাগ-বাঁটোয়ারা কি ফরমাল না ইনফরমাল? উন্নয়নশীল দেশে ইনফরমাল পাওয়ার স্ট্রাকচারগুলো আপেক্ষিকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেন তা হয়, সেটা বুঝতে অবশ্যই আপনাকে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করতে হবে। বুঝতে হবে যে আমরা কোত্থেকে এসেছি। আমাদের ভূমিব্যবস্থা কেমন ছিল, রাজনৈতিক ব্যবস্থা কী ছিল, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী ছিল। এটা হচ্ছে আমার পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টের প্রথম ধাপ। এই ধাপে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে আপনাকে বুঝতে হবে এখন আমরা কোথায় আছি। ঐতিহাসিক বিচারে আমাদের মতো সমাজে প্রচণ্ড সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন উৎপাদনব্যবস্থা ও নতুন শ্রেণির আবির্ভাব হচ্ছে। এ রকম অবস্থায় অনেক লেনদেন অনানুষ্ঠানিকভাবে হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ধাপের প্রশ্নটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। এই যে ক্ষমতাশালীরা আইন প্রয়োগ করছে, কেউ আইন মানছে আর কেউ ভাঙছে, এর ফলে কী ধরনের উন্নয়ন হচ্ছে? যারা পাওয়ারফুল আইন তাদের পক্ষেই হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বা যুক্তরাজ্যেও যাদের ধারণক্ষমতা বা টিকে থাকার ক্ষমতা বেশি, আইন তাদের পক্ষেই যায়। তবে আমাদের মতো দেশে আইন কী বলছে, তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আইনটা কীভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। এই জিনিসটা আমরা অনেক সময় দেখি না। এখানে আমার দুর্নীতি নিয়ে গবেষণার কাজটা আসছে যে দুর্নীতি মানে শুধু ঘুষ খাওয়া নয় বা শুধু চুরি করা নয়। বড় দুর্নীতি হচ্ছে আইনটা ঠিকভাবে কার্যকর না করে কেউ কেউ সুবিধা হাসিল করছে। যেকোনো উন্নয়নশীল দেশে ইনফরমালিটি মানে হচ্ছে আইনটা আসলে কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কাগজে-কলমে আইনে যা বলা আছে, বাস্তবে তার সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাত হয় অনেক সময়। এ পার্থক্যটা বুঝতে হলে আপনাকে ইনফরমাল পাওয়ার স্ট্রাকচারটা বুঝতে হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইনফরমালিটির পেছনে একটা সংগঠিত গোষ্ঠী আছে। ব্যাংক কেন একটা লোকের কাছ থেকে ঋণ ফেরত নিতে গিয়ে

নিঃস্ব করে দিচ্ছে কিন্তু অন্য আরেকজনের ঋণ ফেরত নিচ্ছে না। এটা কিন্তু আকস্মিক নয়, এটার পেছনে ক্ষমতাকাঠামো আছে। এই জিনিসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দেশের অর্থনৈতিক গতি কোন দিকে হচ্ছে। এটাই হচ্ছে খুব সংক্ষেপে পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টের উদ্দেশ্য।

প্রতিচিন্তা : তাহলে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বুঝলে একটা সমাজ বা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ পথরেখা অনুমান করা সম্ভব হবে?

মুশতাক খান : একটা সমাজের গতিধারা কখনো পুরোটা প্রেডিক্ট করা যায় না। কারণ, এখানে এজেন্সির ভূমিকা থাকবেই। এজেন্সির ভূমিকা হচ্ছে নতুন রাজনৈতিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি, নতুন সাংগঠনিক শক্তির ভূমিকা এবং এসব সচরাচর তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ আপনার জাহাজটা কোন দিকে যাবে, সেটা নির্ভর করবে আপনার কান্ডারি কারা, আপনার স্টিয়ারিংয়ে কে আছে তার ওপর। কিন্তু স্টিয়ারিং হুইলে যে-ই থাকুক, সে কিন্তু জাহাজটাকে এক সেকেন্ডে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিতে পারবে না। জাহাজের ঘোরার একটা সময় লাগবে। তো পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টটা জাহাজের গতিটা দেখছে আর এজেন্সি বলছে আমি জাহাজটা কোন দিকে নিতে পারি। এজেন্সি হচ্ছে রাজনীতির ভূমিকা। পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট না বুঝে যদি আপনি পলিটিকস করেন, তাহলে আপনার ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আবার পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট দেখে যদি বলেন যে আপনার কিছুই করার নেই, সেটাও একধরনের পরাজয় মেনে নেওয়া। এই ডাইলেকটিস বা দ্বান্দ্বিকতার বিষয়ে কার্ল মার্ক্স একসময় সুন্দর ভাষায় বলেছিলেন, মানুষ তার ইতিহাস নিজেই বানায় ঠিক কিন্তু যেমন ইচ্ছা তেমন করে বানাতে পারে না। ইতিহাসের একটা কাঠামো আছে আবার এজেন্সি বা সংঘবদ্ধ মানুষের সক্রিয়তাও আছে। আমি সবকিছু স্ট্রাকচারের ওপর ছেড়ে দেব তা যেমন হয় না, তেমনি যা ইচ্ছা তা-ও করতে পারব না। পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট এটাও বলছে যে শ্রেণি বাদেও সংগঠনের অনেক ভিত্তি আছে এবং বেশির ভাগ পাওয়ারফুল সংগঠন কিন্তু শ্রেণিভিত্তিক সংগঠন নয়। অর্থাৎ আমরা যদি শ্রেণি নিয়ে বসে থাকি তাহলে হবে না। শ্রেণি দিয়ে আমরা বুঝতে পারব যে কে ধনী, কে গরিব। ধনীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, গরিবদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এবং সমাজটা কোন দিকে যাচ্ছে, এটা বুঝতে হলে আপনাকে পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টে আসতে হবে।

প্রতিচিন্তা : আপনার ক্লায়েন্টালিজম বা উমেদারতন্ত্রের ব্যাখ্যার সঙ্গে পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টের তত্ত্বকে জড়িত করা যায়? যেমন শ্রেণি আছে বটে আবার শ্রেণি

সমন্বয়ও থাকতে পারে। গরিব এবং বড়লোকের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে ক্ষমতার নেটওয়ার্কের মধ্যে এসে। ক্ষমতাহীনেরা খাড়াখাড়িভাবে ক্ষমতাবানদের নেটওয়ার্কে গিয়ে শ্রেণিগতভাবে উত্তরিত হতে চাইছে, আড়াআড়ি শ্রেণি সংহতির বদলে...

মুশতাক খান : এখানে শ্রেণি হচ্ছে একটা ডেসক্রিপশন, একটা বর্ণনা। যেটা মার্ক্সে *ক্লাস ইন ইটসেলফ* এবং *ক্লাস ফর ইটসেলফ* হিসেবেও বলা আছে। যারা ধনী, তারা কি ধনী হিসেবে সংগঠিত হচ্ছে? যারা গরিব, তারা কি গরিব হিসেবে সংগঠিত হচ্ছে? শ্রেণির বর্ণনা থেকে আপনি বলতে পারবেন এরা ধনী, এরা গরিব। এটা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। তা সত্ত্বেও যেকোনো দেশে, এমনকি উন্নত দেশেও সব সংগঠন কিন্তু শ্রেণি সংগঠন নয়। অনেক ক্ষমতাশালী সংগঠন কিন্তু অন্য ধরনের সংগঠন, যাদের কর্মকাণ্ড আবার শ্রেণির ওপরে প্রভাব ফেলে। অথচ শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে তারা কিন্তু সংগঠিত হচ্ছে না।

প্রতিচিন্তা : হ্যাঁ, যেমন ধরেন যুক্তরাষ্ট্রে এখন যারা রুল করছে বা চায়নায় যারা রুল করছে বা বাংলাদেশে যারা রুল করছে, তাদের তো শ্রেণি দিয়ে চিহ্নিত করা যাচ্ছে এবং ভেতরের কোন্দল থাকার পরও তাদের ঐক্যের ভিত্তিটাও তো অনেক বেশি শ্রেণিগত।

মুশতাক খান : না, তা নয়। তারা কি তাদের শ্রেণির জন্য কাজ করছে? নাকি তারা তাদের গোষ্ঠীর জন্য কাজ করছে। এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

প্রতিচিন্তা : তখন প্রশ্ন আসবে যে তাদের গোষ্ঠীস্বার্থ কি তাদের শ্রেণিস্বার্থের চূড়ান্ত বিরুদ্ধে?

মুশতাক খান : না, বিরুদ্ধেও না, আবার পক্ষেও না। যেমন ধরেন আমি একটা কাল্পনিক ঘটনা বলছি : একটা শাসকগোষ্ঠী অনেক ধনী কিন্তু সেটা পুঁজিবাদী অর্থে নয়। তাদের মিল-ফ্যাক্টরি কিছু থাকলেও বেশির ভাগ টাকা দুবাই বা সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে থাকছে। ক্ষমতায় থাকার জন্য তারা অনেক রকমের রণকৌশল বের করতে পারে। যেমন তারা গরিবদের উসকে দিয়ে অন্য গরিবদের মারার জন্য ট্রাইবাল ভিত্তিতে বা ধর্মের ভিত্তিতে বা ভাষার ভিত্তিতে দাঙ্গা লাগাতে পারে। এটা করে তো সব ধনীর লাভ হচ্ছে না, কেবল ওই শাসকদেরই লাভ হচ্ছে। অন্য ধনী, যাদের মিল-ফ্যাক্টরি আছে, তাদের হয়তো সর্বনাশ হচ্ছে। অশান্তির ফলে তাদের মিল-ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাদের আয় কমে যাচ্ছে, উৎপাদন কমে যাচ্ছে। কিন্তু শাসক ধনীরা সেটা দেখছে না, তারা শুধু নিজের স্বার্থটা দেখছে।

প্রতিচিন্তা : তখন উৎপাদনশীল ধনিক শ্রেণিটা এই গোষ্ঠীকে একসময় ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ফেলবে।

মুশতাক খান : না, পারছে না তো। এটাই হচ্ছে পার্থক্য। পার্থক্যটা হচ্ছে যেখানে অগ্রসর ক্যাপিটালিজম হয়ে গেছে সেখানে হাজার হাজার উৎপাদনশীল এবং ক্ষমতাশালী সংগঠন তৈরি হয়ে গেছে। সেখানে একটা পাগল গোষ্ঠী যদি ক্ষমতায় আসেও এবং সে যদি নিজের ছোট স্বার্থে ওই উৎপাদনশীল খাতটাকে ধ্বংস করতে চায়, তখন বাধা আসে চারদিক থেকে। কারণ, যারা ধনী তারা সেখানে উৎপাদনশীল। যে বেশি উৎপাদনশীল, তার ক্ষমতাও বেশি সেখানে। আর আমাদের এখানে কিছু ধনী কিছুটা উৎপাদনশীল কিন্তু অনেকেই উৎপাদনশীল নয়। এখানে সে ধরনের প্রতিরোধ তাই বিরল। এটাই হচ্ছে উন্নত আর উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম পার্থক্য।

প্রতিচিন্তা : মানে ওখানে যারা উৎপাদনশীল, ক্ষমতার বণ্টনে তাদের হিস্যা আছে।

মুশতাক খান : বড় হিস্যা আছে।

প্রতিচিন্তা : আমাদের এখানে যারা ক্ষমতাশালী, তারা উৎপাদনশীল নয়। তাহলে কি এখানে ক্ষমতার বণ্টন হয়নি?

মুশতাক খান : মানে এখানে উৎপাদনের সেই প্রবৃদ্ধিটা হয়নি, সেই ব্যাপকতাটা আসেনি। যে জন্য আমাদের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ডলার, ৫০ হাজার ডলার নয়। কেন? কারণ, আমাদের যত রকমের অজস্র উৎপাদনশীল খাত দরকার, সেটা না হয়ে মাত্র চার হাজারটা ফ্যাক্টরি আছে পোশাক খাতে। এই খাতে যারা উৎপাদনশীল, তারা আরও টাকা বানাতে হলে কী করে? একপর্যায়ে তারা দেখে যে পোশাক খাতে ও রকম টাকা নেই। আমি যদি নির্বাচন করে এমপি হই, আমি আরও অনেক বেশি টাকা বানাতে পারব। পোশাক কারখানার মালিক এমপি হয়ে কি পোশাক খাতের স্বার্থ দেখছে? দেখছে না। তারা তখন গোষ্ঠীস্বার্থ দেখছে। অনুৎপাদনশীল খাতে টাকা বানানো এখানে বেশি আকর্ষণীয়। এখানে আপনি পরিষ্কার কোনো বিভাজন পাবেন না যে এই লোকটা সম্পূর্ণ উৎপাদনশীল আর এই লোকটা সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল। সবাই দুটোই করছে।

প্রতিচিন্তা : তাহলে এটার যে রাজনৈতিক অর্থনীতি, এটার কী নাম দেওয়া যায়? এ রকম উন্নয়ন একসময় হঠাৎ করে ধসে পড়তেও দেখা যাচ্ছে। যেমন শ্রীলঙ্কার কথা বলা যায়।

মুশতাক খান : এটা ট্রানজিশনাল বা রূপান্তরকালীন অবস্থা। একধরনের ধনতন্ত্রের

দিকে ট্রানজিশন হচ্ছে। এখানেই আসছে সবচেয়ে কৌতূহলী প্রশ্ন। যেখানে এ রকম মিশ্র প্রক্রিয়া চলে, সেখানে যখন কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী ক্ষমতায় এসে বলে যে উৎপাদনশীল খাত বাড়ানোই আমাদের স্বার্থ, তখন ওই দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। উৎপাদনশীল খাতের বহুমুখীকরণ হয়। একটার জায়গায় পঞ্চাশটা উৎপাদনশীল খাত বের হয়। আপনার টাকা যেটা চুরি হচ্ছে দেশে, তা দেশেই বিনিয়োগ করা হয়। দেশের মধ্যেই পুনরুৎপাদন হয়। এটা একটা সম্ভাবনা, তবে নির্ধারিত নয়। এটা নির্ভর করবে আপনার প্রাথমিক পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনটা কী ছিল, তার ওপর। আপনার শাসকগোষ্ঠী মানে যারা রুলিং কোয়ালিশন, তাদের চরিত্র তার নেটওয়ার্কগুলা কী ছিল, সে কীভাবে নিজের রিপ্রোডাকশন করছে তার ওপর। এখানে এজেন্সিও গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এই শাসক কোয়ালিশনকে কীভাবে ধাক্কা দিচ্ছি। কিন্তু ওই একই দেশে একসময় কিছুটা উন্নয়ন হওয়ার পর সব ধসে যেতে পারে। শ্রীলঙ্কার মতো দেশ আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। সেখানে শাসকগোষ্ঠী যদি ভাবে যে আমরা এখন উৎপাদনশীল খাতকে সাপোর্ট না করে যুদ্ধ করি তামিল মারি, সিংহলি আধিপত্য বিস্তার করি; করতে গিয়ে উৎপাদনশীল খাতকে ধ্বংস করে ফেললাম! এটাও সম্ভব। সরল মার্ক্সবাদীরা যেটা বলে যে ধনী তার নিজের স্বার্থেই উৎপাদন বাড়াতে থাকবে। আমার কথা হচ্ছে, পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট তা বলছে না। এখানে অনেক রকমের পরিণতি হতে পারে। এ মুহূর্তে শাসকগোষ্ঠী কীভাবে তার স্বার্থ দেখছে, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। সেই স্বার্থ কায়েম করার জন্য কী করছে এবং তা করতে গিয়ে সে উৎপাদনশীল খাতকে ত্বরান্বিত করছে কি করছে না।

প্রতিচিন্তা : দুটি প্রশ্ন—একটা হচ্ছে পাকিস্তান ষাটের দশকে কিছুটা উন্নতি করতে করতে ব্যর্থ হয়ে গেল। একই সময়ে যাত্রা করা দক্ষিণ কোরিয়া এগিয়ে গেল। পাকিস্তান কেন ব্যর্থ হলো আর দক্ষিণ কোরিয়া কেন সফল হলো? দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কার মতো রাষ্ট্র উন্নতি করতে গিয়ে জাতীয়তাবাদী হিংসার দিকে চলে গেল। তেমনি ভারত ও বাংলাদেশেও কি অনুরূপ লক্ষণ আছে? উন্নতির মাঝপথে এসব রাষ্ট্রও তো মতাদর্শিক অথবা সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দিকে চলে যাচ্ছে।

মুশতাক খান : প্রথমটা খুবই ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন এবং এটা নিয়ে আমার অনেক লেখালেখি আছে। খুব সংক্ষেপে বলব। সে সময়ের পাকিস্তান এক পাকিস্তান ছিল—পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। ষাটের দশকের পাকিস্তান ও দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনা করতে গিয়েই আমার পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট চিন্তাধারার আবির্ভাব হয়। দুটো দেশ ষাটের দশকে অনেক ক্ষেত্রে দেখতে একই রকম ছিল।

মাথাপিছু আয় প্রায় সমান সমান। দুই দেশেই একধরনের কর্তৃত্ববাদী বা মিলিটারি সরকার ছিল। দুই দেশেই ওপর থেকে চাপানো তথাকথিত ডেমোক্রেসি ছিল। গুটিকয় বড় কোম্পানির হাতে অনেক পয়সা ঢেলে তাদের উৎপাদনশীল বানিয়ে দুই দেশই রপ্তানিমুখী অর্থনীতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো উন্নয়নের এই মডেলটা আগে শুরু হয় কিন্তু পাকিস্তানে। দুই দেশই যেহেতু তখন মার্কিন মিত্র, তাই মার্কিনরা তখন দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতিবিদদের পাকিস্তানে পাঠায় পরিকল্পনার বিষয়গুলো শিখতে। এখানে এসে তারা শিখেও যায়। ষাটের দশকের ছেষট্টি-সাতষট্টি পর্যন্ত পাকিস্তানে খুব দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়। পূর্ব পাকিস্তানেও হয়। কিন্তু তারপর থেকে দুই পাকিস্তানেই মন্থরগতি শুরু হয়। তারপর তো একটা যুদ্ধ হয়ে দেশটাই ভেঙে যায়। ওই দিকে দক্ষিণ কোরিয়ায় এই উন্নতি ৩০ বছর টিকে থাকে এবং ওই প্রবৃদ্ধির হারের ফলে একটা গরিব দেশ উন্নত দেশের মর্যাদায় পৌঁছায়। এই বিপরীত যাত্রার অনেকগুলো কারণ আছে। আমি যে কারণের ওপর নজর ফেলছি সেটা হচ্ছে, যে পলিসিগুলো কোরীয়রা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছিল, পাকিস্তানিরা তা পারেনি। এই ব্যর্থতার গোড়া খুঁজতে আমি ক্ষমতার বিন্যাসে মনোযোগ দিতে শুরু করি। কোরিয়ায় যাদের চেবল (চে= সম্পদ, বল= গোষ্ঠী) বলা হয়, এমন কয়েকটা কোম্পানিকে বিরাট আকারে সরকারি অর্থ দিল ব্যাংকগুলো। তাদের ঋণ দিল, আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা হলো। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে দাম বাড়ল, বাজারে বিক্রি করতে পারল। রপ্তানির জন্য ভর্তুকিও দেওয়া হলো। পাকিস্তানেও সেই একই কাজ করা হয়েছিল। কিন্তু কোরিয়ায় উৎপাদনশীল খাত বাড়তে থাকল, পাকিস্তানে বাড়ল না। কেন? ওখানে একজন উদ্যোক্তা ব্যাংকের টাকা নিয়ে, সুযোগ-সুবিধা নিয়ে যখন রপ্তানি করতে ব্যর্থ হয়, তখন সরকার শুধু তার ঋণ ফেরত নিত না, কোম্পানিটাও নিয়ে নিত। বলত তুমি চালাতে পারবে না, কোম্পানিটা আরেকজনকে দিয়ে দিচ্ছি। তার মানে যে কারখানা চালাতে ব্যর্থ হবে, যে শুধু টাকাই ফেরত দিতে বাধ্য হবে না, সে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সে কারণেই দেখা যায়, এ রকম ঘটনার পরে ধনী ব্যবসায়ীরা রাত জেগে খেটে ব্যবসার উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করেছে। কোরীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে পাকিস্তানি নেতাদের চেয়ে ভালো ছিল বা দেশের ভালো চেয়েছে, তা নয়। তারাও দুর্নীতিবাজ আর স্বার্থপর ছিল। আমার পিএইচডি থিসিসটা ছিল এই দুই দেশের করাপশন অ্যান্ড ক্লায়েন্টালিজম নিয়ে। কোরিয়ার জেনারেল পার্ক চুং-হির সরকার সাংঘাতিক দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল।

কিন্তু তাদের হিসাব খুব সহজ ছিল। উৎপাদনশীল লোককে টাকা দিলে সে শুধু আমাকে টাকার ভাগ দেবে না, মুনাফার ভাগও দেবে। মুনাফার ভাগ ঋণের টাকার ভাগের চেয়ে অনেক বেশি। আর যে অনুৎপাদনশীল লোককে আমি টাকা দিচ্ছি; সে খালি চুরির টাকার ভাগ দিতে পারবে, মুনাফার ভাগ দিতে পারবে না। এটা তো খুব সহজ হিসাব। পাকিস্তানে এটা সম্ভব হলো না।

পাকিস্তানে ষাটের শেষাশেষি পত্রপত্রিকায় প্রচার শুরু হলো যে ২২ পরিবার সব টাকা চুরি করে ফেলছে। এই ২২ পরিবারের বিরুদ্ধে জেনারেল আইয়ুব খান সরকার অনেক পদক্ষেপ নিল। তাদের নাম ঘোষণা করা হলো পত্রিকায়। কিন্তু আইয়ুব খানের মতো কর্তৃত্ববাদী সরকারও তাদের কাছ থেকে টাকা ফেরত আনতে পারেনি। কেন পারেনি? এমন না যে সরকার তাদের চুরিতে সায় দিয়েছে। বরং তারা টাকা ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই ২২ পরিবারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কিন্তু সরকারই উসকে দিয়েছে। ২২ ফ্যামিলির বিরুদ্ধে বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলনও হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে টাকা ফেরত নিতে পারল না কেন? সেখানেই হচ্ছে এই পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের ঘটনাটা। একটু ভেতরে যখন আমি গেলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে আমাকে ইতিহাসে ফেরত যেতে হবে। পাকিস্তানে যারা ব্যবসায়ী, তাদের লেনদেন আর নেটওয়ার্ক ছিল আমলাতন্ত্রের সঙ্গে, ব্যাংকের সঙ্গে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। এতগুলো শক্তিকে পরাস্ত করা একা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় কুলাত না। এ জন্যই আইয়ুব খান তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন উসকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তো ঋণের টাকা ভাগ করে ফেলেছে নিজেদের ভেতরে। আমলারা পেয়েছে, ব্যাংক পেয়েছে, রাজনৈতিক নেতারা পেয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের যদি একটা সরকার থাকে যে রাস্তায় এসে মানুষকে গুলি করতে পারে, তার মানে এই নয় যে সে সব ক্ষেত্রে পাওয়ারফুল। সেই একই সরকার হয়তো ব্যাংকের থেকে টাকা ফেরত আনতে পারবে না। পাচার হওয়া টাকা ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু সে যুদ্ধ করতে পারবে। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ইনফরমাল নেটওয়ার্ক আছে রাজনীতির সঙ্গে, প্রশাসনের সঙ্গে, ব্যাংকের সঙ্গে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে। ফলে এরা যখন টাকা নেয়, এই টাকা ফেরত নেওয়া সম্ভব হয় না। পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখলে কিন্তু সঠিক চিত্রটা পাবেন না।

প্রতিচিন্তা : পাকিস্তানে রাষ্ট্র ও ধনিকশ্রেণির মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যশ্রেণি ছিল। কোরিয়ার মধ্যশ্রেণি কি এই দুর্নীতির অংশীদার ছিল না?

মুশতাক খান : এ প্রসঙ্গে আপনাকে জাপানি বনাম ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ইতিহাসে যেতে হবে। আমার লেখায় পাবেন। জাপানি উপনিবেশবাদ কোরিয়ার মধ্যশ্রেণিটাকে একেবারে ভেঙে ফেলেছিল। কোরিয়ায়, তাইওয়ানে, মাঞ্চুরিয়ায় তারা কিন্তু সরাসরি শাসন করেছিল। বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মধ্যকার নেটওয়ার্ককে জাপানিরা একেবারে ভেঙে ফেলেছিল। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে বা লোকাল এলিট তথা জমিদার ও আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে রাজত্ব করেনি। যখন পার্ক চুং-হিরা ষাটের দশকে কোরিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি বাস্তবায়নে নামল, মধ্যস্বত্বভোগী নেটওয়ার্কগুলো তখন সেখানে ছিল না বা অত্যন্ত দুর্বল ছিল।

প্রতিচিন্তা : মানে সাংবাদিক, উকিল, পেশাজীবী, পলিটিশিয়ান, নেতা, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি।

মুশতাক খান : আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী আর রাজনৈতিক দল এই তিনটা বড় জিনিস। এদের মধ্যে যে নেটওয়ার্ক, সেটা কোরিয়ায় একেবারেই ছিল না। ব্রিটেন একটা ছোট দেশ এবং অনেক দূরের দেশ। আর জাপান কোরিয়ার একেবারে পাশের বড় দেশ। ব্রিটিশরা ইন্ডিয়ায়, আফ্রিকায় একটা মধ্যশ্রেণি বা ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস বানাল। এরা আমলা, উকিল, এরা রাজনৈতিক সেকশনের লোক, জমিদারও ছিল। হ্যাঁ, এসব শ্রেণিকে দিয়ে তারা রাজত্ব করেছে। এদের মধ্যে তখন লেনদেন শুরু হয়, ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব হয় এবং সেই দ্বন্দ্বগুলোকে ব্রিটিশরা ব্যবহার করত। কোনো সময় ধর্ম, কোনো সময় ভাষা, কোনো সময় শ্রেণির দ্বন্দ্ব। এক গ্রুপকে আরেক গ্রুপের বিরুদ্ধে লাগিয়ে তারা রাজত্ব করত। কিন্তু এর ফলে কী হলো? দুই শ বছরে গ্রুপগুলোর মধ্যে নিবিড় নেটওয়ার্ক সিস্টেম তৈরি হয়ে গেল। খুব সহজে আমরা একে অপরের সঙ্গে লেনদেন শিখে গেলাম। ব্রিটিশরা চলে গেলেও গ্রুপগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি, অর্থ হাসিল করা চালিয়ে গেল। এটার ওপর যখন আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি আনলাম, তখন তা বাস্তবায়নের কোনো সুযোগই ওই মধ্যস্বত্বভোগী নেটওয়ার্কগুলো দিল না। আগেই বলেছি যে আইনের থেকে বড় হচ্ছে আইনটাকে প্রয়োগ করতে পারি কি না। তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসির আইন তো খুব সুন্দর আইন কিন্তু আমরা প্রয়োগ করতে পারিনি। দক্ষিণ কোরিয়ায় একই আইন তারা কার্যকর করতে পেরেছিল। এবং এ জন্যই আপনাকে পাওয়ার স্ট্রাকচার মানে ক্ষমতাকাঠামো বুঝতে হবে।

প্রতিচিন্তা : তাহলে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শুরু হলো কীভাবে?

মুশতাক খান : সত্তরের দশক থেকে আমরা বদলাতে শুরু করলাম। ওই পর্যন্ত কিন্তু আগের ব্যর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি কাজ করছিল। তারপর অনেক পরিবর্তন হয়েছে, যেসবের কৃতিত্ব কিন্তু আমরা পুরোপুরি নিতে পারি না।

প্রতিচিন্তা : আপনার অনেক লেখার মধ্যে গল্পটা আছে। কিন্তু এখানে বক্তব্যের পরম্পরার জন্য কথাটা আবার বলা দরকার। সাধারণ প্রশ্ন এটাই আসবে যে এখানে মধ্যশ্রেণির ভূমিকা কী ছিল? শাসকেরা কী চেয়েছিল?

মুশতাক খান : হ্যাঁ, এখানে মূল সমস্যাটা কী? আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদন বাড়ে না কেন? বাড়ে না কারণ, উৎপাদনের জন্য সাংগঠনিক শক্তি দরকার, যেটাকে আমার কাজে আমি অর্গানাইজেশনাল ক্যাপাবিলিটি বলি। আপনি মেশিন কিনতে পারেন, আপনার দক্ষ শ্রমিক থাকতে পারে কিন্তু একই মেশিন দিয়ে আপনার উৎপাদনশীলতা আরেকটা দেশের তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগ হতে পারে। কারণ, অনেকগুলো মেশিন একসঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, এটার সাপ্লাই চেইন কীভাবে ঠিক রাখতে হয়, মান কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, ইনভেন্টরি কীভাবে ম্যানেজ করতে হয়, সেটা আপনি জানেন না। এটা কোনো বই-পুস্তকে বা হার্ভার্ডে এমবিএ করে শিখতে পারবেন না। আপনাকে ফ্যাক্টরিতে কাজ করে সাপ্লাই চেইনে কাজ করে শিখতে হবে।

প্রতিচিন্তা : খুব ইন্টারেস্টিং যে পাকিস্তানের থেকে কোরিয়ানরা শিখতে চাইল, কিন্তু পাকিস্তান পারল না। আবার সত্তর দশকের শেষে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা সেই কোরিয়া থেকেই শিখে এসে পোশাক খাত বিকশিত করলেন। যাকে বলে 'লার্নিং বাই ডুয়িং'?

মুশতাক খান : একদম তা-ই। আপনি যদি লার্নিং বাই ডুয়িং করতে চান, আপনি যদি সাংগঠনিক ক্ষমতাটা রপ্ত করতে চান, আপনাকে অর্থ ঢালতে হবে। কারণ, এই শেখার সময় তো আপনি প্রফিট করছেন না। এটার জন্য একধরনের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভর্তুকি দরকার। এখন তোমার ভর্তুকি দরকার, কারণ তোমার উৎপাদনশীলতা কম। তুমি লার্নিং বাই ডুয়িং করবে (কাজের মাধ্যমে শেখা) তোমার সাংগঠনিক সক্ষমতা বাড়বে। তখন তোমার ভর্তুকিটা সরিয়ে ফেলব। যখন আমি ভর্তুকি পাচ্ছি কিন্তু আমার উৎপাদনক্ষমতা কম, তখন আমাকে তো সাংঘাতিক খাটতে হবে। এটা তো কেউ নিজে নিজে করতে চায় না। কোরীয়রা করেছিল। কারণ, তারা জানত যে না করলে আমি শুধু ভর্তুকিটা হারাব না, আমার কোম্পানিটাও হারাব। অর্থাৎ জীবন রক্ষা করার জন্য আমাকে মরিয়া হয়ে কাজ করতে হচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তানে যা হলো

তা বেশির ভাগ দেশে হয়েছে। আমি সরকারের ভর্তুকি পেয়েছি, আমি এত কষ্ট করব কেন। আমি যদি একটু লাইন লাগাই, আমি যদি আমার নেটওয়ার্কে একটু খরচ করি, তাহলে তারাই আমার ভর্তুকি পেতে থাকা নিশ্চিত করবে। আমাদের বাংলাদেশে ১৯৭৭-৭৮ সালের দিকে কী হলো? রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় থাকা পাট ও ভারী শিল্পগুলো খুব একটা প্রফিটেবল ছিল না। কিন্তু যথেষ্ট ভর্তুকি পাচ্ছিল এবং ওই ভর্তুকি ও ব্যাংকের ঋণ নিয়ে তারা সন্তুষ্ট ছিল। এখানে আমাদের যেটা সৌভাগ্য যে আমেরিকানরা একটা আইন করল এমএফএ বা মাল্টিফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট। এটা তারা করল নিজের পোশাকশিল্প রক্ষার জন্য। উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে যারা বেশি উন্নত যেমন কোরিয়া, তুরস্ক, মেক্সিকোর ওপর কোটা দিয়ে দিল, তাদের থেকে পোশাক আমদানি বন্ধ করে দিল এবং তারা বলল যে যেসব দেশে কোনো পোশাকশিল্প নেই, অনুন্নত এলডিসিভুক্ত দেশ, তাদের জন্য কোনো কোটা নেই। তারা যদি ন্যূনতম উৎপাদনশীলতা আনতে পারে, তবে মার্কিন বাজারে বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে। তখন আমাদের উদ্যোক্তা ছিলেন দেশ গার্মেন্টসের নুরুল কাদের খান। ওনার তো মেশিন কেনার টাকা ছিল, শ্রমিক ছিল। কিন্তু শ্রমিক আর মেশিনটাকে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানের একটা শার্ট কীভাবে তৈরি করতে হবে, তা তো জানা ছিল না। এই শেখার টাকাটা কোত্থেকে আসবে। দক্ষিণ কোরিয়ার মতো রাষ্ট্র থাকলে রাষ্ট্র ভর্তুকি দিতে পারত আর উদ্যোক্তারা ভয়ে উদ্যোগের মাত্রা ঠিক রাখত। আমাদের রাষ্ট্র সেটা পারে না। সে জন্য এখানে একটা নতুন সিস্টেম আকস্মিকভাবে বের হয়ে এল। সিস্টেমটা কী ছিল? যেহেতু মার্কিন বাজারে কোটার কারণে দাম বেড়ে গিয়েছিল, বাংলাদেশ পোশাক বানাতে পারলে বাড়তি মুনাফাটা পাবে, আর তাই কোরিয়ার দাইয়ু কোম্পানি বাংলাদেশের ব্যাপারে আগ্রহী হলো। তখন নুরুল কাদেরের দেশ গার্মেন্টসের সঙ্গে কোরীয় দাইয়ুর চুক্তি হলো। দাইয়ু ওই বাড়তি মুনাফাটার প্রায় সবটাই পাবে, বিনিময়ে তারা আমাদের প্রশিক্ষণ দেবে। দাইয়ু বলল, তোমরা লোক পাঠাও, আমরা বুসানের কারখানায় তোমাদের শিখিয়ে দেব। তারা যখন ফেরত গিয়ে রপ্তানি করবে, তুমি তখন আমাকে বিক্রয়মূল্যের ৮ পারসেন্ট দেবে। এখন দেখেন ইনসেনটিভগুলো, এগুলো কিন্তু কোনো সরকারকে চাপাতে হয়নি। বাংলাদেশ থেকে যারা বুসানে গেল, তারা বুঝল আমরা যত বেশি দিন এখানে থাকব, তত লোকসান। কারণ, বুসানে আমরা কোনো টাকা বানাচ্ছি না। কোরীয়রাও জানে এদের বসিয়ে রাখলে তাদের

খরচ বাড়বে। অর্থাৎ বাংলাদেশিরা এবং কোরীয়রা দুজনই চেয়েছে যে স্বল্পতম সময়ে কাজটা সারতে। দুই বছরের জায়গায় ছয় মাসের মধ্যে তারা শিখে গেল। অর্থাৎ বাঙালিরা যখন চায় তখন পারে। বেশির ভাগ সময় আমরা চাই না। সমস্যাটা সেখানে। ছয় মাসের মধ্যে চলে এল দেড় শ মিডল ম্যানেজমেন্টের লোক। এই মিডল ম্যানেজমেন্ট রপ্তানি শুরু করলে প্রথম বছরে উৎপাদন দ্বিগুণ হয়ে গেল। তারপর এই দেড় শ লোক আস্তে আস্তে একেকজন করে সরে গিয়ে নিজের ফ্যাক্টরি করল। ১৩০টা ফ্যাক্টরি হয়ে গেল। দেশ গার্মেন্টসের মালিক তাদের থামাননি। কারণ, তাঁরা জানেন ক্লাস্টারিং হলে অনেক বেশি অর্ডার আসবে। এটা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে হয়েছে। পেছনের পলিসিটা আমরা করিনি, আমেরিকানরা তাদের স্বার্থে করেছে। তার ফলেই কিন্তু এই বাড়তি প্রফিট আসছে। যে প্রফিট ব্যবহার করে আমাদের শিক্ষণ হয়েছে। পলিসিটা এমন ছিল যে প্রাসঙ্গিক সংগঠনগুলোর (দেশ গার্মেন্টস এবং তাদের অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক, দক্ষিণ কোরিয়ার দাইয়ু, বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠী) তাদের ক্ষমতার ভারসাম্য ব্যবহার করে শিক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ (এমএফএর বাড়তি মুনাফা), উৎপাদনশীলতা না বাড়িয়ে কোনো উপায় ছিল না। এখন আমাদের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এই ধরনের পলিসি অন্যান্য সেক্টরে করা। কারণ, আমাদের আরও অনেক শিল্পকারখানা লাগবে। বিদেশি কোনো কোম্পানি যে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতামূলক ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের কারখানা করতে পারে, তাকে বলতে হবে তুমি যদি একটা বাংলাদেশি কোম্পানির মানোন্নয়ন করে এত টাকা রপ্তানি করাতে পারো, তাহলে তোমাকে এত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। শুধু এই একটা জায়গা যদি দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখতে পারি, তাহলে দেখবেন বাংলাদেশিরা নতুন নতুন খাত সৃষ্টি করতে পারছে। ওই যে বললাম, আসলে শাসকগোষ্ঠী কী চায়। তারা যদি উন্নতি চায় তাহলে এসব শিক্ষা তারা নেয় না কেন। এখানে নতুন শিল্প তৈরি করে না কেন। ওই পোশাক খাত নিয়ে আমরা বসে আছি। ওই লোকগুলোই সব এমপি হয়ে বসে আছে।

প্রতিচিন্তা : জরুরি অবস্থার সময় সুশাসন, সরকারি প্রকল্পে ট্রান্সপারেন্সি, দুর্নীতি দূর করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। কর্তৃত্ববাদী সরকার, লাগামছাড়া দুর্নীতি এবং যাকে বলা হচ্ছে ভুল প্রকল্প ভুল নীতি ইত্যাদি হলো।

মুশতাক খান : একদম। সুশাসনের যে কাঠামো নিয়ে আমরা কাজ করি, তা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টের বিশ্লেষণে আবার ফিরে আসি। আইনের শাসনের মানেটা কী? আইনের শাসন মানে হচ্ছে

ব্যক্তি পরিচয়-নির্বিশেষে যদি কেউ ধরা পড়ে যে সে আইন ভঙ্গ করেছে, তবে তার শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা সবার মতোই হবে। কিন্তু আমি আইন ভাঙলে আমার শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা জিরো আর আপনি আইন ভাঙলে শাস্তি পাবেন; এটা আইনের শাসন নয়। আইনের শাসন কখন হয়? আইনের শাসন তখনই হয়, যখন উৎপাদনশীল আর ক্ষমতাশালীর সংখ্যা হয় অনেক বেশি। জরুরি সরকারের উচিত ছিল এমন কিছু সংস্কার করা, যেগুলো আমাদের পাওয়ার স্ট্রাকচারে টেকসই হয়। আমাদের পাওয়ার স্ট্রাকচারে যতটা চেক অ্যান্ড ব্যালান্স ছিল, সেগুলো যাতে টেকে। যেমন আমাদের টু পার্টি রুল ছিল। এর মাধ্যমে একটা ব্যালান্স ছিল। তারা এই রুল অব ল করতে গিয়ে একটা পার্টিকে সুযোগ দিল। তারা না বুঝে সংস্কার করতে গিয়ে পুরো জিনিসটাকে উল্টে দিয়ে ওয়ান পার্টি রুল নিয়ে এল। তাহলে লাভটা কী হলো? এটার জন্য তো জরুরি অবস্থাকালীন সরকার দায়ী। তারা সব নেতাকে, ব্যবসায়ীকে জেলে ভরল। ভরে কী দেখল? যখন বিচারে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আসে, কেউ সাক্ষ্য দেয় না। সাক্ষী লোকগুলো ভালো করেই জানে যে একদিন তো এরা চলে যাবে, তারপর আমার কী হবে? আমি যদি আমার সমতুল্য লোকগুলোকে সমস্যায় ফেলি, তারা তো আমার সঙ্গে ব্যবসা করবে না, প্রতিশোধ নেবে। ফলে উল্টো হলো। আমাদের মতো দেশে যদি কেউ ক্ষমতাশালীদের ওপর আইন চাপাতে চায়, সে টিকতে পারে না। যে আইনজীবী, যে বিচারপতি সত্যিকার অর্থে আইন মানেন, তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আর যেখানে সমাজের পাওয়ারটা অনেক বেশি বিস্তৃত, যেখানে ক্ষমতাসীনেরা অনেক বেশি প্রোডাক্টিভ, সেখানে যদি কোনো বিচারপতি ভুল রায় দেন, তাঁকে সরিয়ে ফেলা হবে। আমাদের এখানে যারা ক্ষমতাসীন, তাদের সংখ্যা কম, সবাই সবাইকে চেনে, অনেক ক্ষেত্রে তারা কম উৎপাদনশীল। ব্যক্তিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আপনাকে স্ট্রাকচারটা বুঝতে হবে। এ রকম দেশে সংস্কারগুলোকে ইনক্রিমেন্টাল বা ধাপে ধাপে আনতে হবে। ধাপে ধাপে আনলে যারা ক্ষমতাশালী আছে, কিছুটা তাদের স্বার্থেও হবে আবার কিছুটা জনগণের স্বার্থেও হবে। এই যে সমন্বয়, এর জন্য যে বুদ্ধি ও আর্ট দরকার, সেটা এখনো আমাদের হয়নি। গুড গভর্ন্যান্স কে আনবে, কার স্বার্থে আনবে? কোন শক্তি আছে বাংলাদেশে যে গুড গভর্ন্যান্স চায়?

প্রতিচিন্তা : ভারতে তো অনেক উৎপাদনশীল গ্রুপ আছে, সেখানে আইনের শাসন ভালো অবস্থায় নেই কেন?

মুশতাক খান : ভারতের জনসংখ্যা আর অর্থনীতির তুলনায় তাদের উৎপাদনশীল গ্রুপের সংখ্যা আমাদের মতোই সীমিত। ভারতের মাথাপিছু আয় আর বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় প্রায় এক। ভারতের পার্থক্য হচ্ছে ওখানে বিশাল কয়েকটি কোম্পানি আছে। হ্যাঁ, ওদের গাড়ির শিল্প আছে, আমাদের নেই। আদানি, আম্বানির মতো বিলিয়নিয়ার আছে, কিন্তু ওদের যে দরিদ্র, অতিদরিদ্র, তা আমাদের থেকে বেশি। অর্থনীতির একটা বড় অংশ ইনফরমাল সেক্টরে। ওখানেও আম্বানি, আদানির জন্য একভাবে আইন প্রয়োগ করা হয়, ছোট ব্যবসায়ীর জন্য আরেকভাবে। দলিত ও মুসলমানদের তো কথাই নেই। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে হঠাৎ করে আইনের শাসন আসবে না। সে পথে অগ্রসর হওয়ার বাস্তবমুখী কৌশল প্রগতিশীল রাজনীতিক আর সমাজ-সংস্কারকদের শনাক্ত করতে হবে।

প্রতিচিন্তা : মার্কিন রাজনৈতিক বিজ্ঞানী মার্টিন সিম্যুর লিপসেটের তত্ত্ব ছিল যে মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে গেলে গণতন্ত্র আসবে। পর্তুগালের পর্যায়ে গেলে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন আসবে।

মুশতাক খান : এটা তো ভুল। না না না।

প্রতিচিন্তা : দেখা যাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বরং কর্তৃত্ববাদী সরকারই চলে আসছে।

মুশতাক খান : না, আপনাকে নেসেসারি (জরুরি) আর সাফিশিয়েন্ট (পর্যাপ্ত) কন্ডিশন বুঝতে হবে। নেসেসারি কন্ডিশন হচ্ছে সত্যিকার আইনের শাসন চাইলে আপনাকে সমাজের মধ্যে চেক অ্যান্ড ব্যালান্স রাখতে হবে। সেটা কোন মাথাপিছু আয়ে হবে সেটা নির্ভর করবে প্রযুক্তির ওপর। তেল উৎপাদন করে আপনার যদি ৩০ হাজার ডলার পার ক্যাপিটা ইনকাম হয়, আপনার কিন্তু তখন চেক অ্যান্ড ব্যালান্স নেই। কারণ, দুটি খনি থেকে সব আসছে। আপনার সমাজের মধ্যে যথেষ্ট কার্যকর অভ্যন্তরীণ চেক অ্যান্ড ব্যালান্স তখনই আসবে, যখন আপনার সমাজে অনেক উৎপাদনশীল খাত হয়ে গেছে আর হাজার হাজার ক্ষমতাশালী সংস্থা হয়ে গেছে, যারা নিজ স্বার্থে আইনের শাসন চায় এবং তারা নিজ ক্ষমতা আর অর্থ ব্যবহার করে তা নিশ্চিত করবে। এটা জরুরি শর্ত কিন্তু যথেষ্ট নয়। তারপর নেতৃত্ব, আন্দোলন, যুদ্ধের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু জরুরি শর্ত ঠিক থাকলে, রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়ে গেলে তা টেকসই হয়, যেমনটা হয়েছিল পর্তুগালে ১৯৭৪ সালে।

প্রতিচিন্তা : মধ্যবিত্ত নিজেও কি সবার সমান অধিকার চায়?

মুশতাক খান : মধ্যবিত্ত নিজেও চায় না। কোনো মানুষই, সে যে শ্রেণিরই হোক না কেন, পারলে নিজের জন্য বেশি সুবিধা নেবে। আমি পীর-পয়গম্বরদের কথা বলছি না, সাধারণ মানুষের কথা বলছি। আমি-আপনি হাসপাতালে গেলে কি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই? চাই না। আমরা যদি পারি নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আগে চলে যাই, আইনের অধিকার ধরে লাইনে এগোই না। এটা শুধু বাংলাদেশে নয়, যেকোনো উন্নয়নশীল দেশে এটাই হচ্ছে। মানুষ অন্যের অধিকার স্বীকার করে তখন, যখন ক্ষমতার ভারসাম্য তাকে তা করতে বাধ্য করে।

প্রতিচিন্তা : তাহলে এগোনোর পথ কী?

মুশতাক খান : পথ অবশ্যই আছে। কোনো পলিসি কেন কাজ করেনি, তা বুঝতে ইতিহাস বুঝতে হবে। কারণ, আমার পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ওটার সঙ্গে খাপ খায় না। একই সঙ্গে আমরা এমন পলিসি চাই, যার ফলে আমাদের ক্ষমতার বণ্টন আরও অন্তর্ভুক্তির দিকে বাড়বে। ক্ষমতাসম্পন্নদের স্বার্থ ব্যবহার করে আমি এখানে যদি নতুন শিল্প করতে পারি, আর তাতে যদি আর দশটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যদি পলিটিক্যাল কম্পিটিশনটা বাড়াতে পারি, এখানে যদি আমি বাক্‌স্বাধীনতা এতটুকুও বাড়াতে পারি, এটার ফলে আমাদের পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন রেখা সমান হতে থাকবে। এটাই বাস্তবমুখী পথ। আমার নরমাটিভ গোলটা কী বা আদর্শিক লক্ষ্যটা কী? আমি কোন দিকে যেতে চাই। আমি যেতে চাই এমন একটা বাংলাদেশের দিকে, যেখানে পাওয়ারটা আরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত থাকে। শতভাগ সমান কোনো দিন হবে না। কিন্তু আরও হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান দরকার আমাদের, যারা পাওয়ারফুল। যারা চেক অ্যান্ড ব্যালান্স করতে করতে একসময় তারাই আইনের শাসন নিজেই চাইবে, যার সেটা নিশ্চিত করার ক্ষমতা আছে। এই লক্ষ্যের দিকে যাওয়ার জন্য কোন ধরনের পলিসি দরকার? যে পলিসিটা শুধু ভালো হলেই হবে না, বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে। যে পলিসিটা আমাদের বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে খাপ খায়। আমি যেখানে আছি, আমাকে সেখান থেকে শুরু করতে হবে। এ ধরনের গবেষণা চালানো খুব কঠিন। পরিবর্তনের কাজটা আরও কঠিন; কারণ, ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা বেশির ভাগ সময় দেশের ক্ষতি করেন। তাঁদের ক্ষমতা দেশের কাজে লাগানো মোটেও সহজ কাজ নয়।

প্রতিচিন্তা : উপমহাদেশের রাজনীতি এখন বিভক্তির ওপর চলছে। ভারতে

জনপ্রিয় সরকার টিকে আছে, তবে অনেক রকমের সংঘাত বেড়েছে, অর্থনীতির দশাও ভালো নয়। বাংলাদেশেও উন্নয়ন দৃশ্যমান কিন্তু মানুষের যে হতাশা, ক্ষোভ, বঞ্চনা, তা বাড়ছে। রাজনৈতিক বঞ্চনাও বাড়ছে। বিরাট এক সংঘাতের টেনশন সমাজে থাকছে। এই পরিস্থিতির গতিধারা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

মুশতাক খান : এ জন্যই রাজনৈতিক বন্দোবস্তের বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। শাসকগোষ্ঠী কোন পদ্ধতিতে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চায়? এখন ক্ষমতায় থাকার সহজ একটা উপায় হচ্ছে নিজের দেশে একটা সংখ্যালঘু বা একটা গ্রুপকে শনাক্ত করা, যাদের শত্রু বলে দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বাকি সবাইকে আমি জড়ো করতে পারি, তাহলে অর্থনৈতিক দিকে আমি কী করছি, কোথায় দারিদ্র্য বাড়ছে, সেটার দিকে মানুষ তাকাবে না। এটা মানুষেরই দোষ। মানুষ ভালো আর নেতৃত্ব খারাপ, এটা ঠিক নয়। আমাদের মতো দেশে বাইরের বা ভিন্ন মতবাদের বা ভিন্ন ধর্মের বা ভিন্ন ভাষার লোকের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরি করা অতিরিক্ত সহজ। গোষ্ঠীর সঙ্গে থাকা এবং বাইরের লোককে খারাপ চোখে দেখা হয়তো মানবজাতির মস্তিষ্কের হার্ডওয়্যারের মধ্যেই আছে, কিন্তু এটার অপব্যবহার উন্নয়নশীল দেশে সহজতর। কারণ, এখানে উৎপাদনশীল খাত কম, অল্পতেই মানুষকে উসকে অন্যের স্বত্ব দখলের কাজে আনা যায়। যে এটা পরিচালিত করতে পারে, তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে অনেক সস্তায়। কারণ, কাউকে কিছু দিতে হচ্ছে না। এটা উন্নত দেশেও হয়। মার্গারেট থ্যাচার যখন প্রায় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছিলেন, তখন তিনি ফকল্যান্ড যুদ্ধ শুরু করলেন। এরপর তিনি এমন জনপ্রিয় হয়ে গেলেন যে আরও কয়েক বছর টিকলেন। আপনি বাইরের শত্রু বা ভেতরের সংখ্যালঘু শত্রু শনাক্ত করে কম খরচে টিকে থাকতে পারেন। তবে উন্নত দেশে আরও অনেক উৎপাদনশীল শক্তি আছে, যারা এক হয়ে চাপ দেবে অন্তত অভ্যন্তরীণ দাঙ্গা থামাতে। কারণ, এতে তাদের উৎপাদন আর মুনাফা কমে যায় এবং তারাই ক্ষমতাশালী। ট্রাম্পকে যেমন সরতে হলো।

প্রতিচিন্তা : বিভাজনের রাজনীতির দিক থেকে বাংলাদেশ কোথায় অবস্থান করে?

মুশতাক খান : আমাদের বাংলাদেশের একটা বিশাল সৌভাগ্য আছে। এটাই উপমহাদেশের একমাত্র দেশ, যেটা ১৯৪৭ ও ১৯৭১—এ দুটি বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে আমাদের মধ্যে বিভক্তিগুলো কমে এসেছে। মানে ৯০ ভাগের বেশি বাঙালি, ৯০ ভাগের বেশি মুসলমান। তাই এখানে বিভক্তির খেলা খুব কঠিন। কারণ, বিভাজনের খেলা খেলে এখানে খুব একটা কিছু দিতে পারবে না। কিন্তু ভারতে সেটা নেই, পাকিস্তানেও না আর শ্রীলঙ্কাতেও নয়।

ভারতে তো মূলধারার রাজনীতি হিন্দু বনাম মুসলমান হয়ে গেছে। আমার ভয় হলো এর নেতিবাচক ফল আমাদের ওপরও এসে পড়বে। সেটা কীভাবে পড়বে এবং আমরা কীভাবে তা সামাল দেব, তা নিয়ে আমাদের অনেক চিন্তাভাবনা করা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার মতো হয়ে যাবে বা ভারতের মতো হয়ে যাবে, সেই সম্ভাবনা অনেক কম। কম, তবে শূন্য নয়। আমাদের বরং জাতি হিসেবে একটা ন্যারেটিভ বা জাতীয় বয়ান তৈরির ওপর জোর দেওয়া উচিত। বাংলাদেশ কেন ও কীভাবে সৃষ্টি হলো, সেটার একটা সঠিক মূল্যায়ন আমাদের দরকার। এই দেশটা বাঙালি মুসলমানদের অসাধারণ একটা সুযোগ দিয়েছে, যেটা আমরা পাকিস্তানে থাকতে পাইনি, ভারতে থাকলেও পেতাম না। ভারতে যে অবস্থা, এখন পাকিস্তানের যে অবস্থা—তা থেকেই এটা স্পষ্ট। আমরা এই সুযোগটা পেয়েছি বাংলাদেশ হওয়ার ফলে। এটা কি আমরা সত্যিকার অর্থে বুঝি? আমার তো মনে হয় বুঝি না। এটা যদি আমরা বুঝতাম, তাহলে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য, বাংলাদেশকে উৎপাদনশীল করার জন্য, বাংলাদেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে কাজ করতে পারতাম। সেটা কি আমরা করছি? আমার মনে হয় এখানেই আমাদের চিন্তা করার দরকার।

প্রতিচিন্তা : ৯০ ভাগ মুসলমান বা ৯০ ভাগ বাঙালি যদি বাকি ১০ শতাংশ মানুষের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক না রাখে, সমান নাগরিক হিসেবে না দেখে, তাহলে কি সে নিজেও ভালো থাকতে পারবে?

মুশতাক খান : তার প্রচণ্ড স্বার্থহানি হবে। বাংলাদেশকে সেক্যুলার রাষ্ট্র হতে হবে। সত্যিকার অর্থে সেসব নাগরিকের সমান অধিকার থাকতে হবে। একইভাবে আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে যে এই দেশে বাঙালি মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কীভাবে হলো এবং কেন হলো, কেন সেটা হতেই হলো—সেটাও আমাদের বুঝতে হবে। আমরা যদি বলি যে বাঙালি মুসলমান শব্দটা ব্যবহার করব না, সেটা ইতিহাস সমর্থন করবে না। আপনি আটকে যাবেন। কারণ, আপনি বোঝাতে পারবেন না কেন আমরা এক বাংলা হচ্ছি না এবং ওই বাংলা কেন আমাদের চায় না, তা আপনি বোঝাতে পারবেন না। আর আপনি যদি বলেন আমরা মুসলমান রাষ্ট্র, তাহলে আপনি বোঝাতে পারবেন না কেন আমরা এক পাকিস্তান থাকলাম না। অর্থাৎ বাংলাদেশের অস্তিত্ব বোঝাতে হলে এখানে আপনাকে বাঙালি আর মুসলমান—দুটি উপাদান আনতে হবে এবং শেষ করতে হবে এই বলে যে এই বাঙালি মুসলমানকে

এখন সেক্যুলার হতে হবে। এই তিনটি জিনিসকে আমাদের এক খাতায় আনতে হবে যে বাঙালি মুসলমান হলো সেক্যুলার, শুধু আদবকায়দায় আর ইতিহাসে সেক্যুলার নয়, নিজের গভীর স্বার্থে আর দেশের স্বার্থে সে সেক্যুলার। এটা যদি আমরা আনতে পারি, আমাদের কিন্তু শান্তি হবে। আর যারা সংখ্যালঘু আছে, সে পাহাড়ি হোক বা হিন্দু হোক, বিহারি হোক বা যে-ই হোক বা নাস্তিক হোক—এরা সবাই বাংলাদেশি আর এরা বাংলাদেশই চাচ্ছে। কে আমাদের উসকাতে পারবে যে হিন্দুরা আমাদের শত্রু বা চাকমারা আমাদের শত্রু বা নাস্তিক বা বিহারিরা আমাদের শত্রু? এরা কি সংখ্যাগুরুর সঙ্গে সংঘাত চায়? কিছুই না। কোনো দল যদি এসে আমাকে বলে যে আমরা হিন্দুদের অত্যাচার করি, আমাকে ভোট দেন। সে কি ভোট পাবে বাংলাদেশে? পাবে না। এটাই হচ্ছে ভারতের সঙ্গে আমাদের তফাত। কারণ, ভারতে যারা হিন্দু, যারা শাসকগোষ্ঠী, তাদের একটা ঐতিহাসিক রাগ আছে। তারা এখনো স্বীকার করতে পারেনি যে মুসলমানরা হাজার বছর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে। মুসলমানদের তারা ভারতের ইতিহাস থেকে বাদ দিতে চায়। শহরের নাম বদলাচ্ছে, আরও ঐতিহাসিক মসজিদ ভাঙার কথা বলছে। আমাদের কিন্তু সে রকম গভীর কোনো রাগ নেই কারও বিরুদ্ধে। বাঙালি মুসলমান একাত্তরের পরেই রাজত্ব করছে। কিন্তু আমাদের রাগ নেই যে হিন্দু বা অন্য কারও ওপর যে তারা রাজত্ব করেছিল এবং সেটার প্রতিশোধ নিতে হবে। এই রাগটা কিন্তু আমাদের মধ্যে নেই বা অন্যদের তুলনায় অনেক কম। বাঙালি মুসলমানের কিন্তু কারও বিরুদ্ধে কোনো রাগ নেই।

কিন্তু ভারতে সেখানে একটা রাজনৈতিক দল যদি বলে মুসলমানরা বেশি সুবিধা পাচ্ছে, তারা এত দিন রাজত্ব করেছে, তারা আরও চায়, তাদের খেদাও। তারা ভোট পাবে। কিন্তু এই একই কথা যদি হিন্দুর বিরুদ্ধে বলে, বাংলাদেশে সে ভোট পাবে না। এটার জন্য আমাদের সাংঘাতিক ধন্য হতে হবে যে আমাদের ইতিহাসটা এ রকম। আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক ঝগড়াঝাঁটি আছে। কে বাঙালি, কে মুসলমান—এটা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি আছে। এগুলো হচ্ছে বানানো ঝগড়া। আসলে কিন্তু কোনো ঝগড়া নেই। আপনি যদি আসলেই গভীরে যান, মূলধারার রাজনীতির মধ্যে সবাই কিন্তু স্বীকার করে যে আমরা বাঙালি, আমরা মুসলমান, আমরা সেক্যুলার। এখানে কোনো পার্থক্য তো আমি দেখি না। প্রান্তে হয়তো কিছু লোক থাকে যারা বলে আমরা শরিয়াহ চাই বা আমরা মুসলমান রাষ্ট্র হতে চাই বা আমরা শুধু বাঙালি হতে চাই, মুসলমান

হতে চাই না। এদের তো সংখ্যা নেই কোনো। মূলধারার বাংলাদেশে সে আপনি যে পার্টিরই দেখেন, সবাই বলবে যে আমরা বাঙালি, আমরা মুসলমান, আমরা সেক্যুলার, হিন্দু, বৌদ্ধ, বিহারি, চাকমা, অবাঙালি, অমুসলমান, অধার্মিক—সবারই নাগরিকত্ব সমান এবং সবারই নাগরিকত্ব সমতুল্য। এর বাইরে তো আমি কারও কথা শুনিনি।

প্রতিচিন্তা : আমরা মিসরে দেখেছি, দীর্ঘ সময়ে স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে থাকা জনগণ ধর্মীয় শামিয়ানার তলে গিয়ে প্রতিবাদী হয়েছিল। বাংলাদেশেও সে রকম সম্ভাবনা বাড়তে পারে কি না।

মুশতাক খান : এটার সম্ভাবনা থাকতেও পারে কিন্তু খুব বেশি নয়। কারণ কী? আসলেই আমরা যা-ই বলি না বলি, মূলধারার রাজনীতি যারা করে, তারা কিন্তু গোঁড়ামি করে না। যারা সেক্যুলার, তারাও কিন্তু মুসলমানদের জায়গা দেয়। যারা মুসলমান, তারা কিন্তু হিন্দু ও সেক্যুলারদের জায়গা দেয়। কারণ, আমাদের মূলধারার রাজনীতি আর মূলধারার মানুষের মধ্যে কিন্তু গোঁড়ামিটা কম। এখন ধরেন এক পার্টির যে রাজনীতি চলছে বাংলাদেশে, তাতে অনেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু বিশেষ করে মুসলমানরা বঞ্চিত হচ্ছে না। কারণ, মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে তারা জড়িত। তাদের কিন্তু অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং তারা বলতে পারে না যে সেক্যুলাররা তাদের কোণঠাসা করে রেখেছে। রাজনৈতিক কারণে তা বলতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তো তা নয়। অর্থনৈতিক জায়গায়ও নয়, রাজনৈতিক বাস্তবতাতেও নয়। তারা কিন্তু অনেক স্পেস, অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। অনেক জায়গায় তাদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় যে ঝুঁকিটা অন্য জায়গা থেকে আসবে। ঝুঁকিটা ধর্মীয় রাজনীতি থেকে আসবে না। যেহেতু মূলধারার রাজনীতিতে যে সরকারই থাকুক, তারা যা চায় তার অনেকটা তারা পাবে। কারণ, তারা এই সমাজের অংশ। আমাদের যে ঝুঁকি নিয়ে ভাবা উচিত, সেটা হচ্ছে সমাজের নিচতলে কী হচ্ছে? যারা ক্ষমতা সঞ্চার করতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না, তারা হঠাৎ করে কী রূপে আবির্ভূত হবে, তা বলা খুব কঠিন। কারণ, যেহেতু আমাদের স্বাভাবিক রাজনীতি নেই, তাই ভেতরে কী ধরনের ফরমেশন বা পরিগঠন হচ্ছে, তা আমরা জানি না। যেমন ধরেন যখন ছাত্র আন্দোলন শুরু হলো, সড়ক আন্দোলন শুরু হলো, এটা কেউ চিন্তাও করেনি কিন্তু কীভাবে হঠাৎ হয়ে গেল। হ্যাঁ, এ রকম অনেক কিছু ঘটতে পারে।

প্রতিচিন্তা : যেমন শ্রীলঙ্কায় এখন যেমন হচ্ছে। এটা কিন্তু আনপ্রেডিক্টেবল ছিল।

মুশতাক খান : হ্যাঁ, আনপ্রেডিক্টেবল...আমরা যদি গণতান্ত্রিক একটা স্পেস তৈরি না করি, যাদের ক্ষোভ আছে, যাদের সংগঠিত করার ক্ষমতা আছে, তারা যদি মূলধারায় আসতে না পারে, তাহলে ওটা ঝুঁকি। কিন্তু আমি মনে করি না, বিশেষ করে ইসলামপন্থীদের দিক থেকে কোনো ঝুঁকি আছে। কিন্তু একটা ঝুঁকি আছে, সেটা কোত্থেকে আসবে তা বলা কঠিন।

প্রতিচিন্তা : এ রকম ঝুঁকি নিরসনে গণতন্ত্র কি কোনো রক্ষাকবচ হতে পারে? সামনের বছর নির্বাচনও আসছে।

মুশতাক খান : পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে আপনার আইনে যা-ই থাক, নির্বাচনী আইনে যা-ই থাক, বাস্তবে কী হবে, সেটা নির্ভর করবে মাঠের ক্ষমতার বিন্যাসের ওপর। অর্থাৎ দেখা উচিত যে বিরোধী দলগুলোর ক্ষমতা এত কমে গেল কীভাবে। তাদের নিজেদেরও কিছু দোষ ছিল, আবার সক্রিয়ভাবে তাদের সংগঠন ভাঙাও হয়েছে, তাদের বিপদে ফেলা হয়েছে। যত দিন বিরোধী দল তাদের সাংগঠনিক শক্তি দ্বারা ক্ষমতা সঞ্চার করতে না পারবে, তত দিন আইন পাস করে বা ভালো মানুষকে নির্বাচন কমিশনে বসিয়ে বা নিরপেক্ষ মানুষকে শনাক্ত করে মনে হয় না বেশি কিছু হবে। শেষ পর্যন্ত যদি রাস্তায় সমান সমান দুটি ফোর্স থাকে, তখন নির্বাচন সঠিক হবে। আমরা যদি সরকারকে বলি যে আপনি এই স্পেসটা তৈরি না করলে নির্বাচনটা ঠিক হবে না আর নির্বাচন ঠিক না হলে আপনি পরে বিপদে পড়বেন। এই যুক্তি কেউ মানবে না। এটা থেকে বের হওয়ার একটাই পথ হচ্ছে আপনাকে বিপরীত শক্তি তৈরি করতে হবে এবং সেটা যদি সরকার না করতে দেয়, তখন সেটার বিরুদ্ধে আপনি সোচ্চার আন্দোলন করবেন। সেই বিপরীত শক্তিকে এমন সব জনপ্রিয় এবং গণমুখী দাবি নিয়ে আসতে হবে, যেটার একটা অর্থ থাকবে। আগেই যা বলেছিলাম, ক্ষমতার উৎস শুধু অর্থ আর অস্ত্র নয়, সংগঠন আর নীতিও। আমি পরিবর্তন চাই বললে শুধু হবে না। আপনাকে এমন বিপরীত শক্তি তৈরি করতে হবে, যারা বলবে আমি এখন বাংলাদেশে নতুন নতুন শিল্প করতে চাই, তার জন্য আমার এই প্রোগ্রাম আছে। আমি বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে এভাবে উন্নত করতে চাই, কারণ এটা ধসে গেছে, কিন্তু আমার বাস্তবমুখী প্রোগ্রাম আছে, যা মানুষে শুনলেই বলবে এটা হয়তো সম্ভব। আমি হাসপাতালগুলোকে এভাবে উন্নত করব। আমি শিল্প খাতে এই করব, আমি ব্যাংকিং খাতকে এভাবে শক্ত করব। যারা ঋণ ফেরত দিচ্ছে না, তাদের বিরুদ্ধে আমি এই এই ব্যবস্থা নেব। আপনি কংক্রিট কিছু বলেন। রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মূল বক্তব্য হলো,

আপনাকে সাংগঠনিক শক্তি তৈরি করতে হবে, সেটা প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনসম্মত হোক বা ইনফরমাল হোক। আপনাকে তো লোক নামাতে হবে রাস্তায়। বিরোধী দল যত দিন রাস্তায় লোক না নামাতে পারবে, তত দিন এমনই চলবে। সরকার হলে আপনিও একই জিনিস করতেন। যেটা হয়ে গেছে, সেটা তো হয়ে গেছে। এখন আপনি বলতে পারেন, এখান থেকে আমরা সামনে কীভাবে এগোব, সেটাই প্রশ্ন। নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী আইন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমাদের ভাবা উচিত যে একটা বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির চরিত্র কী হবে। তার গণমুখী প্রস্তাব কী হবে। সে কীভাবে সংগঠিত হবে, তার পেছনে কোন লোক যাবে। এসব নিয়ে ভাবা উচিত। আপনি যদি বিকল্প রাজনীতি চান, এমন কিছু দাবি আনতে হবে, যার পেছনে শক্তি আছে। আপনি যখন লোক নিয়ে আসবেন, তখন সরকার ছাড় দেবে। সরকার তো যেখানে শক্তি দেখেছে, সেখানে ছাড় দিয়েছে। যেখানে শক্তি নেই, সেখানে ছাড় দেয়নি। সরকার ভালো কি খারাপ—এটা না দেখে রাজনৈতিক বন্দোবস্তটা আগে দেখতে হবে। কেন আপনাদের প্রোগ্রাম এতটা আকর্ষণীয় নয় যে আপনার জন্য কেউ কোনো রকমের ঝুঁকি নিচ্ছে না? কোথায় আমাদের এজেন্সি আনতে হবে, কোন জায়গায় সংগঠন করতে হবে, সেটাই দেখা দরকার।

প্রতিচিন্তা : সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

মুশতাক খান : *প্রতিচিন্তা* এবং আপনাকেও ধন্যবাদ।

খাতি
অর্থনীতি
চিন্তা

বাংলাদেশে উঠতি মধ্যবিত্তের বিকাশ এবং স্থানীয় শিল্পায়নের সম্ভাবনা

মাহা মির্জা

সারকথা

অর্থনৈতিক মধ্যবিত্ত কারা, সেটা চিহ্নিত করা গেলে তাদের অর্থনৈতিক উপযোগিতা ও অবদানের সুযোগগুলোও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তরের ফল ও কারণ হিসেবে নতুন এক উঠতি মধ্যবিত্তকেও দেখা যাচ্ছে। উন্নয়ন গবেষক মাহা মির্জা প্রশ্ন করছেন, শ্রমিকের আয় না বাড়লে উঠতি মধ্যবিত্তেরও বিকাশ থমকে যায় কিনা। রপ্তানিমুখী শিল্পের ওপর একচেটিয়াভাবে ভর না করে স্থানীয় বাজার ও স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক শিল্পায়নের গুরুত্ব কতটা। স্থানীয় শিল্পায়নভিত্তিক কর্মসংস্থান ছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ হবে কীভাবে? বাংলাদেশের উন্নয়নের নীতির গুরুতর একটা ফাঁক হলো এই নীতির মধ্যে শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্তের অস্তিত্বটা প্রায়ই ভুলে থাকা হয়। শেষ পর্যন্ত সেটা অর্থনীতির সার্বিক বিকাশকেই ভারসাম্যহীন করে ফেলে। অর্থনীতির তত্ত্বের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান ও সর্বজনের স্বার্থ মেলানো অর্থনৈতিক আলোচনা যেখানে বিরল, সেখানে মাহা মির্জার প্রবন্ধটি বাস্তব সমস্যা ও সম্ভাবনাকে একসঙ্গেই আলোচনা করেছে।

অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে মধ্যবিত্ত

মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা কী? ঠিক কাকে মধ্যবিত্ত বলে? খুব স্বাভাবিকভাবেই মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা স্থান, কাল বা একাডেমিক ডিসিপ্লিন অনুসারে ভিন্ন হতে পারে। যেমন সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যবিত্তের সংজ্ঞায়ন এবং অর্থনীতিবিদদের সংজ্ঞায়ন এক নয়। আবার ঔপনিবেশিক সময়ের মধ্যবিত্ত এবং এখনকার 'শহুরে' নাগরিক মধ্যবিত্ত এক নয়। যেমন 'সামন্তীয়' ইউরোপে মধ্যবিত্ত বলতে বোঝানো হতো পেজেন্ট্রি (কৃষক) ও নোবেলিটির (অভিজাত) মাঝখানে পড়ে যাওয়া শ্রেণিটি।

আবার পশ্চিমের এখনকার সমাজবিজ্ঞানীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উচ্চশিক্ষা এবং 'হোয়াইট কলার' চাকরির মানদণ্ডে চিহ্নিত করেছেন, যাঁরা মূলত টেবিলে বসে চাকরি করেন এবং দৈহিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত নন। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ হোমি খারাস মধ্যবিত্তকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে : Being in the middle class implies having a comfortable standard of living, economic security, and self-reliance. The middle classes come from a range of occupations : government officials, college graduates, rich farmers, traders, business people, and professionals. They are in various management and clerical jobs. Many are self-employed in small businesses, crafts, and on commercialized family farms (খারাস, ২০১১ : ৫৯।)

বলা বাহুল্য, অর্থনীতিবিদেরা মধ্যবিত্তকে সংজ্ঞায়িত করেন আয় ও ব্যয়ের নিক্তিতে। যেমন ব্যানার্জি এবং ডাফলো (২০০৮) মধ্যবিত্ত চিহ্নিত করেছেন দৈনিক মাথাপিছু ব্যয় (এক্সপেন্ডিচার) ৬ থেকে ১০ ডলারের মধ্যে ধরে। বার্ডসল (২০০৭) মধ্যবিত্ত চিহ্নিত করেছেন দৈনিক মাথাপিছু আয় ১০ ডলারের ওপরে ধরে। রাভালিওন (২০০৯) পশ্চিমা দেশের মধ্যবিত্ত (ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড মিডল ক্লাস) এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যবিত্তকে (ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড মিডল ক্লাস) আলাদা আয়-ব্যয়ের হিসাব দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। আবার হোমি খারাস (২০১০) 'গ্লোবাল মিডল ক্লাসে'র হিসাব দেখিয়েছেন মাথাপিছু ব্যয় ১০ থেকে ১০০ ডলারের মধ্যে (মধ্যবিত্তের সংজ্ঞায়ন-সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দেখুন এডিবি, ২০১০ : ৫।) তাঁর মতে, এই পরিসীমার মধ্যবিত্তের মধ্যে নতুন ধরনের পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা তৈরি হয়। ভারতীয় অর্থনীতিবিদ (বিশ্বব্যাংকে কর্মরত) এজাজ ঘানি অর্থনীতিতে মধ্যবিত্তের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : A bigger middle class spends more, leading to higher business profits, savings and investment, higher growth and a larger middle class (দেখুন খারাস, ২০১১ : ৭৫)। তবে সব মধ্যবিত্তের মাপকাঠি এক নয়। মধ্যবিত্তের মধ্যে আছে উচ্চমধ্যবিত্ত আবার নিম্নমধ্যবিত্তও। বিভিন্ন সংস্থার জরিপে মধ্যবিত্তের এই ভাগগুলোর সংজ্ঞায়নও আবার এক নয়।

মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে নানা রকমের হিসাব দেখা গেলেও এটি আসলেও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো অর্থনৈতিক চরিত্র হলো তার বাড়ন্ত ক্রয়ক্ষমতা। মধ্যবিত্ত কেবল খাদ্যবস্ত্র, বাসস্থানে খরচ করে না, বরং 'এসেনশিয়াল' বা আবশ্যক পণ্যগুলোর

বাইরেও 'নন-এসেনশিয়াল' কিন্তু ডিজায়ারেবল (কাঙ্ক্ষিত) পণ্যগুলোতে খরচ করা শুরু করে। মধ্যবিত্ত রেস্টুরেন্টে খেতে যায়, মধ্যবিত্ত ঘর সাজানোর জিনিস কেনে, মধ্যবিত্ত প্লাস্টিকের সস্তা আসবাবের পরিবর্তে কাঠের মজবুত আসবাব কেনে। মধ্যবিত্ত কার্পেট কেনে, বালিশের কুশন কেনে, বছরে একবার কক্সবাজার বা সিলেটে বেড়াতে যায়। লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ মধ্যবিত্ত আইপিএস কেনে। তাই একটি দেশের মধ্যবিত্তের উত্থান মানেই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে ওই দেশের বাজার ও অর্থনীতির চরিত্র ও ধরন বদলে যাওয়া, বাজারের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ও সরবরাহে পরিবর্তন ঘটা।

ভারতের মধ্যবিত্ত এবং 'কনজ্যুমার গুডে'র উত্থান

মূলত নব্বইয়ের দশক থেকে ভারত ও ভিয়েতনামে এবং তার কিছু পরে বাংলাদেশের মতো এককালীন দরিদ্র দেশগুলোতেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটে। মূলত গ্রামীণ কৃষক পরিবারের সন্তানদের শহরে পড়তে আসা, পড়ালেখা শেষে শহরেই চাকরির খোঁজ করা, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার পর শহরে থেকে যাওয়া, পরিবারের অন্য সদস্যদের শহরের দিকে টানা ইত্যাদি নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটে, এমনটাই আমরা দেখি। ম্যাকেঞ্জি রিপোর্ট ২০০৭ সালেই দেখিয়েছিল, ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতের মধ্যবিত্তের সংখ্যা ৫ কোটি থেকে ৫০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে (The McKinsey Global Institute, 2007)। ম্যাকেঞ্জি রিপোর্টের মতে, এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির কনজাম্পশন বা ভোগের প্রবণতায় নাটকীয় পরিবর্তন আসবে, 'These groups choose what they will consume, rather than be driven by the necessities of life. Such discretionary choices, reflecting the tastes of the new Indian middle class, will dominate consumption patterns.' (ম্যাকেঞ্জি গ্লোবাল ইনস্টিটিউট, ২০০৭)। যেমন, নব্বইয়ের দশকে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু কনজ্যুমার গুড বা ভোগ্যপণ্যের চাহিদা হুহু করে বাড়তে থাকে। এই বাড়তি চাহিদার পণ্যের তালিকায় আছে গাড়ি, মোটরসাইকেল, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন এবং রেফ্রিজারেটর। ২০০৭ সালের ম্যাকেঞ্জি রিপোর্ট ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেছে এভাবে : They enjoy a lifestyle that most of the world would recognize as middle class and typically own a television, a refrigerator, a mobile phone and perhaps even a scooter

or a car. Although their budgets are stretched, they scrimp and save for their children's education and their own retirement (ম্যাকেঞ্জি গ্লোবাল ইনস্টিটিউট, ২০০৭)।

অন্যদিকে উপমহাদেশের উচ্চমধ্যবিত্তরা হলেন সাধারণত ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারিয়াল পদের কর্মকর্তা বা ব্যবসায়ী। ২০০৭ সালের ম্যাকেঞ্জি রিপোর্ট ভারতীয় উচ্চমধ্যবিত্ত সম্পর্কে বলছে, Successful and upwardly mobile, they are highly brand-conscious, buying the latest foreign-made cars and electronic gadgets. They are likely to have air conditioning, and can indulge in an annual vacation, usually somewhere in India.

উচ্চমধ্যবিত্তের শৌখিন বিদেশি ব্র্যান্ডের প্রতি ঝোঁক তৈরি হয় বলেই ভারতের বাজারে ক্রিশ্চিয়ান ডিওর বা টমি হিলফিগারের মতো দামি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো ইতিমধ্যে ব্যবসাসফল হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, উচ্চমধ্যবিত্তের উত্থানের সঙ্গে আমদানি করা পণ্য এবং হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্টের মতো পর্যটন-পণ্যেরও চাহিদা বেড়েছে। আবার আমদানি করা পণ্যের চাহিদা বাড়ার মধ্য দিয়ে বড় শহরগুলোতে 'সুপারমল'-এর সংখ্যাও বেড়েছে।

এদিকে ভারতের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্তের চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশই পূরণ করেছে ভারতের স্থানীয় ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন খাত। যেমন একসময় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয়ের পক্ষে গাড়ি কেনার সামর্থ্য ছিল না। মধ্যবিত্তের বাড়ন্ত গাড়ির চাহিদাকে আমলে নিয়েই আশি-নব্বইয়ের দশকে ভারতে অটোমোবাইল খাতে বিপুল বিনিয়োগ ঘটে। সাম্প্রতিক কালে আবার নতুন মধ্যবিত্তের চাহিদা এবং ক্রয়ক্ষমতাকে মাথায় রেখেই টাটা মোটরস মাত্র এক লাখ টাকার গাড়ি এনেছে ভারতের বাজারে ('ওয়ান লাখ রুপি কার' নামে পরিচিত)। এ ছাড়া মধ্যবিত্তের উত্থান মানেই শহরে আধুনিক আবাসনের চাহিদা বৃদ্ধি ও রিয়েল এস্টেট বা নির্মাণ খাত বিকশিত হওয়া। উল্লেখ্য, নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে ভারতে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য ঋণ নেওয়ার সুযোগও তৈরি হয়। যেমন স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এবং মারুতি-সুজুকির মতো গাড়ি কোম্পানি একসঙ্গে চুক্তি করে স্বল্প কিস্তিতে গাড়ি কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে ভারতীয় মধ্যবিত্তকে। আবার ভারতীয় ইলেকট্রনিক উৎপাদন কোম্পানি ভিডিওকন স্বল্প আয়ের মধ্যবিত্তকে মাথায় রেখে খুব সস্তা দামের ওয়াশিং মেশিন বাজারে এনেছে।

বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত কারা?

বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যা কত, এই হিসাব করতে গেলে সাধারণত তিনটি গবেষণা প্রতিবেদন সামনে আসে (জাইকা, ২০১৬ : ৬২)। এর মধ্যে ড. বিনায়ক সেনের (২০১৫) হিসেবে দৈনিক ২ থেকে ৩ ডলারের মধ্যে আয় হলে তাকে মধ্যবিত্ত বলা হচ্ছে (স্বভাবতই আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থাগুলো ২ থেকে ৩ ডলারের এই 'ইনকাম রেঞ্জ' বা আয়ের পরিসীমাকে অনেক কম মনে করছে)। বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ-এর হিসাবে দৈনিক ১৩ থেকে ২১ ডলার আয় হলে তাকে মধ্যবিত্ত বলা যায়। তবে আমেরিকার পিউ রিসার্চ সেন্টার মধ্যবিত্তের আয় নির্ণয় করতে আরেকটু সতর্কতা অবলম্বন করেছে। পিউ রিসার্চ সেন্টার দৈনিক ২ থেকে ১০ ডলার আয়কে চিহ্নিত করছে 'লো ইনকাম' বা নিম্ন আয় হিসেবে আর দৈনিক ১০ থেকে ২০ ডলার আয়কে চিহ্নিত করছে মধ্যবিত্তের আয় হিসেবে। এ ছাড়া দৈনিক ২০ থেকে ৫০ ডলার আয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে উচ্চমধ্যবিত্ত হিসেবে (মাসিক ৪০-৭৮ হাজার টাকা) (জাইকা, ২০১৬ : ৬২।)

এদিকে জাইকার 'ইমার্জিং মিডল ইনকাম ক্লাস ইন বাংলাদেশ' প্রতিবেদনটি পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপটিকেই বাস্তবসম্মত হিসেবে গ্রহণ করেছে, যদিও জাইকা আরও এক ধাপ এগিয়ে মধ্যবিত্তের ক্যাটাগরিটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। যেমন দৈনিক ২ থেকে ৪ ডলারকে নিম্ন আয় হিসেবে দেখিয়েছে (৮-১৫ হাজার টাকা), আর ৪ থেকে ১০ ডলার আয়কে দেখিয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত হিসেবে (১৫-৪০ হাজার টাকা) (জাইকা, ২০১৬ : ৬২।)

জাইকার ২০১৬ সালের হিসাব অনুসারে, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২৫ শতাংশ, নিম্ন আয়ের মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ, নিম্নমধ্যবিত্ত প্রায় ৩৪ শতাংশ আর উচ্চমধ্যবিত্ত মাত্র ১ দশমিক ৮ শতাংশ (জাইকা, ২০১৬ : ৬৩।) এদিকে বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের ২০১৫ সালের জরিপ বলছে, পরবর্তী এক দশকে প্রতিবছর বাংলাদেশের ২০ লাখ মানুষের মাসিক আয় ৩৫ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছাবে। অর্থাৎ এই গ্রুপের ভোক্তা পরিবারগুলো এসি, আইপিএস বা বিদেশি শ্যাম্পু বা কসমেটিকসের মতো পণ্যগুলো কেনার মতো সক্ষমতা রাখবে।

বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা ও ইলেকট্রনিক পণ্যের বাজার

সাধারণত মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকা ছাড়ালে (অর্থাৎ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তের পরিসীমায় প্রবেশ করলে) ভোক্তা পরিবারগুলোর প্রধান প্রবণতা

হলো স্মার্টফোন, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর বা ইস্তিরি কেনা। মাসিক আয় আরও বৃদ্ধি পেলে পরের ধাপে মোটরবাইক, এসি, আইপিএস বা রাইস কুকার কেনা। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানে ইলেকট্রনিক পণ্যের বাজারে নতুন এক অধ্যায় শুরু হয়েছে। এদিকে শুধু পণ্যের বাজার তৈরি হলেই হবে না, পণ্য কোথায় তৈরি হচ্ছে (দেশে না বিদেশে), কোথায় সংযোজন হচ্ছে, আমদানি হচ্ছে নাকি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে, অর্থনীতির বিকাশে এটি একটি অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন।

জাইকার (২০১৬) জরিপে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বা সংযোজিত পণ্যের বাজার সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। যেমন বর্তমানে ইলেকট্রনিক পণ্যের স্থানীয় সংযোজনকারী (অ্যাসেম্বলার) হিসেবে দেশীয় বাজারের মূল প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, বাটারফ্লাই, ইউনিটেক, খান ট্রেডিংস, হাওলাদার ইলেকট্রনিকস, রয়াল, ইলেকট্রোমার্ট এবং এস্কয়ার। আর বাজারে প্রতিযোগিতা করা বিদেশি কোম্পানিগুলোর মধ্যে আছে এলজি, সনি, স্যামসাং, শার্প, হিটাচি, প্যানাসনিক, ফিলিপস, মিয়াকো, নোভা, ডিজিটাল, সিঙ্গার, হাইকো, জেনারেল ইত্যাদি। তবে কেবল এসি, রেফ্রিজারেটর ও ব্লেন্ডার ছাড়া বাকি ইলেকট্রনিক পণ্যের বাজার প্রায় পুরোটাই জাপানিজ, চায়নিজ ও কোরীয় কোম্পানির দখলে। রেফ্রিজারেটর ও এসির ক্ষেত্রে বেশ ভালো করছে দেশীয় কোম্পানি ওয়ালটন। শার্প ও সিঙ্গারের মতো বিদেশি কোম্পানিগুলোকে টেক্কা দিয়ে ওয়ালটন-এর পণ্য সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে। আবার আইপিএসের ক্ষেত্রে সিঙ্গার বা স্যামসাংয়ের চেয়ে রহিমআফরোজের বাজার বড়।

অন্যান্য বেশ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রেও ওয়ালটনের সক্ষমতা খেয়াল করার মতো। যেমন মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে সুজুকি, হোন্ডা ও হিরোর পরেই ওয়ালটনের বাজার। সেলফোনের ক্ষেত্রে স্যামসাংয়ের পরেই ওয়ালটনের বাজার। এ ক্ষেত্রে সিম্ফনির থেকেও ভালো করছে ওয়ালটন। ব্লেন্ডার বিক্রির ক্ষেত্রেও ফিলিপস, নোভা, প্যানাসনিককে ছাড়িয়ে ওয়ালটন সবচেয়ে এগিয়ে (জাইকা, ২০১৬ :৭৪)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, মধ্যবিত্তের উত্থানে নানা রকমের ইলেকট্রনিক পণ্যের যে নতুন বাজার তৈরি হয়েছে, তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত না হলেও স্থানীয়ভাবে সংযোজিত। উৎপাদন, সংযোজন, সেলস, ডিস্ট্রিবিউশন ও মার্কেটিং মিলিয়ে দেশীয় এই দু-একটি কোম্পানি উল্লেখযোগ্য মানুষের কর্মসংস্থানও তৈরি করতে পারছে।

কিন্তু মধ্যবিত্তের মধ্যে যেহেতু প্রকারভেদ আছে এবং উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যে যেহেতু নতুন ধরনের পণ্য কেনার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছে, তাই এমন বলা যেতে পারে যে 'রাইজিং' মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়লেই স্থানীয় শিল্পের সংখ্যা বাড়বে বা স্থানীয় শিল্পের বিকাশ হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। বরং প্রবণতা বলে, মধ্যবিত্তের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটু বেশি খরচের আমদানিকৃত পণ্যের চাহিদা বাড়বে। যেমন জাইকার ২০১৫ সালের জরিপ বলছে, বাংলাদেশের উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যে মাত্র ১৬ শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য কিনতে আগ্রহী। যেখানে ৫৮ শতাংশই আমদানি করা পণ্য কিনতে আগ্রহী এবং ২৪ শতাংশ স্থানীয়ভাবে সংযোজিত (এসেমবেল্ড) পণ্য কিনতে আগ্রহী (জাইকা, ২০১৬ : ৪৯।) মূলত গাড়ি ও টিভির ক্ষেত্রেই বিদেশি পণ্যের প্রতি এই আগ্রহ বেশি দেখা গেছে।

আবার অন্যদিকে দরিদ্র থেকে নিম্নমধ্যবিত্তে উপনীত হওয়া শ্রেণিটির তুলনামূলক বেশি দামে আমদানিকৃত পণ্য কেনার সামর্থ্য নেই। তাঁরা দেশে তৈরি পণ্যেই ভরসা রাখেন। তাই এমন বলাই যায় যে নতুন মধ্যবিত্তের উত্থানের সঙ্গে স্থানীয় পণ্যের চাহিদা অবশ্যই বাড়ে এবং স্থানীয় শিল্পায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধনী বা উচ্চমধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি স্থানীয় শিল্পায়নের জন্য সুবিধাজনক না-ও হতে পারে। বরং উচ্চমধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আমদানিকৃত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সম্পর্কটি বেশ দৃশ্যমান। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ের শিল্পায়নের জন্য মধ্যবিত্তের আয় বৃদ্ধির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে শ্রমিকের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি কিংবা প্রাথমিক ধাপে অন্তত শ্রমিকের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উত্তরণ।

শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা ও মধ্যবিত্তে উত্তরণের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের মতো দেশে শ্রমিক তাঁর মজুরির প্রায় পুরোটাই নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য কিনতে ব্যয় করেন। 'নেসেসিটি' বা প্রয়োজনের বাইরে অন্যান্য কনজ্যুমার গুড কেনার সামর্থ্য তাঁর কম। বাংলাদেশের একজন পোশাকশ্রমিকের 'কনজাম্পশন প্যাটার্ন' বা খরচের তালিকাটি দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। বাসাভাড়া, পরিবহন খরচ, চাল, ডাল, সবজি, ডিম ইত্যাদি প্রাথমিক খাদ্যপণ্য কিনতেই তাঁর মজুরির প্রায় সম্পূর্ণটা খরচ হয়ে যায় (বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের অতিরিক্ত বৃদ্ধির কারণে মাসের প্রথম দেড় থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যেই পোশাক-শ্রমিকের মজুরির সম্পূর্ণ টাকাটাই শেষ হয়ে যাওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা।)

এদিকে বিপুলসংখ্যক নারী পোশাকশ্রমিকদের খাদ্যপণ্যের বাইরে সামান্য কিছু বাড়তি খরচের আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করেই আশুলিয়া, গাজীপুর, সাভার ও টঙ্গীর মতো এলাকাগুলোতে সস্তা কাপড়, সস্তা জুতা, ইমিটেশনের গয়না ও কসমেটিকসের বাজার গড়ে উঠেছে। মূলত ১৫ হাজার টাকার কিছুটা ওপরে মজুরি পাওয়া নারী শ্রমিকেরাই এসব সস্তা কাপড়ের দোকানের নিয়মিত ক্রেতা। পোশাকপল্লির চারদিকে গড়ে ওঠা এই বাজারগুলোর বহু পণ্য চীন ও ভারত থেকে আমদানি করা হলেও রেডিমেড থ্রি-পিস, ম্যাক্সি, ওড়না, স্যান্ডেল ও সাবান-শ্যাম্পুর মতো পণ্যগুলোর একটি বড় অংশই দেশীয় ছোট-বড় বিভিন্ন কারখানায় তৈরি হয়। উল্লেখ্য, কেরানীগঞ্জ বা পুরান ঢাকায় গড়ে ওঠা প্রায় কয়েক শ দরজির দোকান বা রেডিমেড কাপড় সেলাইয়ের কারখানার একটি উল্লেখযোগ্য অংশই সরবরাহ করা হয় ঢাকার আশপাশের পোশাক-পল্লিগুলোতে। আবার শ্রমিকের জুতা বা স্যান্ডেলের চাহিদা মাথায় রেখেই পুরান ঢাকা ও কেরানীগঞ্জের নানান জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গড়ে উঠেছে অজস্র পাদুকা কারখানা।

এ ছাড়া পোশাকশিল্পের নারী কর্মীরা সস্তা দেশীয় কসমেটিকস ব্যবহার করে থাকেন। পোশাককর্মীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় দুটি দেশীয় কসমেটিকস ব্র্যান্ড হলো লতা হারবাল ও রেমি স্পট ক্রিম। দুটোই রং ফরসাকারী ক্রিম হিসেবে পরিচিত। ১২ গ্রামের একটি লতা হারবাল কৌটার দাম মাত্র ৫০ টাকা। এ ছাড়া তিব্বতের লিপ জেল, ঘামাচি পাউডার, তিব্বত পমেড, কিউট গ্লিসারিন, দেশে তৈরি লাক্স ও সানসিল্কের শ্যাম্পু, কাপড় কাচার সাবান, কসকো ও দেশে তৈরি পন্ডস পোশাকশিল্পের নারী শ্রমিকদের নিয়মিত ব্যবহার্য সামগ্রী।

পোশাকের ক্ষেত্রে পোশাকশিল্পের নারী শ্রমিকদের রোজগারকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের লোকাল পোশাকশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। একদিকে বাজারে ভারতীয় ও পাকিস্তানি থ্রি-পিসের রমরমা চাহিদা থাকলেও নারী শ্রমিকেরা মূলত সস্তা দেশীয় থ্রি-পিস কেনেন বেশি (৬০০ টাকার মধ্যে।) নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, সিরাজগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বহু ছোট-বড় বস্ত্রকল তৈরি হয়েছে, যেখানে পাওয়ার লুম বা অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে কাপড় তৈরি হয়। ছাপা কাপড় বা স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ের জন্য আছে আলাদা কারখানা, আবার গজ কাপড় সেলাই করেও থ্রি-পিস বা টু-পিস বানানো হয় দরজি কারখানাগুলোতে। পুরান ঢাকা থেকে কেরানীগঞ্জ, টঙ্গী ও মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন এলাকাতেও এসব কারখানার দেখা মেলে। একেকটি কারখানায় ৫

থেকে ১০ জন করে শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। বলা বাহুল্য, এসব পণ্যের মূল ক্রেতা শ্রমজীবী মানুষ।

এ ছাড়া পোশাকপল্লিগুলোকে ঘিরে রান্নার কাজে ব্যবহৃত দেশীয় হাঁড়ি, পাতিল, বাসন, বাটি, গ্লাস, ছুরি, বঁটি, আর প্লাস্টিকের বিভিন্ন সামগ্রীর এক বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে। দেশীয় কোম্পানির মধ্যে মূলত গাজী আর আরএফএলের প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল আর অন্যান্য আসবাবের ব্যাপক চাহিদা দেখা যায়।

পোশাকশ্রমিকদের মধ্যে ইলেকট্রনিক পণ্যেরও চাহিদা আছে, তবে কম। ইলেকট্রনিক পণ্যের মধ্যে স্মার্টফোন ব্যবহারে সবার উৎসাহ থাকলেও সবাই কিনতে পারছেন না। কিছুটা বেতন বাড়লে বা কিছু টাকা জমাতে পারলে মূলত টিভি, ফ্রিজ আর স্মার্টফোন কেনাতেই আগ্রহ দেখা যায়। ফ্রিজের ক্ষেত্রে পোশাকশ্রমিকদের প্রথম পছন্দ মূলত ওয়ালটন, তুলনামূলক অনেক কম দাম ও ওয়ালটনের ভালো সার্ভিসের জন্য। পোশাককর্মীদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়, শ্রমিকদের সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে ওয়ালটনের কর্মীরা খুবই আন্তরিক। তাঁরা পোশাকশিল্পের নারী কর্মীদের খুবই সম্মান করেন এবং 'বোন' হিসেবে সম্বোধন করেন।

শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে নতুন পণ্যের চাহিদা তৈরি হয়?

সাধারণত বেতন বাড়লে পোশাকশ্রমিকেরা কী ধরনের পণ্য কেনার আকাঙ্ক্ষা করেন? পোশাকশ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায়, প্রথমেই তাঁরা মূলত আরেকটু ভালো খাবার কিনতে চান। যেমন বেশির ভাগ পোশাকশ্রমিক এখন পর্যন্ত নিয়মিত মাছ, মাংস, দুধ বা ফলমূল কেনার সামর্থ্য রাখেন না। মূলত ডিম, ডাল ও শাকসবজিই তাঁদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা। এমনও দেখা গেছে, মাছ কেনার সামর্থ্য নেই বলে পোশাকশ্রমিকেরা সন্ধ্যার পর পোশাকপল্লির কাঁচাবাজারগুলোতে ভিড় করেন, মূলত পচতে থাকা মাছ সস্তায় পাবেন এই আশায়। বলা বাহুল্য পোশাকশ্রমিকদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বাড়লে বাজারে মাছ, মাংস বা মুরগির চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়বে। অর্থাৎ গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক বা খামারভিত্তিক উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ বাড়বে।

অন্যদিকে কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে একটু ভালো মানের দেশীয় ক্রিম, শ্যাম্পু, স্যান্ডেল বা প্রসাধনসামগ্রীর চাহিদা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, পোশাকশিল্পের নারী শ্রমিকেরা বেশির ভাগই লোশন কিনতে পারেন না। দেশে ইউনিলিভারের তৈরি করা লোশন তাদের সামর্থ্যের বাইরে। বরং

লোশনের পরিবর্তে ভ্যাসলিন, তেল বা পমেড ব্যবহার করেন। বলা বাহুল্য, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেলে লোশনের মতো পণ্যগুলোর চাহিদা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার পোশাকশ্রমিকের অনেকেই এক জোড়া স্যান্ডেলই দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করেন। কামিজের ক্ষেত্রেও ২-৩ পিস কামিজ বারবার ধুয়ে ধুয়ে পরেন। মজুরি বৃদ্ধি পেলে বাড়তি এক জোড়া স্যান্ডেল, কামিজ বা ওড়নার ব্যবহার বাড়বেই। ইলেকট্রনিক পণ্যের ব্যাপারে আগেই বলা হয়েছে। উঁচু গ্রেডের শ্রমিকের ঘরে টিভি, রেফ্রিজারেটর, স্মার্টফোন, ইস্তিরি বা রাইস কুকারের মতো পণ্যগুলোর দেখা পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ শ্রমিকের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে দেশীয় ইলেকট্রনিক পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি সরাসরি সম্পর্কিত।

সামগ্রিকভাবে দেখলে বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি আসলে কারখানার মালিকের জন্য একটি বাড়তি 'উৎপাদন খরচ' হিসেবে গণ্য হলেও এই বর্ধিত বেতনের সম্পূর্ণটাই বাজারে বিভিন্ন সস্তা পণ্য কেনায় ব্যয় হয়, যা সস্তা পণ্যের দেশীয় ও স্থানীয় শিল্পায়নের পেছনের সবচেয়ে বড় চালিকা শক্তি হতে পারে।

ইউএনসিটিএডির প্রতিবেদন : লোকাল শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে স্থানীয় শিল্পায়নের সম্পর্ক

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বরাবরই উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঢালাও রপ্তানির পক্ষে। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি ব্যতিক্রম অবস্থান নিয়েছে ইউএনসিটিএডি (ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)। ২০১৭ সালে এই সংস্থার একটি প্রতিবেদন রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের ঝুঁকি নিয়ে বিশদ আলোচনা করে। প্রতিবেদন বলছে, such a model is no longer viable in the current context of slow growth in developed economies. To address the prospect of a prolonged period of considerably slower export growth, policymakers need to give greater weight to domestic demand (ইউএনসিটিএডি, ২০১৩)।

এই রিপোর্টের সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকারকে দীর্ঘ কয়েক দশকের রপ্তানিমুখিতার ফর্মুলা থেকে সরে আসতে বলা হয়েছে এবং ডমিস্টিক ডিমান্ড বা স্থানীয় চাহিদার ওপর ভিত্তি করে উন্নয়ন পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পশ্চিমা দেশের অনিশ্চিত চাহিদার ওপর নির্ভর করে নয়, বরং প্রতিবেশী দেশগুলোর স্থানীয়

চাহিদা বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে আঞ্চলিক দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের মাত্রা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে রিপোর্টে। যেমন প্রতিবেদন বলছে : if many developing and transition economies simultaneously give domestic demand a greater role in their growth strategies, their economies could become markets for each other, fostering regional and 'South-South trade,' and thus further growth for all (ইউএনসিটিএডি, ২০১৩)।

সাধারণত, স্থানীয় চাহিদা বা ডমিস্টিক ডিমান্ডের ওপর ভিত্তি করে যে শিল্পায়ন হয়, তাতে বৈশ্বিক এক্সটার্নিটিলির ঝুঁকি কম। যুদ্ধ, বৈশ্বিক মন্দা, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, পশ্চিমা ভোক্তাদের প্রেফারেন্স বা পছন্দ পরিবর্তন—এসব নিজেদের নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে থাকা ঘটনাবলি স্থানীয় অর্থনীতিতে অপেক্ষাকৃত কম প্রভাব ফেলতে পারে (যদিও এই শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আমদানি করা কাঁচামালের 'কম্পোজিশনে'র ওপরও অনেক কিছুই নির্ভর করে)।

স্থানীয় মধ্যবিত্তের চাহিদার ওপর নির্ভর করে চাহিদা-জোগানের যে নিয়মিত চক্রটি তৈরি হয়, অর্থনীতির ভাষায় তাকে বলা হচ্ছে 'ডমিস্টিক ডিমান্ড ড্রিভেন গ্রোথ' বা স্থানীয় চাহিদানির্ভর প্রবৃদ্ধি। যদিও প্রচার করা হয় যে, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে 'ইকোনমিক মিরাকল' বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রায় পুরোটাই হয়েছে রপ্তানিভিত্তিক বাণিজ্যের কারণে, কিন্তু বাস্তবতা হলো, সত্তর-আশির দশকে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি ছিল স্থানীয় চাহিদা এবং স্থানীয় শিল্পায়ন। বিশেষ করে বৈশ্বিক মন্দা-পরবর্তী সময়ে এশিয়ার রপ্তানি বাজারে ধস নামলেও স্থানীয় চাহিদা এবং স্থানীয় শিল্পের বিকাশের কারণেই মালয়েশিয়া বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোর অর্থনীতি ক্রমাগতই সমৃদ্ধ হতে থাকে [হা জু চান (১৯৯৩, ২০১০) এবং লাই ওয়াহের (২০১০) কাজে স্থানীয় চাহিদা এবং স্থানীয় শিল্পায়নে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের বিষয়টি বারবার সামনে এসেছে।]

এদিকে আমেরিকার অর্থনীতিবিদ থমাস প্যালে ধনী দেশের ক্রেতাদের 'আর্টিফিশিয়াল ডিমান্ড' বা কৃত্রিম চাহিদাকে রপ্তানিমুখী অর্থনীতির একটি প্রধান সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ইউরোপ-আমেরিকার কনজ্যুমার গুডের কৃত্রিম চাহিদা বা 'খামোখা' চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হচ্ছে একের পর এক দরিদ্র দেশের শিল্প খাত।

এদিকে শিক্ষণীয় হলো, ২০০৮ সালের মন্দায় আমেরিকার এই ঋণনির্ভর বাজারব্যবস্থাটাকেই আমরা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে দেখেছি। ওই

সময়ে পশ্চিমা দেশগুলোর পোশাকের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আমাদের পোশাকশিল্প মারাত্মক সংকটের মুখে পড়েছিল। একের পর এক অর্ডার যখন বাতিল হচ্ছিল, তখন ধারাবাহিকভাবে ভর্তুকি দিয়েই বাঁচানো হয়েছিল দেশের পোশাকশিল্পকে। প্রশ্ন হচ্ছে, পশ্চিমের এই 'আর্টিফিশিয়াল' বা 'ইনফ্লেটেড' চাহিদার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠল যে রপ্তানি-অর্থনীতির ভিত্তি, সেই অর্থনীতি আসলে দীর্ঘ মেয়াদে কতটুকু টেকসই? এটা সত্য যে পশ্চিমের পোশাকের চাহিদা ঠিক কখনোই ফুরিয়ে যাবে না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে লক্ষ করার মতো বিষয় হলো, দেশের প্রধান শিল্প খাতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে পশ্চিমা দেশগুলোর ঋণনির্ভর এবং কৃত্রিমভাবে তৈরি হওয়া ব্র্যান্ড পণ্যের চাহিদার ওপর। অর্থাৎ দেশের এত বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নির্ভর করছে অত্যন্ত অস্থির ও অস্থিতিশীল একটি বাজারের টিকে থাকার ওপর।

এর মধ্যে আবার ব্যাপক অটোমেশনের বাস্তবতায় আগের মতো কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না পোশাক খাতে। বরং এক দশকে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ব্যাপক হারে কমে এসেছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে আমলে নিয়েই তাই ইউএনসিটিএডির প্রতিবেদনে 'ডমিস্টিক ডিমান্ড' বা লোকাল চাহিদার সঙ্গে স্থানীয় শিল্পায়নের সম্পর্কটিকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টের ভাষ্যমতে, প্রতিটি রপ্তানিমুখী শিল্পকেই তীব্র বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সামনে পড়তে হয়। কর্মীদের বর্ধিত বেতন-ভাতাকে তাই বাড়তি উৎপাদন খরচ বা কস্ট হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। ম্যানেজমেন্টের মূল উদ্দেশ্যই থাকে যেকোনো উপায়ে উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে যেকোনো মূল্যে দমন করা। কিন্তু ইউএনসিটিএডির রিপোর্ট বলছে, মজুরি বা ওয়েজকে শুধু উৎপাদনের খরচ (ভেরিয়েবল কস্ট) হিসেবে না দেখে বরং ভোক্তা শ্রমিকের ইনকাম বা খরচ করার সক্ষমতা বা ক্রয়ক্ষমতার জায়গা থেকে দেখা দরকার। কারণ, ব্যবসায়ীর জন্য শ্রমিকের মজুরি একটি 'কস্ট' বা উৎপাদন খরচ হতে পারে, কিন্তু সরকারকে ব্যবসায়ীদের মতো চিন্তা করলে চলে না। সরকার লাভ-ক্ষতির হিসাব করবে সামগ্রিক অর্থনীতির লাভ-ক্ষতির জায়গা থেকে। শ্রমিকের বর্ধিত মজুরি এখানে শ্রমিকের সস্তা দেশি পণ্য কেনার 'ইনসেনটিভ' বা প্রণোদনা এবং তা সামগ্রিকভাবে স্থানীয় অর্থনীতি বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইউএনসিটিএডির প্রতিবেদন এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলছে, 'new perspective on the role of wages

and the public sector'। প্রতিবেদনের ভাষায় : ...export-oriented strategies emphasize the cost aspect of wages. By contrast, a strategy giving a greater role to domestic demand would emphasize the income aspect of wages, as it would be based on household spending as the largest component of domestic demand। অর্থাৎ এখানে শ্রমিকের বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতাকে স্থানীয় চাহিদা সৃষ্টির মূল ভিত্তি হিসেবে দেখতে বলা হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে খুলনাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রায় ২৬টি পাটকল বেসরকারীকরণের উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন। পাটকলগুলো কেন লাভ করতে পারছে না, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রায়ই সরকারি মিলের শ্রমিকদের 'অতিরিক্ত' বেতনকে কারণ হিসেবে দেখানো হয়।

উল্লেখ্য, সরকারি শ্রমিকেরা বিভিন্ন ধরনের ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা মিলিয়ে বেতন পান ১৫ থেকে ১৮ হাজার টাকা। অন্যদিকে বেসরকারি আকিজ জুট মিল বা যশোরের নোয়াপাড়া জুট মিলের শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে দেখা যাবে, তাঁদের দৈনিক মজুরি মাত্র ২৪০ টাকা! অর্থাৎ বেসরকারি পাটকলশ্রমিকের মাসিক আয় টেনেটুনে ৫ হাজার টাকা! এখানে জরুরি প্রশ্ন হলো মাত্র ৫ হাজার টাকায় একজন শ্রমিক চাল, ডাল, তেল, লবণের মতো জরুরি খাদ্যপণ্যগুলো ছাড়া আর কোনো কিছু কেনার সামর্থ্য রাখেন কি না? তাঁরা কি মাছ, মাংস কিনতে সক্ষম? একজন বেসরকারি মিলের শ্রমিকের পক্ষে শখের বশে একটি বাড়তি প্যান্ট, বাড়তি এক জোড়া স্যান্ডেল বা সস্তা প্রসাধনী কেনা কি সম্ভব? নোয়াপাড়া জুট মিলের শ্রমিকদের বাড়িঘর কেমন? তাঁরা কি দেশি প্লাস্টিকের আসবাব কিনতে পারেন? নিয়মিত তেল, সাবান, শ্যাম্পু বা কোল্ড ক্রিম কিনতে পারেন? বাচ্চাদের জন্য ১০ টাকার এক প্যাকেট এনার্জি প্লাস মাসে দু-চারবারের বেশি কিনতে পারেন? সপ্তাহে একদিন পাড়ার দোকান থেকে নন-ব্র্যান্ডের কেক, বানরুটি বা বিস্কুট কিনে খেতে পারেন? মাত্র ৫ হাজার টাকা মজুরিতে ওয়ালটনের টেলিভিশন বা রেফ্রিজারেটর কেনার সামর্থ্য কি তাঁদের কোনো দিন হবে?

সরকারি শ্রমিকের বাসাবাড়ি, ক্রয়ক্ষমতা ও কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

২০২০ সালে মিল বন্ধ হওয়ার পর পিপলস জুট মিল কলোনির শ্রমিকদের বাসাবাড়িতে বসে আলাপচারিতা করার সুযোগ হয়েছিল। যে বাড়িতে আমরা প্রথম বসেছিলাম, সেই বাড়িটি লিটন মিয়ার। তিনি প্রায় ২৭ বছর ধরে কাজ

করেছেন পিপলস মিলে। স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে থাকেন। পাটকল বন্ধ হওয়ার ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন সময় কলোনি ছেড়ে তাঁদের চলে যেতে বলা হচ্ছিল। লিটু মিয়ার পরিবারও উচ্ছেদের ভয়ে ছিল।

কলোনির বহুতল দালানগুলো মিল কর্তৃপক্ষ করে দিয়েছে। তবে একই জমিতে শ্রমিকেরা নিজেরাও শত শত ইটের ঘর তুলেছেন। পোশাককর্মীদের মতো ঠাসাঠাসি করে ৭ থেকে ১০ জন মিলে থাকতে হয়নি তাঁদের। বসার ঘর আছে, শোবার ঘর আছে; আলাদা রান্নাঘর, বারান্দা আছে। সারবাঁধা ঘরগুলোর সামনে লাউয়ের মাচা, লেবুগাছ, ধনে-পুদিনার চাষ। জানালার গ্রিল ঘেঁষে হাসনাহেনার গাছ আছে। ঘরের ভেতরে নানান ধরনের আসবাবের দেখা মেলে। যেমন স্টিলের আলমারি, কাঠের সোফা, ড্রেসিং টেবিল, কাঠের চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি। কারও ঘরে বেতের সোফা এবং রঙিন ফুলতোলা কুশনকভার দেখা গেল। জানালায় রঙিন পর্দাও আছে। প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই কাঠের স্টাডি টেবিল ও টেবিল ক্লথের দেখা মেলে। বেশির ভাগ টেবিলেই দেখা যাবে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের বই, গাইড বই এবং বিসিএস পরীক্ষার গাইড। এ ছাড়া আরেকটা চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই দেখা যাবে সাজিয়ে রাখা বেশ কিছু গল্পের বই।

লিটু মিয়ার বড় ছেলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। বড় মেয়ে খুলনার সরকারি কলেজে দর্শন বিভাগে মাস্টার্স করছেন। তাঁদের মা খুব দুঃখ করে বলছিলেন, ছেলেমেয়েগুলোকে তো শিক্ষিত করেছি কিন্তু চাকরি কি পাবে? লিটু মিয়ার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে মনে হলো খুবই আত্মবিশ্বাসী ও শিক্ষিত মানসিকতার একজন তরুণী। তাঁর প্রথম ইচ্ছা বিসিএস দেবেন। সেটা না হলে শিক্ষকতা করবেন। জানালেন, কলেজের অধ্যাপকেরা তাঁকে খুবই পছন্দ করেন এবং কলেজের শিক্ষক হিসেবে চাকরি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা তাঁর রয়েছে। বোঝা গেল, সেই আশাতেই আছে গোটা পরিবার।

বিষয়টি উল্লেখ করছি এই কারণে যে শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের মধ্যে পড়ালেখার চর্চা আসলে কতটুকু—সে বিষয়ে কোনো গবেষণা বা রিপোর্ট চোখে পড়ে না। পোশাকশ্রমিকের সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন, বিসিএস দিচ্ছেন, এমনটা কি কল্পনা করা যায়? পোশাকশিল্পের ক্ষেত্রে আমরা বরং সম্পূর্ণ উল্টো চিত্রটি দেখি। পোশাকশ্রমিকদের সন্তানেরা বেশির ভাগই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে এবং দ্রুত কাজে লেগে যায়। বেশির ভাগই দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগই পায় না। অথচ সরকারি মিলের শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষায়

শিক্ষিত হওয়ার রেওয়াজ বহুদিনের। মিলশ্রমিকদের সন্তানেরা সবাই স্কুলে যাচ্ছে এবং স্কুলের পর কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। লিটু মিয়ার মেয়ের মতোই কলোনির অন্য বাড়িগুলোতেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা আছেন। কেউবা পাস করে বিসিএসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেউবা ঢাকার কোনো কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছেন এমন উদাহরণও আছে। এবং এটা সরকারি পাটকলশ্রমিকদের জীবনমান বোঝার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সূচক তো অবশ্যই।

লিটু মিয়ার মেয়ের পড়ার টেবিলে ছিল হুমায়ূন আহমেদ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও ইমদাদুল হক মিলনের বই এবং একটি রান্নার বই। পরে আরও দুজন পাটকলশ্রমিকের ঘরেও গল্পের বই চোখে পড়ল। প্রশ্ন জাগল, আমাদের দেশে গল্পের বই কারা কেনে? শুধুই মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত? পোশাকশ্রমিক বা বেসরকারি মিলশ্রমিকের ঘরে গল্পের বইয়ের দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দেশি যেসব প্রকাশনী সস্তা কাগজে গল্পের বই ছাপে, তাদের বাজার কী রকম? মানসম্মত মজুরি পাওয়া শ্রমিকদের সন্তানেরা গল্পের বই কেনা শুরু করলে এসব দেশীয় প্রকাশনীর বাজার কি বিকশিত হতো?

পাবলিক মিলের বেতন বেশি, পাবলিক মিল লোকসানে চলে, পাবলিক মিলগুলোকে বছরে ২০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়, অথচ পাবলিক মিলের শ্রমিকের বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে একটি শিক্ষিত পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে একটি গোটা অঞ্চলের স্থানীয় অর্থনীতি। দক্ষিণের পাটকল বা উত্তরবঙ্গের চিনিকলশ্রমিকদের কর্মসংস্থান ও সরকারি মজুরির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এলাকার ভাতের হোটেল, কাপড়ের বাজার, ছাপা লুঙ্গির ফ্যাক্টরি, বাচ্চাদের খেলনা, কাঠের ফার্নিচার থেকে শুরু করে দেশীয় কেক, বিস্কুট, চানাচুর, চিপস বা কোক-পেপসির ছোট-বড় অসংখ্য দোকানের ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ মিলগুলো লাভে চলছে না লোকসানে চলছে—তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই পাটকল-চিনিকলশ্রমিকদের বাড়তি খরচ করতে পারার সক্ষমতার ওপর অনেকগুলো অঞ্চলের স্থানীয় অর্থনীতি নির্ভরশীল। অথচ চাল, ডাল কিনতেই যাঁদের বেতন ফুরিয়ে যায়, সেই বেসরকারি মিলের শ্রমিকদের বাসস্থানের আশপাশে এত বিচিত্র বাহারি পণ্যের অর্থনীতি গড়ে ওঠার সুযোগ আছে কি?

কাজেই এটি পরিষ্কার যে শ্রমিকের 'বেশি' মজুরিকে শুধু 'উৎপাদন খরচ' বা 'লোকসানের কারণ' হিসেবে চিহ্নিত করা একটি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। শ্রমিকের বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতাকে স্থানীয় অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে

দেখতে না পারা এবং দরিদ্র শ্রমিককে নিম্নমধ্যবিত্তের কাতারে নিয়ে আসার প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচনা করতে না পারা মূলধারার অর্থনীতিবিদদের স্থানীয় অর্থনীতির বহুবিধ বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রমাণই বহন করে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, দরিদ্র শ্রমিক থেকে নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় যেহেতু স্থানীয় বাজার ও জাতীয় অর্থনীতিতে বহু রকমের পণ্যের চাহিদা তৈরি হয়, এই চাহিদাকে ঘিরে দেশীয় শিল্পায়নের একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি হতে পারে।

পরিশেষে

ওপরের আলাপটি মূলত তিনটি বিষয় মাথায় রেখে করা হয়েছে।

এক. নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে রূপান্তরিত হওয়ার অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত

দুই. শ্রমিকের বাড়তে থাকা ক্রয়ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে মধ্যবিত্তের বিকাশ ও স্থানীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি।

এবং তিন. রপ্তানিমুখী শিল্পের ওপর একচেটিয়া নির্ভরশীলতার বিপরীতে স্থানীয় বাজার ও স্থানীয় শিল্পায়নের গুরুত্বদান।

কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূরক কিছু প্রশ্ন করা আবশ্যক; যেমন বাজারের হাতে ছেড়ে দিলেই কি আপনা-আপনি শিল্পায়ন ঘটে যায়?

উত্তর : না।

স্থানীয় পর্যায়ে শিল্পায়ন ঘটা মানেই কি শ্রমিক উপযুক্ত মজুরি পাবে বা শ্রমিকের জীবনমান বৃদ্ধি পাবে?

উত্তর : না।

মারাত্মক খরচবহুল জীবনব্যয়ের বাস্তবতায় দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত শ্রমিক একটু বেশি মজুরি পেলেই কি 'মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা' অর্জন করতে পারবে?

উত্তর : না।

অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটলেই কি স্থানীয় শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুরসংখ্যক কর্মসংস্থান তৈরি হবে?

উত্তর : অটোমেশনের বাস্তবতায় শিল্পের ধরন ও অঞ্চলভেদে কর্মসংস্থান তৈরি হয়।

বলা বাহুল্য, প্রতিটি প্রশ্নই আলাদা করে বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

তবে সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যেতে পারে যে দিনে দিনে মারাত্মক ব্যয়বহুল হয়ে ওঠা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, আবাসন, পরিবহন, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি ছাড়াও

শ্রমিকের আবাসনসংকট, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, পরিবেশ বিপর্যয়, বিশুদ্ধ পানির অপ্রতুলতা, পুলিশি নিপীড়ন, চাঁদাবাজি ও প্রায় অকার্যকর রাষ্ট্রীয় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তবতায় শুধু নিম্নবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লেই বা মধ্যবিত্তের বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে শিল্পায়ন ঘটলেই সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির চেহারা পাল্টে যাবে—এমন সরলীকরণ করার উপায় নেই। বরং রাষ্ট্রীয় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করতে না পারলে, সুলভে ইউটিলিটি সেবা প্রদান করতে না পারলে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পরিবহন বা আবাসনসংক্রান্ত পলিসিগুলোতে গণমুখী/অধিকারভিত্তিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে না পারলে, শুধু আর্থিক ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়ানো ও মধ্যবিত্তের চাহিদামতো পণ্য সরবরাহ করে দীর্ঘ মেয়াদে একটি টেকসই ও বৈষম্যবিহীন অর্থনীতি তৈরি করা আদৌ সম্ভব নয়।

● **ড. মাহা মির্জা** অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন গবেষক ও অ্যাকটিভিস্ট।

তথ্যসূত্র :

[এডিবি] ADB (Asian Development Bank). The rise of Asia's Middle Class. 2010. https ://www.adb.org/sites/default/files/publication/27726/ki2010-special-chapter.pdf

[বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ] The Boston Consulting Group. The Surging Consumer Market Nobody Saw Coming. 2015. https ://www.bcg.com/publications/2015/bangladesh-the-surging-consumer-market-nobody-saw-coming

[জাইকা] JICA (Japan International Cooperation Agency. Emerging Middle Income Class in Bangladesh. March, 2016. https ://www.jica.go.jp/bangladesh/bangland/pdf/about/Middle%20Income%20Survey.pdf

[খারাস] Kharas, Homi. 'The Rise of the Middle Class' in *Reshaping Tommow : Is South Asia Ready for the Big Leap?* edited by Ejaz Ggani. Oxford University Press. The World Bank. 2011. https ://documents1. worldbank.org/curated/en/311391468101989889/pdf/654200PUB00PUB0ing0Tomorrow0English.pdf

[ম্যাকেঞ্জি গ্লোবাল ইনস্টিটিউট] Mckinsey Global institute. How India's rising and unique middle class will reshape global consumer markets. 2007. https ://www. mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/next-big-spenders-indian-middle-class

[প্যালে, টমাস] Palley, Thomas. The Forces Making for an Economic Collapse. *The Atlantic*. July 1996 issue. https ://www.theatlantic.com/magazine/archive/1996/07/the-forces-making-for-an-economic-collapse/376621/

[সেন] Sen, Binayak. Size and Growth of Middle Class in Bangladesh : Trends, Drivers and Policy Implications. 2015.

[ইউএনসিটিএডি] UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). *Trade and Development Report, 2013.* New York and Geneva. September 12, 2013. http ://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdr2013_en.pdf

আন্তর্জাতিক

ইউক্রেন যুদ্ধের জরায়ু

টনি উড

সারকথা

ইউক্রেন যুদ্ধ যেকোনো দুর্ঘটনা বা হঠাৎ ঘটা ব্যাপার নয়, তা দেখিয়েছেন টনি উড। এই যুদ্ধে ইউক্রেন আক্রান্ত হলেও ভুক্তভোগী কিন্তু সারা বিশ্ব। টনি উড দেখিয়েছেন এই যুদ্ধে কার কতটা দায়। দেখা যায় যে রাশিয়া বনাম পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের বলি হচ্ছে ইউক্রেন। ভুল বা দায়ের হাত কারোরই পরিষ্কার নয়। কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো মিত্ররা ইউক্রেনের রাজনৈতিক সংকটকে ব্যবহার করে রাশিয়াকে কোণঠাসা করতে চেয়েছে, তার ইতিহাস এ লেখায় বলা আছে। সোভিয়েত-পরবর্তী যুগে রাশিয়ার পুনরুত্থান কেন তার চারপাশে ভূরাজনৈতিক ভূমিকম্প ঘটিয়ে চলেছে, তারও কার্যকারণ এখানে খোঁজা হয়েছে। রুশ জাতীয়তাবাদ ইউক্রেনের রুশভাষীদের কীভাবে আরও দূরে ঠেলেছে এবং এ যুদ্ধের সম্ভাব্য সব পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেছেন মার্কিন অধ্যাপক, *নিউ লেফট রিভিউ*-এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য টনি উড। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন **বরকতউল্লাহ মারুফ**।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইউক্রেনে রুশ অভিযান শুরু করে ক্রেমলিন। যুদ্ধের উত্তেজনা কয়েক মাস ধরে তৈরি করা হলেও বেশ দ্রুতই ফলাফল পাওয়া গেল—ব্যাপক প্রাণহানি, কয়েক মিলিয়ন শরণার্থী আর শহর ও জনপদের অর্থহীন ধ্বংসলীলা। শান্তির দেনদরবার হয়তো এর একটা ইতি টানতেই পারত। কিন্তু ইউক্রেনে রুশ আর্টিলারির বোম্বিং আর পশ্চিমা মিলিটারি সহায়তা—এ দুইয়ের লাগাতার বিপ্রতীপ বৃদ্ধি বলে দেয় এ যুদ্ধ আরও কিছুদিন চলবে। পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো যুক্ত হয়ে এই দাবানলে যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করবে, সে সম্ভাবনাও কম। এই যুদ্ধের সমাপ্তি কোথায় হবে তা কেউ জানে না, তবে পৃথিবী ইতিমধ্যে এক নতুন সংকটের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই যুদ্ধের একটি

ঐতিহাসিক ম্যাট্রিক্স বা সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দিয়ে এ রচনায় দেখানো হয়েছে চলমান দ্বন্দ্বের উৎস কোথায় আর সম্ভাব্য কোন কোন পরিস্থিতি সামনে অপেক্ষা করছে।

১.

যুদ্ধ শুরুর দায় আর ধ্বংসের নৈতিক ভার ক্রেমলিনকেই বহন করতে হবে। বিশ্বব্যাপী দিন দিন বাড়তে থাকা স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধবিরোধী আওয়াজে প্রকাশিত হচ্ছে ইউক্রেনের প্রতি সহানুভূতি আর পুতিনের প্রতি অভিযোগ। খোদ রাশিয়াতেও তা অল্পবিস্তর দেখা গেছে। এর ঢেউ যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের রুশ প্রশাসনকে শাস্তি দেওয়া আর একঘরে করার বাসনাকে চাঙা করেছে। তবে যৌক্তিক এই ক্ষোভ আর ইউক্রেনের প্রতি সংহতি আমলে নিতে গিয়ে যুদ্ধের ঐতিহাসিক দায়ের বড় প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না। ইউক্রেন নিয়ে দশকজুড়ে চলতে থাকা ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সবচেয়ে শক্তিশালী পক্ষ ছিল আমেরিকা ও তার ন্যাটো মিত্রপক্ষ। তারাই এই দখলদারির পটভূমি তৈরিতে ভূমিকা পালন করেছে, ঠিক যেভাবে বেলে এপোক (Belle Epoque) নামক ইউরোপীয় সমৃদ্ধির যুগও তখনকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিল। এ যুদ্ধে রাশিয়ার কর্মকাণ্ড আর পুতিনের মগজের বাইরে নজর দিতে ব্যর্থ যেসব বিশ্লেষণ দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে বড়জোর একপেশে ভুলই বলা যায়। এগুলোর সবচেয়ে বাজে দিক হচ্ছে, এতে জেনেবুঝে সত্য গোপন করা হচ্ছে।

পরিষ্কার বোঝাপড়ার জন্য আমাদের তিনটি পরস্পরজড়িত ব্যাখ্যা আমলে নিতে হবে। এক. ১৯৯১-পরবর্তী ইউক্রেনের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও অগ্রাধিকার, দুই. পূর্ব ইউরোপে স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী কৌশলগত শূন্যতার মধ্যে ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রবেশ এবং তিন. সোভিয়েতের পতনের পর থেকে রাশিয়ার জাতীয় পুনরুত্থানের দিকে যাত্রা। এই তিন গতিধারার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও প্রভাবই রাশিয়ার এই অভিযানের বড় পটভূমি তৈরি করে দিয়েছে।

২.

কিছু দীর্ঘমেয়াদি ঘটনাক্রমের তাৎক্ষণিক প্রকাশ বা ফল হলো ইউক্রেন যুদ্ধ। এই যুদ্ধ দেশটিকে দ্বন্দ্বমুখর ভূরাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক প্রকল্পের কেন্দ্রে বসিয়ে দিয়েছে। এর একদিকে রয়েছে ন্যাটো ও ইইউ জুটি। এদের উদ্দেশ্য

আমেরিকার কৌশলগত দখল বাড়ানো এবং ইউক্রেনকে ইউরোপের মধ্যে একটি উদার পুঁজিবাদী উত্থান হিসেবে গড়ে তোলা। অন্যদিকে রয়েছে নিকট প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর রাশিয়ার প্রভাববলয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। এই দুই প্রকল্পের সামরিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শিক আধিপত্যের মধ্যে সমতার ভারসাম্য কখনোই ছিল না। নব্বই দশক ও পরের শূন্য দশকের বেশিটা সময়জুড়ে প্রথম পক্ষ যেখানে বাধাহীনভাবে অগ্রসর হয়েছে, রাশিয়া সেখানে সোভিয়েত-পরবর্তী দুঃসময় কাটানোর কষ্টকল্পনা থেকে সামান্যই এগোতে পেরেছে। শূন্য দশকের মাঝামাঝি যখন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আহরিত রাজস্বের আশীর্বাদে রাশিয়ার অর্থনীতি খানিকটা গতি পেয়েছে, তখন থেকেই সব মৌলিক অসমতা নিয়েই এই দুই শক্তি দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

১৯৯১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ইউক্রেন একই সঙ্গে পশ্চিম ও রাশিয়া উভয় থেকেই স্বাধীন থেকে রাষ্ট্র নির্মাণ ও জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গেছে, নিজের স্বার্থে অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজেছে। কিন্তু শূন্য দশকের শুরুতে যখনই তারা রাশিয়া আর পশ্চিম এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করতে গেছে, তখনই তাদের শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ক্রিমিয়া দখল ও বিশেষ করে দনবাস যুদ্ধের (২০১৪) পর থেকে এই দুই প্রকল্পের দ্বন্দ্ব কেবলই প্রকট হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইউক্রেনকে অনেক প্রাতিষ্ঠানিক বদল ঘটাতে হয়েছে। ফলে তখন দেশটির নেতারা বেশ পাকাপাকিভাবেই পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, যদিও এর পূর্বাঞ্চল তখনো রাশিয়া-সমর্থিত স্বাধীনতাকামী সংঘাতে আটকা পড়ে ছিল। পুতিনের ২০২২ সালের ইউক্রেন অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, ইউক্রেনের চলমান রাজনীতি ও কৌশলগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং তারপর তাকে মস্কোর নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পুনর্গঠন করা। তবে, এত কিছুর পরও সম্ভবত এটি ইতিহাসের সেই অনিবার্য পরিণতিই বরণ করবে, যেভাবে রাশিয়ার সোভিয়েত-পরবর্তী প্রতিবেশীরা তার থেকে খুব দ্রুত দূরে সরে গিয়ে পশ্চিমা ধাঁচের নিরাপত্তা রাষ্ট্র (Security State) তৈরি করেছে। এটা বুঝতে রুশ নীতিনির্ধারকেরা বহু বছর ব্যয় করে ফেলেছেন।

৩.

রুশ আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে ইউক্রেনে যে অতি উৎসাহী পশ্চিমপন্থী প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্য প্রকাশ পেল, তা তার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ও সব অর্থে রাশিয়ার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার বিবেচনায় বেশ বড় চমকই। ভৌগোলিক বিন্যাস,

সংস্কৃতি এবং জনমানুষ বিবেচনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে ইউক্রেনের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারটা ঠিক অন্য বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর মতো ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত সেসব রাষ্ট্রের ভৌগোলিক আর সাংস্কৃতিক পরিচয় বরং সোভিয়েত সংস্কৃতি থেকে বেশ আলাদাই ছিল। বর্তমানের যে ইউক্রেন—এর বিস্তৃতি পশ্চিমাঞ্চলের ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি থেকে শুরু করে পুবের আধুনিক সোভিয়েত শিল্প এলাকা পর্যন্ত। ১৯২২ সালে গৃহযুদ্ধের শুরুতে বলশেভিকরাই ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকের (এসএসআর) সীমানা গড়ে দেয়। এর ভেতর তারা যুক্ত করে কিয়েভ, মধ্যযুগীয় মূল রুশভূমি, অষ্টাদশ শতকের রোমানভ সাম্রাজ্যের দখলকৃত স্তেপভূমি আর শিল্পোন্নত দনবাস অঞ্চল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাপসবার্গসহ পশ্চিমের আরও কিছু ইউক্রেনীয় ভাষাভাষী রাজ্য আর পোলিশ ভূমিও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯২১ থেকে রুশ ইউএসএসআরের মধ্যে থেকেও স্বায়ত্তশাসিত ছিল যে ক্রিমিয়া, ১৯৪৪ সালে যেখানে ক্রিমিয়ান তাতার জনগণ ব্যাপক গণহত্যার শিকার হয়, সেটাকেও ১৯৫৪ সালে ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

শুরুর দিকের সোভিয়েত নীতি, বিশেষ করে লেনিনের আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি ইউক্রেনের ভাষা ও তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে মদদ দিয়েছে। ১৯২০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত জাতীয়তাবাদী সত্তাগুলোকে আলাদা বরাদ্দ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ অন্য অনেক কিছু বিকশিত করা হয়। তবে সে দশকের শেষ দিকে মস্কো এ ধারা উল্টে দিলে ইউক্রেনের জাতীয়তাবাদী বিদ্বৎসমাজ হারিয়ে যায়। কমিউনিস্ট ইউক্রেনের নেতারা সবাই স্থানীয় অধিবাসী হলেও পরে সোভিয়েতায়িত ইউক্রেনের জাতীয় পরিচয় প্রকাশের জায়গা অনেকটাই সংকুচিত হয়ে এসেছিল। রুশদের মধ্যে সব সময়ই একটা 'ইউক্রেন আমাদের ভাই'-জাতীয় আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়ার মনোভাব জারি ছিল। জারের সময় থেকেই সমাজের সব স্তরে এই দুই জাতির মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় অভিবাসন ও বিবাহ বিনিময় চালু ছিল। ইউক্রেনের শিল্পায়িত পূর্বাঞ্চলে যদি রুশভাষীদের আনাগোনা বেশি হয়ে থাকে, তো সাইবেরিয়াজুড়ে কৃষিতে ইউক্রেনের কৃষকদের দখল ও প্রাধান্যও ছিল দেখার মতো। এখানে কে যে উপনিবেশক এবং কে যে তার উপনিবেশ তা বলা অসম্ভব। সোভিয়েতের ভেতর মধ্য এশিয়া বা ককেশীয় দেশগুলোতে নয়, বরং ইউক্রেনে একধরনের ঔপনিবেশিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। গোটা সোভিয়েতে রুশ ভাষাই ছিল রাজনীতি, শিক্ষা আর সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যম। সোভিয়েত আধুনিকায়নের

মাধ্যম হিসেবে রুশ ভাষার বাইরে কোনো দ্বৈত ভাষা তেমন প্রত্যাশিত ছিল না। এ ক্ষেত্রেও ইউক্রেন ছিল ব্যতিক্রম। সোভিয়েত অবসানের পর দেখা যায়, প্রায় গোটা ইউক্রেনেই খাঁটি দ্বৈত ভাষা চালু রয়েছে। বড় শহরগুলোতে রুশ ভাষার পাশাপাশি চালু আছে মিশ্র বা স্থানীয় ভাষা।

সাবেক সোভিয়েতের অংশভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ইউক্রেনের মূল সম্পর্ক ছিল অর্থনৈতিক কাঠামোয়। গোটা ইউনিয়নের বনিয়াদ হিসেবে এই কাঠামো তৈরি করা হয় এবং স্বাধীন হওয়ার পরপরই তা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। বিশাল কৃষি খাতের পাশাপাশি ইউক্রেনের হাতে ছিল খনিজ ও দনবাসের ভারী শিল্প আর উল্লেখযোগ্য সামরিক খাত। ১৯৮০-এর দশক থেকে পতনমুখী সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরোপুরি ভেঙে যাওয়ার পর নোঙরছাড়াভাবে ভেসে যেতে বসে ইউক্রেন। ভগ্নদশায় পতিত দেশটি মরিয়া হয়ে নতুন রপ্তানি বাজার খুঁজতে শুরু করে। অন্যান্য সোভিয়েত-ভাঙা দেশগুলোর তুলনায় এর অবস্থা ছিল কঠিন: ১৯৯০ সালের জিডিপি ১৯৯৯-তে ৬০ শতাংশে নেমে আসে। সোভিয়েত যুগের শেষ দিকে যা ছিল, ২০২০ সালে এসে তার অর্ধেকও নেই। নিজস্ব মুদ্রা চালুর ব্যাপারেও ইউক্রেন ছিল তার সোভিয়েত সহোদরদের মধ্যে সর্বশেষ।

ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, রাশিয়ার সঙ্গে অনন্য সম্পর্ক, সোভিয়েত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উত্তরাধিকার—এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে ইউক্রেন তার অন্য সোভিয়েত সহোদর দেশগুলোর তুলনায় বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিভক্ত দেশে পরিণত হয়। ১৯৯০ সালে দেশটির নতুন যাত্রার শুরুতেই এসব বিষয় চিহ্নিত করা দরকার ছিল, যা তারা পারেনি।

৪.

সোভিয়েত যুগের পর ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বের আকাঙ্ক্ষার পালে জোর হাওয়া দেয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বিশেষ করে রুখ পার্টির নেতৃত্বে। সাবেক প্রভাবশালী আমলাদের একটা অংশও এর নেতৃত্ব দিত। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে স্বাধীনতার পক্ষে ৯১ শতাংশ হ্যাঁ ভোট পড়ে। হ্যাঁ ভোটের এই গণজোয়ারে বিশাল উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট লিওনিড ক্রাভচুকের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জন্ম নেয়। রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি আর বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯৯৪ সালে প্রেসিডেন্ট হয়ে আসেন চেরনিভের রুশভাষী লিওনিড কুচমা।

১৯৯৪ থেকে ২০০৫—এই এক দশকে কুচমা কৌশলগত ভারসাম্য আনতে

গিয়ে দেখেন, দেশের অভ্যন্তরীণ অসমতা পাকাপোক্ত হয়ে আছে। ওরেস্ট সাটেনলির ভাষায়, 'যেহেতু কোন ভূরাজনৈতিক মতবাদ তারা অনুসরণ করবে সে ব্যাপারে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক শক্তিগুলো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না, সেহেতু সবাই আপাতত নিরপেক্ষ থাকাটাই সবচেয়ে ভালো বলে মেনে নেয়।' একদিকে কুচমা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় চুক্তি সম্পাদন করেন ইয়েলৎসিনের সঙ্গে, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ১৯৯৭ সালের একটি চুক্তি, যেখানে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা এবং ব্ল্যাক সি নৌবহরের বিভাজন বিষয়ে সম্মতি দেওয়া হয়। ২০০০-২০০১ সালে তিনি পুতিনের সঙ্গে যে গ্যাস পাইপলাইন চুক্তি করেন, তা অভিজাততন্ত্রকে সুবিধা করে দেয়। পরে রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় করার শর্তে কয়েক স্তরে বেশ কিছু ধনকুবের তৈরি করা হয়। অন্যদিকে ইইউর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও ন্যাটোর সঙ্গে সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে পশ্চিমের কাছেও বেশ কিছু প্রকল্প প্রস্তাব করেন কুচমা। তাঁর আমলেই ২০০৩ সালে ইরাক 'পুনর্গঠনের' কাজে ১ হাজার ৭০০ ইউক্রেনীয় সেনা পাঠানো হয়।

স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক সুবিধার বিনিময়ে এই ভারসাম্য নীতি সোভিয়েত-পরবর্তী যুগে ভুগতে থাকা ইউক্রেনের ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বকে পাকাপোক্ত করে ফেলে। তারা কি স্থায়ীভাবে প্রান্তিক হয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়ে পশ্চিমের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াবে, নাকি সার্বভৌমত্ব হারানো বা এমনকি নব-উত্থানরত রুশ ফেডারেশনের সঙ্গে আবার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করবে? ১৯৯১ সালে ইয়েলৎসিন, ক্রাভচুক এবং বেলারুশের স্তানিশ্লাভ শুসকেভিচের তৈরি করা কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস সম্পর্কে ইউক্রেনের দ্বিধান্বিত মনোভাব অনেকটাই কেটে যায় রুশকরণের ভয় থেকে। ইতিমধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে আরও ভালোভাবে যুক্ত হওয়া এবং একটি শক্তিশালী পুঁজিপতি শ্রেণি গড়ে তোলার লক্ষ্যে উল্লিখিত প্রথম চিন্তা অনুযায়ী ইউক্রেনের উচ্চ মানসম্পন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে কুচমার আগ্রহ বাড়ে। তবে একের পর এক অর্থনৈতিক দুর্ঘটনার কারণে প্রথম পন্থা প্রত্যাখ্যাত হলে মরিয়া হয়ে ওঠা অভিজাততন্ত্র দ্বিতীয়টির ব্যাপারে অর্থাৎ রাশিয়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এরা ছিল শূন্য দশকের শুরুর দিকে সোনার ডিম পাড়া হাঁস হয়ে ওঠা বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার সুবিধাভোগী গ্রাহকগোষ্ঠী।

তবে ইউক্রেনের বাণিজ্যের ধরন ১৯৯১ সালের পর দ্রুত বহুমুখী হয়ে ওঠে। ১৯৯৫ সালে ইউক্রেনের রপ্তানির ৫৩ শতাংশ যেত রাশিয়ায়, ২০০৯

সালে তা ২৫ শতাংশে নেমে আসে। বিপরীতভাবে, একই সময়ে রাশিয়ার মোট আমদানির ৪৩ শতাংশ আসত ইউক্রেন থেকে, যা ২০ শতাংশে নেমে আসে। ইউক্রেনের রপ্তানি বাড়তে থাকে ইইউ দেশগুলোতে—১৯৯৬ সালে যা ছিল ১১ শতাংশ, ২০০৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৪ শতাংশে। বৃহৎ অর্থে এই পরিবর্তন সাবেক সোভিয়েত সদস্যদের কেন্দ্রবিমুখী মনোভাবকেই প্রকাশ করে।

৫.

১৯৯০ সালে মহাশক্তি হিসেবে রাশিয়ার দ্রুত পতনই ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্যোগের মূল কারণ ছিল না। পূর্ব ইউরোপের কৌশলগত সমন্বয়ের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিও ছিল এর বড় কারণ। সোভিয়েত নেতাদের আনাড়ি আশা অনুযায়ী ওয়ারশ চুক্তির বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকা থেকে ন্যাটোর ক্রমাগত সুষম প্রত্যাহার বাস্তবে ঘটেনি। বরং সোভিয়েত সামরিক শক্তি প্রত্যাহারের সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করতে একটুও ভুল করেনি ওয়াশিংটন। যখন জার্মান ঐক্য পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া ন্যাটোর কবজার ভেতরে থেকে সম্পন্ন করা না হলে তা ভেস্তে দেওয়ার হুমকি দেয় আমেরিকা—সোভিয়েত তখনো নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো কথা তোলেনি। সোভিয়েত পশ্চাদপসরণের ফলে মাঠে মার্কিন মহাশক্তির একক হুকুমদারির পরিবেশ সৃষ্টি হলে পূর্ব ইউরোপের নেতারা ন্যাটোর সদস্যপদ নেওয়ার ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ভাইসগ্রাদ গ্রুপের সদস্য চেক রিপাবলিক, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড ১৯৯২ সালেই এ বিষয়ে তাদের লক্ষ্য ঘোষণা করে। পোল্যান্ড সফরে গিয়ে বিল ক্লিনটন বক্তব্য দেন যে, এই জোটে নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন এখন 'হবে কি হবে না তা নয়, বরং কখন ও কীভাবে হবে'। ন্যাটোর বিস্তৃতির বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনে যে অল্পবিস্তর আওয়াজ উঠেছিল, তা অগ্রাহ্য করা হয়। রাশিয়াকে উত্তেজিত করে তুলে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাটো জোটের পুনর্বিবেচনা বিষয়ে রুশ উদ্বেগ উপেক্ষা করে 'পোল্যান্ড বা চেক রিপাবলিকের নিরাপত্তা প্রয়োজন হতে পারে'—এই যুক্তিতে সামরিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। তবে ন্যাটো অভিযানের এই গতি অর্জনের পেছনে মূল আশ্বাস ছিল, রাশিয়া এর জন্য কোনো হুমকি নয়। ১৯৯৯ সালে ভাইসগ্রাদ গ্রুপে যোগ দেওয়ার পর ন্যাটোর এই গতি স্থায়িত্ব পায়। ২০০৪ সালে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়াসহ আরও সাতটি দেশ এতে যোগ দেয়, ২০০৯ সালে তাদের অনুসরণ করে আলবেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া।

যদিও ন্যাটোর এই অভিযান মূলত রাশিয়ার দুর্বলতাকে ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছিল, তবু মস্কোর ওপর এর আঘাত নরম করার জন্য একটা আবডাল তৈরি করা দরকার হয়ে পড়ে, বিশেষ করে ১৯৯৬ সালে ইয়েলৎসিনের পুনর্নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত না করাও একটা উদ্দেশ্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্র তখন দ্বিপদী নীতি নেয়—একদিকে ন্যাটোর সঙ্গে রাশিয়ার সহযোগিতা উৎসাহিত করা হয়, অন্যদিকে রাশিয়ার সদস্যপদের আগ্রহ প্রত্যাখ্যান করা হয়। তবে রাশিয়া তার কৌশলে ন্যাটোর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বুঝতে দেরি করে ফেলে। তারা ভাবে, যদি এই জোট রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত না হয়, তাহলে রাশিয়া কেন এতে যোগ দেবে না? এই আশা জাগরিত হয় তাদের 'পশ্চিমাকরণ' লাইনের পররাষ্ট্রনীতির প্রভাবে। এখানে মূল চিন্তা ছিল পশ্চিমের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সমন্বয় এবং একটা বৈশ্বিক সাধারণ নিরাপত্তাব্যবস্থা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। এই ব্যবস্থা পুতিনের আমলেও দাপটের সঙ্গে চলমান ছিল। ২০০০ সালে তিনি এমনকি ন্যাটোতে রাশিয়ার সদস্যপদের জন্যও প্রস্তাব করেন এবং নিজেদের ইউরোপীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে অবস্থান নিশ্চিত করেন। ১৯৯৯ সালে চেচনিয়ায় রুশ যুদ্ধে পশ্চিমা সমর্থন আর ৯/১১-পরবর্তী বুশের 'ওয়ার অন টেরর'-এ রাশিয়ার সমর্থন এক কাতারে মিলে যায়। কিন্তু বৈশ্বিক একক নিরাপত্তাব্যবস্থার পুনর্নকশা করা তো দূরের কথা, পশ্চিমের সঙ্গে রাশিয়ার আরও গভীর সম্পর্কের আশাটাই মাঠে মারা যায়। ২০০০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বরং পরিষ্কার হয়ে আসে রাশিয়া আর পশ্চিমের স্বার্থ মৌলিকভাবেই বিপরীত। এই বৈপরীত্য ইউক্রেনের ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে আরও পরিষ্কার ও প্রকট হতে থাকে।

৬.

২০০৪-২০০৫ সালে ইউক্রেনে সংঘটিত 'কমলাবিপ্লব' রাশিয়া-সমর্থিত ভিক্টর ইয়ানুকোভিচকে হটিয়ে পশ্চিম-সমর্থিত ভিক্টর ইউশেঙ্কোকে ক্ষমতায় আনে এবং ইউক্রেনকে এক নতুন রাজনৈতিক পথ দেখায়। তবে বেশির ভাগ সাবেক সোভিয়েত সদস্যের তুলনায় ইউক্রেন সে পথ থেকে এখন অনেকটাই সরে এসেছে। দিমিত্রি ফারম্যান ১৯৯০-এর শুরুতে ক্ষমতায় আসা শাসকের সঙ্গে নতুন ক্ষমতাসীনদের সমজাতীয় যোগসূত্র চিহ্নিত করেন এবং একে 'প্রতিফলিত গণতন্ত্র' আখ্যা দেন। এখানে চিহ্নিত করা হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর অগণতান্ত্রিক উপাদানের মধ্যকার ব্যবধান, ভোটের নামে এক পার্টিকে ক্ষমতায় বহাল রাখার এক প্রহসন। ১৯৯০-এর দশকে যদিও ইউক্রেন এই ধারায়

উপনীত হয়, ইয়েলৎসিন এবং কাজাখস্তানের নাজারবায়েভের মতো কুচমাও তাঁর পার্লামেন্টকে কুক্ষিগত করেন এবং নতুন এক সংবিধান চাপিয়ে দেন। তবু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শাসকশ্রেণিকে এক রেখে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব করে তোলে। সাবেক সোভিয়েতের বেশির ভাগ অংশের চেয়ে ইউক্রেনের রাজনৈতিক জীবন ছিল অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক। ইউক্রেনও রাশিয়ার মতো অভিজাততন্ত্রের উন্নয়নের নানামুখী চেহারা দেখেছে। দেখেছে আন্তগোষ্ঠী দ্বন্দ্ব আর আঞ্চলিক বিভিন্ন ইশারা রাজনৈতিক অঙ্গনে ঢুকে পড়তে।

ইউশেঙ্কোর বিজয় ইউক্রেনের ওপর পশ্চিম ও রুশ স্বার্থের দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে, তা আবার দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভক্তির সঙ্গেও মিলে যায়। রাশিয়া এবং পশ্চিমের মধ্যে থেকে পথ করে নেওয়ার কুচমার কৌশল থেকে সরে এসে ইউশেঙ্কো শুরু করেন পশ্চিমমুখী যাত্রা, অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক দুই ক্ষেত্রেই। ২০০৮ সালে ইউক্রেন সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তির বিষয়-আশয় নিয়ে ইইউর সঙ্গে আলাপ শুরু করে এবং ২০০৯ সালে ইইউর পূর্বাঞ্চলীয় পার্টনারশিপে যোগ দেয়। পশ্চিমের সঙ্গে অর্থনৈতিক বন্ধনের ওপর বাজি ধরে ইউশেঙ্কো ইউক্রেনের পুঁজিবাজার উদার করে দেন এবং বিদেশি বিনিয়োগের জোয়ার হাজির করেন। ২০০৪ সালে মোট বিদেশি পুঁজি ১.৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০০৭ সালে লাফিয়ে ওঠে ১০.২ বিলিয়ন ডলারে (অবশ্য আঞ্চলিক মানদণ্ড বিবেচনা করলে তা খুব বেশি নয়, একই সময়ে পোল্যান্ডে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৫ বিলিয়ন ডলার)। তবে সে বিনিয়োগ ইউক্রেনের শিল্পকারখানায় না গিয়ে বেশির ভাগটা গেল পুঁজিবাজার আর রিয়েল এস্টেটে। ইউক্রেনের ব্যাংকগুলোতে বিদেশি পুঁজির শেয়ার ২০০৪-এর ১৩ শতাংশ থেকে ২০০৯-এ বেড়ে দাঁড়াল ৫০ শতাংশে। সে শেয়ারের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ গেল ছয়টি ইইউ দেশের সুদে এবং এক ভাগ রুশ অর্থায়নের খাতে।

২০০৪ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৬ শতাংশ হলেও এর সুফল সামাজিক ও ভৌগোলিক ভিত্তিতে বৈষম্যমূলকভাবে বণ্টিত হয়। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি এবং পোল্যান্ডের অংশ থাকার সময় থেকেই পশ্চিমাঞ্চলের যেসব প্রদেশ ঐতিহাসিকভাবেই দারিদ্র্যপীড়িত ছিল, তারা আরও পিছিয়ে পড়তে থাকে। অর্থনীতিতে কৃষির অবদানে এবং কেন্দ্র আর পূর্বের তুলনায় বেকারত্বের হার বেশ খারাপ হয়ে যায়। কয়লা, পেট্রোলিয়াম কোক আর ইস্পাতের চাহিদা বাড়ায় পূর্বাঞ্চল ভালো অবস্থায় চলে যায়। ২০১৪ সালের জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের পেছনে অনেক কারণের মধ্যে ছিল দীর্ঘদিনের এই

আঞ্চলিক বঞ্চনা। ইইউর শ্রমবাজারের অনেক নিচের দিকের মজুরিও হতাশ জনগণের কাছে অপেক্ষাকৃত ভালো মনে হওয়ায় এই আন্দোলনের পেছনে ইইউমুখী ভাবাবেগও কাজ করে। ওদিকে সরকারের পশ্চিমাকরণ নীতি যখন জনগণের বড় একটা অংশের দ্বারা সমর্থিত হয়, তখনো রাশিয়ার সঙ্গে পুর্বের প্রদেশগুলোর অর্থনৈতিক সংযুক্তি ও সাংস্কৃতিক নৈকট্য বজায় থাকে। তারা ২০১০ সালে ইয়ানুকোভিচের সফলভাবে ক্ষমতায় আসার ভিত্তি হিসেবে শক্ত ঘাঁটি হিসেবে তৈরি থাকে। ফলে মনে রাখতে হয়, প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ থেকে নিশ্চিন্তে একটা বেছে নেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না দেশটি এবং এই বেছে নেওয়ার ব্যাপারটাই ইউক্রেনের ঘরোয়া রাজনীতিতে বিভক্তির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

৭.

ইইউর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি ইউশেঙ্কো ন্যাটোর পূর্ণ সদস্যপদের জন্য আবেদন করেন। তবে সে সময় এর পক্ষে খুব জনপ্রিয় কোনো সমর্থন ছিল না এবং ইউক্রেনের সংবিধানে বিদেশি সামরিক ঘাঁটির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। যাহোক, ইউক্রেনের আবেদন অনুমোদন পায় ২০০৮-এর এপ্রিলে ন্যাটোর বুখারেস্ট সম্মেলনে। জর্জিয়ার আবেদনও অনুমোদন পায় একই দিনে। কিন্তু ইউক্রেন ও জর্জিয়ার সদস্যপদ নিয়ে পুতিনের আপত্তির মুখে এই প্রক্রিয়াকে সুস্পষ্ট সময়সীমা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ এক মোড় ফেরানো ঘটনা। তখন ন্যাটোর বিস্তারের নেতৃত্বে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা নিয়ে কথা ওঠে। ইউক্রেন ও জর্জিয়াকে তাৎক্ষণিকভাবে সদস্যপদ দেওয়ার ব্যাপারে রাশিয়ার আপত্তির কথা খুব ভালোভাবে জানা থাকার পরও বুশ প্রশাসন এ ব্যাপারে ফ্রান্স ও জার্মানির দ্বিধা উপেক্ষা করেই এ প্রক্রিয়া অগ্রসর করতে কোনো অসুবিধা দেখেনি। এ ঘটনা আবেদনকারী দেশ দুটিকে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রাখে, যেখানে সদস্যপদ থেকে কোনো কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পাওয়ার উপায় নেই। পাঁচ হাজার মাইলের নিরাপদ দূরত্বে বসে ওয়াশিংটনের চাপানো এই নীতিগত সিদ্ধান্ত জেনেশুনে জর্জিয়া ও ইউক্রেনের জনগণকে বিপদে ফেলে দেয়। এই লজ্জাজনক কৌশলগত হিসাবের মূল্য দিতে বাধ্য হয় কেবল নন-ন্যাটো সদস্যরা।

ন্যাটোর অনুমান ছিল, রাশিয়া হয়তো দ্বিতীয় দফার সম্প্রসারণও মেনে নিতে বাধ্য হবে, আগেও যেমনটা হয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সালে জোটের বৃদ্ধি ঠেকাতে

সে সময়ের রাশিয়ার অক্ষমতা আর এ ব্যাপারে স্থায়ী সম্মতি এক নয়। ন্যাটো পরিকল্পনাকারীরা অবশ্যই আগে থেকে জানতেন যে আগে বা পরে এ ধরনের আপত্তির মুখোমুখি তাঁরা হবেন। বুখারেস্ট সম্মেলনের চার মাস যেতেই রাশিয়া-জর্জিয়া যুদ্ধের রূপে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ২০০৮ আগস্টের এ যুদ্ধের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক দিনের হলেও ঠিক এই পদ্ধতিটাই ইউক্রেনে প্রয়োগ করা হয় ২০১৪ সালে। ক্রেমলিনের সম্মতিতে মানবিক 'সুরক্ষার দায়িত্ব' নাম নিয়ে এবং পূর্বতন পশ্চিমা রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে গৃহীত রুশ পদক্ষেপ কার্যকরভাবে ইউক্রেনের বিভক্তিগুলোকে আরও গভীর করে বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্বে রূপ দেয়। আগে এসব গোষ্ঠীর কাজ ছিল পরিপূর্ণ ন্যাটো সদস্যপদের বিপক্ষে কাজ করা। একই সঙ্গে রুশ-জর্জিয়া যুদ্ধের মাধ্যমে পরিষ্কার হয় যে শক্তি প্রয়োগ ছাড়া ক্রেমলিনের হাতে দেনদরবারের উপায়ের অভাব রয়েছে। পরে ধীরে ধীরে শক্তি প্রয়োগই তাদের প্রধান পররাষ্ট্রনীতিতে পরিণত হয়। সামরিক শক্তি ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতার দেয়ালও আরও নিচু হতে থাকে। তবু যখন রাশিয়ার অভিযান দৃশ্যত প্রত্যাহার করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নীতি মোটাদাগে একই থাকে, ফলে ভবিষ্যৎ সংঘাত প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে।

৮.

২০১৩-১৪ সালে সংঘটিত ইউক্রেনের ময়দান বিদ্রোহ এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের ফলে দেশটির রাজনীতিতে শক্তিশালী কতগুলো মেরুকরণ দানা বাঁধে। এসবের ফলে বাইরের অর্থনৈতিক বা ভূরাজনৈতিক নিয়ামকগুলো পরস্পরবিরোধী বিকল্পে পরিণত হয়। হয় পশ্চিম, না হয় রাশিয়া, হয় ন্যাটো অথবা পুতিন, হয় ইইউ অথবা রুশ নেতৃত্বাধীন ইউরেশীয় ইউনিয়ন, এমনকি সভ্যতা নাকি বর্বরতা, রাজনৈতিক শক্তি তথা জনগণ—এসব বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে দেশটি। দেশটির থমকে যাওয়া অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই বিপ্রতীপ মেরুকরণ অসম রাজনৈতিক, সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক মানচিত্র ঢেকে দেয়। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কায় জিডিপি ১৫ শতাংশ নেমে যায়—পরে কিছুটা সামলে উঠলেও ২০১৩ সালে প্রবৃদ্ধির রেখা একই থাকে। ইয়ানুকোভিচের দুর্নীতি আর স্বৈরশাসনে অর্থনৈতিক হতাশা চরমে ওঠে। দোনেৎস্কের সাবেক গভর্নর এবং তাঁর অনুসারীরা পরিষ্কারভাবে রাশিয়ার পক্ষে ঝুঁকে পড়েন। অবশ্যই সেখান থেকে ব্যক্তিগত লাভ তুলে আনাও তাঁদের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু ইয়ানুকোভিচের শাসন দেশের পশ্চিমমুখী গতি অব্যাহত রেখে ইইউর সঙ্গে

দেনদরবার ও অ্যাসোসিয়েশন চুক্তি চালিয়ে যেতে থাকে। বোঝা যাচ্ছিল অ্যাসোসিয়েশন চুক্তির শর্ত দ্বারা দেশীয় শিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, এমনকি অভিজাতদের মধ্যে অনেকেরই ইইউর সঙ্গে ফাঁস লাগা অবস্থায় বাণিজ্য করায় আপত্তি ছিল। তারা রাশিয়ার সঙ্গেই বাণিজ্য চালিয়ে যায়।

ইউরো-ময়দান আন্দোলন কঠোরভাবে দমনের পর ডিসেম্বর ২০১৩-তে ইয়ানুকোভিচের চুক্তি স্বাক্ষর ছিল ইউটার্ন। ফলে তা বৃহত্তর বিদ্রোহের জন্ম দেয় এবং পরের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর ক্ষমতাচ্যুতি ঘটে। ময়দান আন্দোলন পূর্বতন ব্যবস্থার বহু অকার্যকারিতা প্রকাশ করে এবং এটাও দেখিয়ে দেয় রাশিয়ামুখী রাজনীতিকদের সমর্থন করা কতটা নাজুক ব্যাপার ছিল। ইয়ানুকোভিচ ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের চূড়ান্ত অপমানের পর শিগগিরই পশ্চিমপন্থী নেতারা রাজনীতির মঞ্চের দখল নিয়ে নেন এবং তাঁরা ময়দানের জমায়েতের অনুমোদন আদায় করতে সক্ষম হন। তবে কিয়েভের রাস্তার আন্দোলনের তাৎক্ষণিক জনমত সারা দেশের ঘটনাবলি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। রাজধানীর রাজনৈতিক বিকাশের প্রতিক্রিয়ায় রুশভাষী পূর্ব অঞ্চলে রাজনৈতিক ফাটল দেখা দেয়, ক্রেমলিন ক্রিমিয়া দখল এবং দনবাসের স্বাধীনতাকামীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার মাধ্যমে সেই ফাটলকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রশস্ত দরজায় পরিণত করা হয়। এসব পদক্ষেপ ইউক্রেনের জাতীয়তাবাদীদের দীর্ঘদিনের দাবিকে প্রমাণ করে যে দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য রাশিয়া একটি হুমকি হয়ে উঠেছে। দনবাসের যুদ্ধ এবং ক্রিমিয়া দখলও শেষ পর্যন্ত সেই প্রত্যাশিত ফলই নিয়ে এল : পশ্চিমপন্থী ইউক্রেনের শক্তিশালী ঐক্য এবং ইইউ ও ন্যাটোর সঙ্গে জোরদার বন্ধন।

৯

২০১৩-১৪ সালের ইউক্রেন সংকটকে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক রূপান্তরপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বাহ্যিকভাবে, নিঃসন্দেহে এটি ক্রেমলিনের জন্য একটি ভূরাজনৈতিক পরাজয় ছিল। এতে ইউক্রেনের পশ্চিমাপন্থী অবস্থান আরও জোরদার হয় এবং রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের শত্রুতা আরও তীক্ষ্ণ হয়। যদিও অভ্যন্তরীণভাবে ক্রিমিয়ার অধিগ্রহণকে ক্রেমলিন বিজয় হিসেবে ঘোষণা করে এবং এটি 'রাশিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ' হিসেবে বিবেচিত জাতীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে ফিরে আসে। পুতিন তাঁর মার্চ ২০১৪-এর বক্তৃতায় রুশ ফেডারেশনে ক্রিমিয়ার

অন্তর্ভুক্তির যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা সেই সময়ে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়। রাশিয়ায় তখন একটি 'ক্রিমিয়ান ঐকমত্য' তৈরি হয়েছিল, তা পশ্চিমের সঙ্গে আসন্ন দ্বন্দ্ব মোকাবিলায় পুতিনকে আরও সক্ষম করেছিল। কিন্তু এই ঐকমত্যের সফল প্রতিষ্ঠা নিজেই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করেছে: সরকারি মতবাদ ও চর্চার মধ্যে রাশিয়ার পরাশক্তি জাতীয়তাবাদের নতুন প্রাধান্য।

১০.

ময়দান বিক্ষোভ ছিল ইউক্রেনে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সংকটের প্রতিফলন। সোভিয়েত-উত্তর সব রাষ্ট্রেই এ সংকট দেখা গেলেও ইউক্রেনের এই বিক্ষোভে বাইরের শক্তি দ্বারা দেশটির ভূরাজনৈতিক খেলার ঘুঁটি হওয়ার প্রতিবাদে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। সংকটের সমাধান দূরে থাক, ইউক্রেনের ময়দান-পরবর্তী রাজনৈতিক তৎপরতা এই সংকটকে কেবল ঘনীভূত করে। বিবাদ আরও তীব্র হয় ওয়াশিংটন আর ব্রাসেলসের সঙ্গে সরকারের ক্রমাগত ভূরাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক সমন্বয়ের পদক্ষেপে।

২০১৪ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর পেত্রো পোরোশেঙ্কো ইইউর সঙ্গে ডিপ অ্যান্ড কমপ্রিহেনসিভ ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (ডিসিএফটিএ) স্বাক্ষর করেন, যা ২০১৬ থেকে কার্যকর হয়। এর মধ্যে আমেরিকা তাদের জন্য ২০১৪-২১ সময়কালের জন্য ৪ বিলিয়ন ডলারের বিশাল আকারের সাহায্য বরাদ্দ করে। এর মধ্যে ২.৫ বিলিয়ন ডলার ছিল সামরিক সহায়তা। ময়দান-পরবর্তী প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দেনদরবারে আমেরিকান কূটনীতিকেরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন এবং পরে ইউক্রেনের সামরিক ও গোয়েন্দা বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। দ্রুত জিডিপি সংকোচন ও দেশের ঋণ পাহাড়সমান হয়ে গেলে পোরোশেঙ্কো আইএমএফের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যাপক উদারবাদী সংস্কারের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেন। তাঁর লিথুয়ানিয়ায় জন্মগ্রহণ করা অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রী আইভারাস আব্রোমাভিচিয়াসের ভাষায়, 'এই সংকটের সুযোগ নষ্ট করাটা দুঃখজনক হবে।'

ময়দান-পরবর্তী রাজনীতিতে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের হঠাৎ ব্যাপক ক্ষমতায়ন। ময়দান বিক্ষোভের সবচেয়ে গোছানো আর প্রধান শক্তি হিসেবে শুরু থেকেই তারা অন্য যে কারও চেয়ে লোক জড়ো করার ব্যাপক দক্ষতা অর্জন করে। পশ্চিমপন্থী উদারবাদীরা নীতিনির্ধারক মহল আর এনজিওর মাধ্যমে শক্ত অবস্থানে থাকলেও এতটা ওজন

তাদের ছিল না। ভলোদিমির ইউশেঙ্কোর মতে, সিভিল সোসাইটির লিবারেল শাখা আর চরম ডানপন্থীদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক দেয়াল না থাকার কারণে পশ্চিমপন্থী লিবারেলদের দুর্বলতা আরও ঘনীভূত হয়। এটি ডানপন্থীদের নিজেদের সক্ষমতার চেয়ে বেশি মতাদর্শিক প্রভাব ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা অর্জনে সহায়ক করে তোলে এবং নির্বাচনে তাদের সাফল্য আনে। ফলে স্ভবোদা (Servant of the People Party) পার্টির ভরাডুবি হয়, অতি ডানপন্থী স্লোগান জনপরিসরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরসেন আভাকভের সাত বছর মেয়াদের (২০১৪-২১) সময় গঠিত চরম ডানপন্থী আধা সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

জাতীয়তাবাদী ডানপন্থীদের ভাষায় ইউক্রেনের ওপর প্রতিবেশী রাশিয়ার স্থায়ী অত্যাচার নামক চলমান দনবাস যুদ্ধের ফল বেশ ভয়াবহ হয়ে ওঠে। প্রথম ছয় মাসেই ব্যাপক প্রাণহানি আর অভিবাসন ঘটে। অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত উভয় পক্ষে প্রায় চার হাজার মৃত্যু, ইউক্রেনে পাঁচ লাখ নিবন্ধিত অভিবাসী এবং দশ হাজারের বেশি রাশিয়ায় পলায়নের পরও মৃত্যু ও ধ্বংস চলমান রয়েছে। ২০১৮ সালের মে মাস নাগাদ বেসামরিক মৃত্যু দাঁড়ায় তিন হাজার ও পঙ্গুত্ববরণ করে সাত হাজার। যদিও এ পরিস্থিতিতে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া বেশ কঠিন। একটি সূত্রমতে, এসব মৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশ ঘটে ঘনবসতিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদী-সমর্থিত অঞ্চলগুলোতে।

২০১৫ ফেব্রুয়ারিতে মিনস্কের অস্ত্রবিরতি অনেকটাই ছিল ফাঁকা বুলি, নতুন ক্ষমতায়িত জাতীয়তাবাদীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। রাশিয়ার সঙ্গে যেকোনো চুক্তিকেই তারা দেখে সমস্যা বা ষড়যন্ত্র হিসেবে। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে লিবারেল হোক বা অতি ডানপন্থী, জনমতের একটা বড় অংশই রাশিয়ার প্রতি কোনো ছাড়ের সংকেত পেলেই তা রুখতে একত্র হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, দ্বিতীয় মিনস্ক প্রটোকল ২০১৫ অনুযায়ী সাংবিধানিক পরিবর্তন (ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক প্রদেশের বিশেষ মর্যাদা) কেন করেননি পোরোশেঙ্কো বা তাঁর উত্তরসূরি ভলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁরা উভয়েই নির্বাচিত হয়েছিলেন শান্তির জন্য।

২০১৯ সালে জেলেনস্কির বিজয় ওপরে বর্ণিত প্রতিনিধিত্বের সংকটের নজির সৃষ্টি করে। এপ্রিলের নির্বাচনে তিনি ৭৩ শতাংশ ভোট পেয়ে বিপুল ব্যবধানে বিজয়ী হন, পোরোশেঙ্কো পান মাত্র ২৪ শতাংশ। এ ধারা অব্যাহত থাকে জুলাইয়ে আইনসভার নির্বাচনেও, যেখানে জেলেনস্কির জনপ্রিয় টিভি শোর নামে নামকরণ করা মাত্র কয়েক মাস বয়সী 'জনসেবক পার্টি' ৪৩ শতাংশ ভোট এবং

৪৫০ আসনের মধ্যে ২৫৪টিতে বিজয়ী হয়। প্রতিষ্ঠানবিরোধী ভাবাবেগই ছিল জেলেনস্কির আবেদনের মূল সুর, চলমান অর্থনৈতিক অচলাবস্থার হতাশা আর অভিজাততন্ত্রের দুর্নীতি থেকেই যার জন্ম। পোরোশেঙ্কো পেনশন কমিয়ে দিয়েছিলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদী অঞ্চলগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য অবরুদ্ধ করেছিলেন এবং জনপরিসরে রুশ ভাষা ব্যবহার সীমিত করেছিলেন। তার বিপরীতে জেলেনস্কির কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে দনবাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি এবং রুশভাষীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যের নীতি। বিশেষ করে যেখানে তিনি পোরোশেঙ্কোকে আরও বড় ব্যবধানে হারান, সেই পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে এই অবস্থান নেন।

জেলেনস্কির ক্ষমতা গ্রহণের পর ইউক্রেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সম্মিলিত এবং শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী ও পশ্চিমপন্থী নীতির কাছে তার এই প্ল্যাটফর্ম নতজানু হয়। তিনি রাশিয়ার কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়ার অভিযোগেও অভিযুক্ত হন, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে এ এক মোক্ষম অস্ত্র হয়ে ওঠে। অভিজাতেরা সুযোগ বুঝে এ অস্ত্র প্রয়োগ করলেও জাতীয় পর্যায়ে এটি বেশ প্রভাব বিস্তার করে, মেরুকরণ বাড়িয়ে তোলে এবং সরকারের পক্ষে তা মেটানোর সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত করে আনে। যেমন অক্টোবর ২০১৯-এ জেলেনস্কির সরকার 'স্টেইনমেয়ার ফর্মুলা'য় সম্মতির ঘোষণা দেয়, যা ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী সত্তাগুলোকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারে ইতিপূর্বে মিনস্কে সম্মত হওয়া চুক্তির একটা কৌশলগত পদক্ষেপ। এর জবাবে 'আত্মসমর্পণ নয়' স্লোগান দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ দেখা দেয় এবং অতি ডানেরা অসহযোগ চালিয়ে যেতে অবরোধ ডেকে বসে।

মিনস্ক চুক্তি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণে পরিষ্কার বাধা মানে পাশ্চাত্যপন্থী নীতির দিকেই আরও এগিয়ে যাওয়া। ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের সংবিধানে সংশোধন এনে 'জোটনিরপেক্ষ' অবস্থান বাতিল করা হয় এবং 'ইউক্রেনের ইউরোপীয় ও ইউরো-আটলান্টিক অভিমুখে অদম্য যাত্রার' ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে ন্যাটোর সদস্যপদের প্রতিশ্রুতিও নথিবদ্ধ করা হয়। একটা জরিপে দেখা যায়, সে সময় ইউক্রেনের জনগণের প্রায় ৪৫ শতাংশ ন্যাটোতে যোগ দেওয়ায় সমর্থন জানান।

২০১৪-পরবর্তী সামরিক সংকটের চক্র ছিল ইউক্রেনের জাতীয় চেতনাকে এক সুতায় গাঁথার শক্তিশালী নিয়ামক, তা বৃহৎ প্রতিবেশীর প্রতি আরও বেশি শত্রুতা দিয়েই প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিহাসের বহু অতীত ঘটনার মতোই, ২০১৪ সালের পর থেকে ইউক্রেনের জাতি নির্মাণ ও রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়া বহিঃশক্তির হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং যুদ্ধ দ্বারা ব্যাহত হয়েছে।

১১.

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে পুতিনের টেলিভিশনে সম্প্রচারিত বক্তব্যে আসন্ন অভিযানকে যুক্তিসংগত করার প্রয়াস দেখা যায়, ইউক্রেনের প্রতি তাদের মনোভাব সেখানে প্রকাশিত হয়। তবে এর কোনোটিই পুতিনের একার বক্তব্য নয়। নীতি আর চর্চায় স্পষ্ট কিন্তু বিশ্লেষণে আলাদা, রাশিয়ার অভিজাতদের চিন্তার বিভিন্ন স্তরে এমন আচরণ প্রোথিত। তাদের হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্তমালায় এই অভিযানের ব্যাপারে যৌক্তিক হিসাবের পাশাপাশি সাম্রাজ্য দখলের মিশ্র আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ পায়। এই চিন্তার একটা স্তর হচ্ছে নিরেট ভূরাজনৈতিক, যেখানে ইউক্রেন হচ্ছে একটা অত্যন্ত কৌশলগত এলাকা, কোনো রুশ সরকারই যা ন্যাটোর হাতে চলে যেতে দিতে রাজি হবে না। সাবেক সোভিয়েত যুগের ধারণা ও রুশ জাতীয়তাবাদের বিস্তার দ্বারা চালিত দ্বিতীয় স্তরের চিন্তা বলছে, ইউক্রেন 'একটা সত্যিকারের দেশই না', যা ২০০৮ সালে পুতিন জর্জ ডব্লিউ বুশকে বলেছিলেন। ঐতিহাসিক নির্মাণ থেকে উৎসারিত ইউক্রেন সম্পর্কে এই ধারণা রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে সমর্থিত, গর্বাচেভ থেকে শুরু করে সোল ঝেনেৎসিন পর্যন্ত নায়কেরা এটা নির্মাণ করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে সাম্রাজ্যিক ঐতিহ্যে তা লালিত হয়ে আসছে। ইউক্রেন সম্পর্কে সাম্প্রতিক তৃতীয় পূর্ব ধারণাটি হচ্ছে, ইউক্রেন একটি সংযুক্ত কিন্তু পৃথক দেশ, যারা এখন রাশিয়া থেকে ভিন্ন একটি রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের দিকে সরে যাচ্ছে। রাশিয়া সেখানে 'প্রতিফলিত গণতন্ত্র' রক্ষার চেষ্টা করে গেছে, কিন্তু ইউক্রেন জনপ্রিয় গণ-অভ্যুত্থানগুলোর মধ্য দিয়ে বারবার সেটা প্রত্যাখ্যান করে গেছে। বিশেষ করে ময়দান অভ্যুত্থানের ফলে যে রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়, ক্রেমলিনের চোখে তা সরাসরি হুমকি হয়ে ওঠে। চতুর্থত, ইউক্রেনের একটা ভূ-অর্থনৈতিক অবস্থান রয়েছে: এটি রাশিয়ার গ্যাস পাইপলাইনে করে ইউরোপীয় বাজারে নেওয়ার জমিনই শুধু নয়, রাশিয়া চালিত যেকোনো আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রকল্পের সম্ভাব্য বৃহত্তম বাজারও বটে।

অভিযানের সিদ্ধান্তে এসব ভাবনার সবই স্থবির হয়ে যায়। পুতিনের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষণে প্রত্যাশিতভাবেই উঠে আসে ন্যাটোর বিস্তৃতি ও পশ্চিমের পরস্পরবিরোধী অবস্থানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সমালোচনা করা হয় ময়দান-পরবর্তী ইউক্রেনের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ এবং নব্য-নাজিবাদকে। এসবই রাশিয়ার সরকারি মিডিয়ার মুখস্থ ভাষ্য। তবে বক্তব্যের বেশির ভাগজুড়ে ছিল দীর্ঘ ইতিহাস পাঠ, যার উদ্দেশ্য ছিল ইউক্রেনের বর্তমান সীমানার কৃত্রিম

চরিত্রটি প্রমাণ করা। পুতিন জাতীয় প্রশ্নে লেনিন এবং বলশেভিকদের নীতির প্রতি তাঁর ক্ষোভই প্রকাশ করেন এই বলে যে, 'ওই সব বুনো, কল্পনাতীত হিংসুটে জাতীয়তাবাদীর প্রতি এত সব উদার উপহারের কী দরকার ছিল'? বর্তমানের দিকে ফিরে পুতিন ঘোষণা দেন, যদি ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীদের সত্যিকারের চাওয়াটা হয় 'কমিউনিজমের বিলোপ', বিশেষ করে 'কমিউনিস্ট' সংগঠন ও প্রতীকগুলোকে নিষিদ্ধ করতে ২০১৫-এর রাডা আইন প্রণয়ন এবং পাইকারি হারে রাস্তাগুলোর পুনরায় নামকরণের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'তাহলে আমাদের অসুবিধা নেই'। তাহলে কমিউনিস্টরা ইউক্রেনকে যেসব অঞ্চল 'দিয়েছে', তা হারানোর জন্য ইউক্রেনীয়দের প্রস্তুত থাকতে হবে। দোনেৎস্ক এবং লুহানস্ক পিপলস রিপাবলিক হচ্ছে এর প্রথম পদক্ষেপ। এই খেলায় ইতিহাসের স্মরণ মানে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যাবর্তন নয়, বরং অধীন ও আধা সার্বভৌম ইউক্রেনকে পুনরায় সংযুক্ত করা। এটা বরং সোভিয়েত উত্তরাধিকারের বন্ধন ছিন্ন করে সাম্রাজ্যের যুগে প্রত্যাবর্তন, ইউক্রেনকে ভাগ করার চেতনার উত্থান।

সত্যি কথা বলতে, বরাবরই রুশ নীতির লক্ষ্য ছিল এটাই—হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে কিছুটা আগ্রাসী নয়া সাম্রাজ্যবাদী ঝোঁক। ন্যাটোর বিস্তৃতির সময় চুপ থাকলেও এখন ইউক্রেনের ওপর ধ্বংসাত্মক আগ্রাসনে এই ঝোঁক ঠিকই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। লিবারেলদের অনেকে বলছেন, রুশ আগ্রাসন প্রমাণ করে ন্যাটোর বিস্তৃতি তাদের লক্ষ্য ছিল না, বরং একটা সার্বভৌম ইউক্রেন রাশিয়ার পক্ষে মেনে নিতে না পারাই ছিল এই অভিযানের পেছনে মূল অজুহাত। আমেরিকান এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য হচ্ছে, দৃশ্যপট থেকে ন্যাটোর সম্প্রসারণ মুছে দেওয়াটাই এখানে মূল বিষয়, বামপন্থীদের কেউ কেউ এই বক্তব্যের একটি ধরন মেনে নেন, তাঁরা ন্যাটোর ভূমিকাসংক্রান্ত বয়ান মেনে নেওয়ার জন্য নিজেদের এবং তাঁদের সমমনাদের সমালোচনাও করেন। অন্যরা বলেছেন, যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগই দেওয়া হচ্ছে না, সেগুলো হচ্ছে ক্রেমলিনের হিসাবের মধ্যে একটি আত্মম্ভরি জাতীয়তাবাদ রয়েছে, তা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যেকোনো যুক্তিগ্রাহ্য বিবেচনাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার বিপজ্জনক ক্ষমতা রাখে এবং রাশিয়ার সরব ভূমিকা কেবল পশ্চিমা পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া নয়, বরং নিজের চারপাশে নব্য-সাম্রাজ্যবাদী চাপের প্রদর্শন।

দৃশ্যত পরস্পরবিরোধী দুটি ব্যাখ্যার যে ছক দেখা যাচ্ছে তা শেষ পর্যন্ত ভুল। এদের একটি ন্যাটোর বিস্তারকে বড় করে দেখাচ্ছে, অন্যটি দীর্ঘদিন ধরে সুপ্ত থাকা রুশ জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সামনে আনছে, একটি অনুমাননির্ভর হয়ে

রাশিয়ার দোষক্ষালন করছে আর অন্যটি ন্যাটোর ভূমিকাকে খাটো করে দিচ্ছে। এমন কোনো বাস্তব জগৎ নেই, যেখানে ন্যাটোর বিস্তার ঘটেনি এবং দৃঢ়চেতা ও সামরিকায়িত রুশ জাতীয়তাবাদও এ প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। ইউক্রেনের ব্যাপারে রাশিয়ার জাতীয়তাবাদী আবেগ সব সময়ই তার ভূকৌশলগত হিসাবের অন্তর্গত ছিল। আমরা কোন নিয়ামককে কতটা ওজন দিয়ে মাপছি, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তবে এগুলো যে একই সঙ্গে বিদ্যমান, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। এগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া কোনোভাবেই রাশিয়ার ইউক্রেন দখলের দায়দায়িত্ব খর্ব করে না। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতির কাজ শুধু খল যুদ্ধকে অভিযুক্ত করাই নয়, বরং মহাশক্তিগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্বের বিষয়টিও অনুধাবন করা, যা নিয়মিতভাবে এসব যুদ্ধের অবতারণা করছে।

১২.

ঘনিয়ে আসা এ যুদ্ধ নিয়ে যাঁরা কথা বলে আসছিলেন, রাশিয়ার ইউক্রেন দখলের আচমকা সিদ্ধান্তে তাঁরাও অবাক হলেন। কিছু বাগ্মী পর্যবেক্ষক আশা করেছিলেন, দনবাসের স্বীকৃতির পর এটা হয়তো রাশিয়ার সীমানা বৃদ্ধির জন্য সীমিত পরিসরের একটা সামরিক অভিযান হবে। এসব ভাবনা বহুগুণ ছাড়িয়ে যাওয়া সামরিক আগ্রাসনের প্রাথমিক ধাক্কা আরও জটিল হয়ে ওঠে ক্রেমলিনের আপাত-বিভ্রান্তিকর যুদ্ধ লক্ষ্যের ঘোষণার দ্বারা—ইউক্রেনকে সামরিকায়নমুক্ত এবং 'নাৎসিমুক্ত' করা। বোঝা যাচ্ছে, এ দ্বারা ইউক্রেনের সামরিক শক্তিকে চিরতরে পঙ্গু করাই শুধু নয়, এখানে একটা নতুন রাজনৈতিক শাসন চালু করাও ছিল রাশিয়ার লক্ষ্য। ক্রেমলিনের পক্ষে কি এটা বেশি অযৌক্তিক হয়ে যায় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে মৌলিক কৌশলগত চিন্তার ছাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়? যারা ২০০৪ সালে একটা নির্বাচন সামলাতে পারেনি, সেই রাশিয়া ২০২২ সালে একটা দেশে একটা পুতুল সরকার বসিয়ে দিতে পারত—এই ধারণা ঠিক যুক্তগ্রাহ্য নয়। তবু প্রাথমিক সামরিক কৌশল অর্থাৎ দ্রুত কিয়েভ দখল এবং সরকারকে রাজধানীছাড়া করার চেষ্টার মধ্যে এই উচ্চাশা প্রতিফলিত হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই এই কৌশল দৃশ্যত ব্যর্থ হয়, নতুন করে হিসাব করে তারা চেচনিয়ার মতো আর্টিলারি বোম্বিং ও অবরোধের পথ বেছে নেয়। দখলকৃত এলাকায় রুশ বাহিনীর নৃশংসতার খবরগুলো সেই নোংরা ইতিহাসেরই সাক্ষ্য দেয়।

রুশ সেনাবাহিনীর কৌশলের মধ্যে আজব স্ববিরোধিতা হচ্ছে, ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশেই বড় ধরনের ধ্বংস সাধিত হয়েছে অথচ এসব এলাকাই

তুলনামূলক বেশি 'রুশ প্রভাবিত' এলাকা, যাদের ক্রেমলিন 'স্বাধীন' করতে চাইছে। পুতিনের ২১ ফেব্রুয়ারির বক্তব্যে 'রুশ ভূমিকে একত্র করা'র কথা থাকলেও যুদ্ধের প্রথম আঘাতটা গিয়ে পড়ল রুশভাষী অঞ্চলে। ইউক্রেনের মধ্যে ক্রেমলিনের সংখ্যালঘু মিত্র হয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর অসন্তোষই হতে পারে এই কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য ফল। তাদের ভালো থাকাকে এভাবে অগ্রাহ্য করাটা কি গোয়েন্দাদের অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা নয়? শীর্ষ ব্যক্তিদের কি সত্যিই ধারণা ছিল যে আক্রমণকারী রুশ সেনাদের সেখানকার অধিবাসীরা মুক্তিদাতা হিসেবে স্বাগত জানাবে? অথবা এটা তাদের মৌলিক ভাবনারই অংশ যে এরা রাশিয়ার জনগণের অংশ নয়। সত্য হচ্ছে, এই যুদ্ধে রাশিয়ার বিনিয়োগ শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করে যে তারা ভাবে ইউক্রেন সত্যি একটা আলাদা স্বাধীন ও সর্বভৌম দেশ, যারা রাশিয়ার বৃত্ত থেকে ক্রমাগত বাইরে চলে যাচ্ছে। যে সোভিয়েত উত্তরাধিকার রাশিয়া আর ইউক্রেনের মধ্যে বন্ধন হয়ে ছিল, তাকে সশরীর ধ্বংস করে দেওয়া শেষ পর্যন্ত এই রাজনৈতিক বাস্তবতাই প্রমাণ করে।

১৩.

এই যুদ্ধের ফল কী হবে, তা দেখার এখনো বাকি আছে। সবচেয়ে খারাপ যে সম্ভাবনা, ন্যাটো পরাশক্তি আর রাশিয়ার মধ্যে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের আশঙ্কা এখনো দেখা দেয়নি। তবে যুদ্ধ যত দিন চলবে, তার ধ্বংসাত্মক ফলাফলের আশঙ্কা ততই বাড়বে। মার্চের শেষ দিকে বাইডেনের পোল্যান্ড সফরে দেওয়া দাম্ভিক বক্তব্য 'পুতিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না' সে ধরনের সম্ভাবনায় আহুতি দিয়েছে। ইতিমধ্যে সাদা চোখেই দৃশ্যমান যে পশ্চিমের অভূতপূর্ব সম্মিলিত অর্থনৈতিক আঘাত খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করছে যে পুতিনের পতনই ছিল মার্কিন নীতির লক্ষ্য।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য ফল হতে পারে, রাশিয়ার সামরিক পরাজয়। সে পরিস্থিতিতে আমেরিকা ও ইউরোপের সম্মিলিত আগ্রাসন ও অস্ত্র প্রেরণ শুধু রাশিয়ার আগ্রাসনকে থামাবেই না, বরং কোনো ধরনের শান্তি চুক্তি ছাড়াই তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে। অবস্থাদৃষ্টে এর সম্ভাবনা কম, রুশ সামরিক বাহিনীর আকার বলে দিচ্ছে রাজনৈতিক চাহিদা থাকলে তারা আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের অনুপস্থিতি হয়তো ইউক্রেনকে সর্বোচ্চ সাময়িক বিরতি দিতে পারে।

তৃতীয় এবং ইউক্রেনের জন্য সবচেয়ে সর্বনাশা আশঙ্কা হচ্ছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য এই সংঘাত চলমান থাকবে, যেখানে বিশাল রুশ বাহিনীর মোকাবিলা

করতে থাকবে আমেরিকা ও ইউরোপীয় শক্তির ক্রমাগত মদদপুষ্ট হতে থাকা ইউক্রেনীয় বাহিনী। এটা ইউক্রেনকে অন্যের হয়ে লড়া স্থায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করবে, আমেরিকা ও তার মিত্রদের থেকে ক্রমাগত সহায়তা আসতে থাকবে, তবে তা কেবল যুদ্ধ মোকাবিলা করতে, প্রতিপক্ষের ধ্বংসাত্মক শক্তিকে প্রশমন করার লক্ষ্যে নয়। পশ্চিমের সরকারগুলোর বর্তমান যৌথ নীতিসমূহ এটাই নির্দেশ করছে এবং ইউক্রেনের মঙ্গলের জন্য তাদের উদ্বেগকে তা পরিহাস বানিয়ে তুলেছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি এমএসএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হিলারি ক্লিনটন বলেন, ১৯৮০-এর দশকের আফগানিস্তান হচ্ছে 'এমন এক মডেল, যা মানুষ এখন খুঁজছে', যদিও এর 'সাদৃশ্যের ওপর ভরসা করা যায় না'। সিরিয়ার উদাহরণও কম ভয়ংকর নয়।

চতুর্থ এক নিরাশাবাদী সম্ভাবনা হচ্ছে, দ্রুত একটা শান্তিচুক্তি সম্পাদন। মধ্য মার্চে ইউক্রেন ও রাশিয়ার প্রতিনিধি সভায় একগুচ্ছ নতুন দাবি তুলে ধরে রাশিয়া : ইউক্রেনের নিরপেক্ষতা, ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব এবং দোনেৎস্ক ও লুহানস্কের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। মার্চের শেষ দিকে ইউক্রেনের কূটনীতিকেরা দশ দফার একটা পরিকল্পনা হস্তান্তর করে, যেখানে রয়েছে নির্বাচন সাপেক্ষে দেশটার পক্ষপাতহীন ও নন-নিউক্লিয়ার হওয়ার পদ্ধতিবিষয়ক প্রস্তাব এবং অন্য কয়েকটি রাষ্ট্র মিলে গঠিত একটি কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে দেশটির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। ক্রিমিয়াবিষয়ক আলোচনা পরবর্তী কোনো একটা দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়ার জন্য তুলে রাখা হয় এবং দনবাস নিয়ে কোনো কথা হয়নি। চূড়ান্ত শান্তি প্রস্তাবের চেহারা যেমনই হোক এবং ওয়াশিংটন ও তার মিত্রদের ভাবভঙ্গি যেটাই হোক, মনে হচ্ছে সেখানে বৃহত্তর সমঝোতার বিষয় হবে ইউক্রেনের ন্যাটো সদস্যপদ প্রত্যাহার। ন্যাটোর সদস্যপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ইউক্রেনকে যত সামান্য নিরাপত্তাই দিয়ে থাকুক, ন্যাটো নিজে আগে এই সংঘাতকে যতটা সম্ভাবনাময় করে থাকুক, ইউক্রেনের জনগণের কাছে একেই শান্তির একটা গ্রহণযোগ্য পূর্বশর্ত মনে হতে পারে। কিন্তু রুশ বাহিনীর আগ্রাসনে কিছুটা দৃশ্যমান বিরতি এবং আমেরিকা ও ইউরোপের অস্ত্র সরবরাহের অব্যাহত ধারা বিবেচনায় বন্দুকের মুখে কোনো চুক্তিতে যেতে ইউক্রেন সরকারের আগ্রহ কমে যেতে পারে। বিশেষ করে যদি পশ্চিমা মিত্রপক্ষ তাদের বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করে যে তাদের দিকে তাক করা রুশ বন্দুক শিগগিরই আত্মসমর্পণে যেতে বাধ্য হবে। এপ্রিলের শুরুর দিকে বুচায় সংঘটিত নৃশংসতার মতো ঘটনা আরও ঘটলে রাশিয়ার সঙ্গে এই শান্তি আলোচনার পথ অনেক কঠিন হয়ে যাবে।

পঞ্চম সম্ভাবনা হচ্ছে, আগের দুটি সম্ভাবনার মাঝামাঝি কিছু, সামরিক শক্তি যদি সেয়ানে সেয়ানে হয়, তাহলে আর শান্তিস্থাপন সম্ভব হবে না, তখন হবে একটা অস্ত্রবিরতি। একদিকে রাশিয়ান সৈন্যরা যথেষ্ট এলাকা দখল করে দেশভাগের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে, অন্যদিকে ন্যাটোর সহায়তায় ইউক্রেন বাহিনী শত মাইল দীর্ঘ যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান নিতে পারে। মার্চের শেষ অবধি দনবাসে সামরিক অবস্থান পুনর্বিবেচনা-সংক্রান্ত রুশ পদক্ষেপ বিশেষ করে সেই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দেয়। এই মুখোমুখি অবস্থান উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে অস্ত্রবিরতি দুর্গের চেয়েও বিশাল আকারের হতে পারে এবং এর ফলে শুধু দুই পক্ষের দুই দেশের মধ্যে নয়, পুরো ইউরোপে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ স্থায়ী সামরিকায়ন ঘটতে পারে।

১৪.

ইতিমধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে ফেলেছে এবং পুরোপুরি বিরান ভূমিতে পরিণত না হলে আসন্ন যেকোনো ভবিষ্যৎই অত্যন্ত কঠিন হতে যাচ্ছে। একটা শান্তি প্রতিষ্ঠার পর অবকাঠামোর ক্ষতি মেরামত এবং বিপুল শরণার্থীকে তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনা সহজ কাজ নয়। সার্বভৌমত্ব পুনঃস্থাপনের জন্য দরকার হবে আরেক অধ্যায়, বাইরের শক্তির চাপ ও নানা বিষয়ে নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠেই তা অর্জন করতে হবে। রাশিয়া তার সেনা প্রত্যাহার করলেই কেবল পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা সম্ভব, সবার আকাঙ্ক্ষা তা খুব শিগগির শুরু হবে। তবে সংঘাত এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে এটা খুব শিগগির শেষ হবে না।

খোদ রাশিয়াতেই এই যুদ্ধ একটা সহিংস নগ্ন শাসনের চেহারা উন্মোচিত করেছে। রাশিয়ার অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উত্থান এতটাই বেড়েছে যে তা অনেকটাই গৃহযুদ্ধের রূপ নিচ্ছে, ডজনখানেক শহরে সহস্রাধিক গ্রেপ্তার (মার্চ মাস পর্যন্ত) হয়েছে। যুদ্ধের প্রতি সমর্থন এখনো অতটা দৃশ্যমান না হলেও রুশ প্রশাসনের ওপর পশ্চিমের সার্বিক চাপ বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর ইউরোপীয় সামরিকায়ন এই সংঘাতে হাওয়া দিতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত ব্যাপক দমন বা বিদ্রোহের বদলে মানুষকে পুতিনের পতাকাতলে জড়ো হওয়াটাকেই উৎসাহিত করতে পারে। এ ধরনের রাজনৈতিক সংঘাতের দিকে না গিয়ে এই প্রশাসন হয়তো ইউক্রেনের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপনের দিকে কিছুটা ঝুঁকতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে যদি রাশিয়ার এই ভয় দেখিয়ে শাস্তিদানের বিধান প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়, তাহলে হয় পুরোপুরি সামরিক স্বৈরতন্ত্র অথবা চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সমন্বয়—এই দুয়ের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হবে।

পরিস্থিতি যেদিকেই যাক, প্রাকৃতিক সম্পদ রপ্তানির ওপর নির্ভরতা এবং বর্তমান অর্থনৈতিক মডেলে ব্যাপক অসমতা—দুটিই খারাপ দিকে যাবে। কারণ, ইতিমধ্যে কমতির দিকে চলমান রাশিয়ার জাতীয় আয়ের মধ্যে সামরিক ব্যয় আরও ভাগ বসাবে।

ইউরোপেও ব্যাপক হারে সামরিকায়ন হবে, ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে জার্মানি ঘোষণা করেছে, তারা সামরিক ব্যয় জিডিপির আরও ২ শতাংশ বাড়াবে। যদি বর্তমান ধারার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শাসন অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে আসন্ন দ্রুত বাড়তে থাকা সামরিক ব্যয় জোগাতে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা জালের সামান্য বরাদ্দে হাত না দিয়ে উপায় থাকবে না। নয়া উদারবাদী নিরাপত্তা রাষ্ট্রগুলো প্রবৃদ্ধি বিক্রি করে মিসাইল আর কাঁটাতার কিনবে। এই পরিস্থিতিকে 'বেলে এপোক' যুগের অস্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা না করে আর উপায় নেই। তখনকার মতো এখনো জনগণের মতামত জাতীয় সরকারের পেছনেই এসে দাঁড়াচ্ছে। ১৯১৪ সালেও বামদের সংসদীয় দলগুলো প্রভাবশালী মতকেই অনুসরণ করে, জাতীয় আইনসভায় যুদ্ধের পক্ষে ভোট দেয় এবং দুই বছর আগে যে রক্তপাত ঠেকানোর প্রতিশ্রুতি তারা করেছিল, সেই রক্তে স্নান করার পথ তৈরি করে। এটা অবশ্যই অন্য শতাব্দী, বামেরাও অনেক দুর্বল অবস্থানে রয়েছে, ঘটনাবলির ওপর তাদের প্রভাবও অনেক কম। কিন্তু সেই একই পদ্ধতিতে, তবে আরও অসহায়ভাবে তারা পরাশক্তিগুলোর সামরিক দাঙ্গায় কোনো ভূমিকা রাখতে না পেরে হারিয়ে যাবে, উপেক্ষিত হবে। এই নতুন আন্তসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে বামেদের শক্তিশালী হওয়ার জন্য প্রয়োজন কিছু পুরোনো হাতিয়ার—আন্তর্জাতিকতাবাদ, শ্রেণিসংহতি এবং ভয় ও আপসহীন বিশ্লেষণী স্বচ্ছতা : ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য, তাদের যুদ্ধ ও তাদের শান্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য।

৬ এপ্রিল ২০২২

*যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত **'নিউ লেফট রিভিউ'**র এপ্রিল-মে সংখ্যায় প্রকাশিত 'ম্যাট্রিক্স অব ওয়ার' প্রবন্ধের ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ।*

● **টনি উড** নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সামাজিক ইতিহাসের অধ্যাপক। *রাশিয়া উইদাউট পুতিন* নামে বইয়ের লেখক।

ইতিহাস

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং বাংলাদেশে ‘দালাল’দের বিচার : একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান

সারকথা

১৯৭২ সালের দালাল আইনে অভিযুক্তদের বিচার ও পরে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা এ প্রতিবেদনের পটভূমি। এ আইন ও বিচারপ্রক্রিয়া সবে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে যেমন আলোড়িত করেছিল, রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছিল, তেমনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোরও দৃষ্টি কেড়েছিল। এ ঘটনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ খুব কমই হয়েছে, আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণও বিরল। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়টা যতটা মনোযোগ পায়, ততটা খতিয়ে দেখা হয় না দালাল বলে অভিযুক্তদের বিচারপ্রক্রিয়া এবং তার পরিণতি। দেশীয় দালালদের বিচার নিয়ে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সঙ্গে আলোচনার নথিপত্র বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এখনো উন্মুক্ত হয়নি। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সরকার তাদের বাছাই করা সরকারি নথিপত্র নিয়মিত উন্মুক্ত করে থাকে বলে বাংলাদেশ বিষয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেখান থেকে পাওয়া গেছে। ১৯৭২ সালের জুলাই এর প্রথম সপ্তাহে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে ঢাকা সফর করেন ডেভিড মার্শাল নামক একজন সিঙ্গাপুরীয় কৌঁসুলি এবং প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। ডেভিড মার্শালের সফরের প্রায় বছরখানেক পর ঢাকায় আসেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তরুণ গবেষক ইভোনা তেরলিঙ্গহান। এঁদের দুজনের প্রতিবেদন থেকে সে সময়ের সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব, প্রশাসন, আইনজীবী ও বিচারিক ব্যবস্থা এবং জনমত দালালদের বিচারকে কীভাবে দেখেছিল, রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কী রকম টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছিল, সেসবের পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পর্যবেক্ষণ ও তৎপরতাও এখানে আলোচিত হয়েছে। অতীতে অনালোচিত প্রতিবেদন দুটির ওপর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারবিষয়ক গবেষক মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের দালাল আইন ও বিচার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের কিংবা বৈশ্বিক বিদ্যাজগতে এ বিষয়ে তেমন তথ্যভিত্তিক কিংবা বিশ্লেষণমূলক আলোচনা লক্ষ করা যায় না। বিশেষ করে, দেশীয় এই বিচার নিয়ে আন্তর্জাতিক সমাজ কী রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, তা রীতিমতো অনালোচিত। এর সম্ভাব্য কারণ, নথিপত্র সুলভ নয়। তা ছাড়া যুদ্ধোত্তর বিচার নিয়ে যতটুকু আলোচনা আন্তর্জাতিক পরিসরে হয়েছে, তা প্রধানত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের সম্ভাব্য বিচারের আয়োজন নিয়েই হয়েছে। দেশীয় দালালদের বিচার নিয়ে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সঙ্গে আলোচনার নথিপত্র বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কখনোই উন্মুক্ত করেনি। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সরকার তাদের বাছাইকৃত সরকারি নথিপত্র নিয়মিত উন্মুক্ত করে থাকে বলে বাংলাদেশ বিষয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা বিভিন্ন সময়ে জানতে পেরেছি। একই সঙ্গে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সক্রিয় নানা আন্তর্জাতিক সংস্থার নিজস্ব আর্কাইভস বা মহাফেজখানাগুলোতে সাংগঠনিক নানা দলিল ও নথিপত্র এখনো পাওয়া যায়। এই লেখায় সে রকম অনালোচিত দুটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, দালালদের বিচারের বাংলাদেশি উদ্যোগ নিয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পর্যবেক্ষণ ও সক্রিয়তার কিছু প্রসঙ্গ তুলে আনা হয়েছে।[১]

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মূলত বিভিন্ন দেশে বিনা বিচারে আটক ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক বন্দীদের বিষয়ে কাজ করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যেহেতু দালাল আইনে কোলাবরেটর বা দালাল হিসেবে পরিচিত বহু মানুষ আটক হয়েছিল এবং বিচারের প্রক্রিয়া ও ব্যাপকতা নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা আশঙ্কা ছিল, তাই দালাল আইন ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিষয়ে সরেজমিন প্রতিবেদন তৈরিতে তারা উদ্যোগী হয়েছিল। সে সময় বাংলাদেশের সঙ্গে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের চমৎকার সম্পর্ক ছিল, বলা যায়। কেননা বছরখানেক আগে, ১৯৭১-এর যুদ্ধকালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাঙালির নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর অন্যতম উপদেষ্টা ড. কামাল হোসেনকে 'বিবেকের বন্দী' (prisoner of conscience) হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে তাঁদের মুক্তির জন্য প্রচারণা চালিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আইনমন্ত্রী হিসেবে ড. কামাল হোসেন এই আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের বাংলাদেশের মিত্র হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন। তা ছাড়া

সদ্য স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তখন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরির ব্যাপারেও সচেষ্ট ছিল।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল মার্টিন এনালস দালাল আইনে অভিযুক্ত পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গভর্নর ডা. মালিকের বিচারের সময় তাঁর প্রধান কৌঁসুলি হিসেবে বাংলাদেশি আইনজীবী আতাউর রহমান খানের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর ভাই ডেভিড এনালস, যিনি একই সঙ্গে ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা ও মানবাধিকারকর্মী ছিলেন, তিনিও বাংলাদেশে বিহারি জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট ছিলেন এবং একই সঙ্গে ডা. মালিকের যথাযথ বিচারে সাহায্যের চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়। বলা বাহুল্য, পাকিস্তান সরকার এবং নানা স্বার্থগোষ্ঠী দালাল আইনে অভিযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পক্ষে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। এ ছাড়া ব্রিটিশ সরকার দালাল আইনের বিচারপ্রক্রিয়া গভীরভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিল এবং ব্রিটিশ আইনজীবীরাও যে এই বিচারে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি হওয়ার জন্য সক্রিয় ছিলেন, তার বিস্তারিত আলাপ এই লেখকের অন্য একটি গবেষণামূলক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে।[২]

১৯৭২ সালের জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে ঢাকা সফর করেন ডেভিড মার্শাল নামক একজন সিঙ্গাপুরীয় কৌঁসুলি এবং প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। ইরাক থেকে সিঙ্গাপুরে আসা এক সনাতনী ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারে ডেভিড মার্শালের জন্ম হয় ১৯০৮ সালে। তিনি পরে ব্রিটেনে আইন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করে পর্যায়ক্রমে সিঙ্গাপুরে ফৌজদারি মামলার জগতে খ্যাতি লাভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে জাপানি সৈন্যদের হাতে বন্দী হন এবং জাপানের হোক্কাইডোতে এক কয়লাখনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হন। ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্ত হন এবং পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনে শামিল হন। স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধবন্দী হওয়ার অভিজ্ঞতা ডেভিড মার্শালকে যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সমাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করেছিল এবং তিনি আজীবন মানবাধিকারের বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন। সিঙ্গাপুরের প্রতাপশালী প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউয়ের কর্তৃত্ববাদী শাসনের কঠোর সমালোচক হিসেবেও তাঁর পরিচিতি ছিল।[৩] যা-ই হোক, ঢাকায় ডেভিড মার্শালের চার দিনের সফরের উদ্দেশ্য ছিল মূলত দালাল হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং যুদ্ধবন্দীদের প্রস্তাবিত বিচারের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবরণী তৈরি করা এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের জন্য যথোচিত সুপারিশ

প্রদান করা। এই সফরে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ছাড়াও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করেন। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিব টি আহমদ, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ফকির সাহাবউদ্দীন আহমদ, হাইকোর্টের একজন বিচারক-বিচারপতি আমিন, বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্য রেডক্রসের শীর্ষ দুই কর্মকর্তা, একটি আইন কলেজের প্রিন্সিপাল, একজন ব্যাংকার, ব্যবসায়ী, সরকারের সমালোচক একটি সাপ্তাহিকের সম্পাদক, একজন ত্রাণ কর্মকর্তা এবং দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তি, যাঁর বিচার চলছিল। তিনি বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এক শুনানিও কিছু সময়ের জন্য প্রত্যক্ষ করেন, যেখানে অভিযুক্ত দালালের বিরুদ্ধে একজন বুদ্ধিজীবীকে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণের অভিযোগ আনা হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি আইন মন্ত্রণালয়ে আন্তর্জাতিক আইনবিষয়ক পরামর্শক হিসেবে নিয়োজিত মোহাম্মদ সোহরাব আলী ও একজন পুনর্বাসন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে মোহাম্মদপুরে অবস্থানরত বিহারিদেরও দেখে এসেছিলেন।

ডেভিড মার্শালের মূল্যায়ন

১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন ও তার পরবর্তী সময়কে মার্শাল যেভাবে চিত্রায়িত করেছিলেন তাঁর প্রতিবেদনে, তা নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জন্মকে তিনি হলোকাস্টের নৃশংসতার সঙ্গে তুলনা করেন এবং ৯ মাসের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যে তখনো বিস্মৃত হয়নি, তার উল্লেখ করেন। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন হলো, বাংলাদেশের মানুষ অসামান্য সংযম ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন নিপীড়কদের সহায়ক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত সংখ্যালঘুদের (বিহারি) বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন কিছু নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটলেও মাত্রা ও চরিত্রগত দিক থেকে সেগুলো বাঙালিদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মোটেও তুলনীয় নয়। বাংলাদেশের মানুষ, তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে সংক্ষিপ্ত বিচার থেকে বিরত থেকেছে এবং দালালির অপরাধে অভিযুক্তদের বিচারের জন্য সরকারের কাছে তুলে দিয়েছে। মূলত 'নিরাপত্তামূলক হেফাজতে' রাখার স্বার্থেই প্রাথমিকভাবে প্রায় ২০ হাজার সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছিল বলে প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন। যে বিষয়টি তাঁর কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছে, তা হলো, পুলিশ বাহিনীর প্রায় ৬৮ দশমিক ২ শতাংশ সদস্য যুদ্ধকালে হত্যাকাণ্ডের[৪] শিকার হলেও যুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র সাত মাসের মাথায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। ঢাকায় অবস্থানকালে চার

দিনের পত্রিকা পড়ে আইনের প্রতি জনমানুষের শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে সরকারি প্রচারণার ব্যাপকতা ও সফলতা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। এই সবকিছুর জন্য তিনি কৃতিত্ব দিতে চান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকেই, যাঁর আইনের শাসনের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয় রয়েছে এবং মানুষ যাঁকে পূজনীয় মনে করেছে।

ডেভিড পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের প্রস্তাবিত বিচার নিয়েও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধবন্দীদের সবাই তখন ভারতীয় ভূখণ্ডে তাদেরই তত্ত্বাবধানে ছিল। আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের দেওয়া তথ্যমতে, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন নিষ্ঠুরতা এবং জেনোসাইড-সংক্রান্ত প্রায় ১ হাজার ৫০০ অভিযোগ এসেছিল এবং এমন অভিযোগ অব্যাহতভাবে আসছিল। ডেভিডের ধারণা হয়েছিল যে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ তদন্তের জন্য একটি সংস্থা কাজ করছিল এবং সরকার তাদের কাছ থেকে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করছিল, যাতে করে কোন অভিযুক্তদের বিচারের আওতায় আনা হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান ছিল যে যেহেতু যুদ্ধবন্দীরা আত্মসমর্পণ করেছিল যৌথ কমান্ডের কাছে, তাই তারা যৌথ তত্ত্বাবধানে রয়েছে বলে ধরে নিতে হবে এবং বাংলাদেশের অধিকার রয়েছে দেশের ভেতরেই তাদের বিচার করার। এই আইনি অবস্থানের প্রতি ভারতের পক্ষ থেকে কোনো ভিন্নমত রয়েছে বলে ডেভিডের কাছে তখন মনে হয়নি। তাঁর কাছে এটাও মনে হয়নি যে বাংলাদেশ প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছুক। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে বলেছিলেন, 'আমরা প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ নই। তাদের অবশ্যই বিচার হতে হবে। এরপর বাকিটা আমরা দেখব।' এসব বিচারের আয়োজনকে ডেভিড মার্শাল অবদমিত আবেগের একটি সাংবিধানিক প্রকাশ হিসেবেই দেখেছিলেন, যার প্রয়োজন ছিল বলেই তিনি মনে করেন। অভিযুক্ত পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য তখনো আইনের খসড়া করা হয়নি এবং এ ব্যাপারে তখনো চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আইনমন্ত্রী তাঁকে জানিয়েছিলেন যে ওই আয়োজনের মূল ভিত্তি হবে 'সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ন্যায়বিচার' নিশ্চিত করা এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল—উভয়েই তাদের পর্যবেক্ষক পাঠাতে পারবে।

ডেভিড তাঁর প্রতিবেদনে দালালদের পরিচয় দিতে গিয়ে বাংলাদেশে বসবাসকারী 'বেসামরিক'[৫] ব্যক্তি বলতে যাদের বুঝিয়েছেন, তাদের বড় অংশই বিহারি নয় বরং বাঙালি এবং তারা বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ ঘটিয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের

বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তানি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। দালাল বা কোলাবরেটরদের বিষয়ে ডেভিড মার্শালের পর্যবেক্ষণ হলো, যেভাবে ফৌজদারি অপরাধ এবং রাজনৈতিক সহযোগিতাকে 'দালাল'-এর ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে, তা বেশ দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর দৃষ্টিতে কিছু বিষয় পুরোপুরি অপরাধ হিসেবেই বিচারযোগ্য, সেটা পাকিস্তান আমলের আইনেও, বাংলাদেশের আইনেও। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানি সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক সহযোগিতার মধ্যে পড়ে এমন সব বিষয় সেই সময়ে (যুদ্ধকালীন) আইনসিদ্ধ হিসেবেই বিবেচিত ছিল বলে তিনি মনে করেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন তখন পর্যন্ত প্রায় ১২ হাজার বন্দী দালাল আইনের অধীনে বিচারের অপেক্ষায় ছিল। তৎকালীন ১৯ জেলার ৭৩টি ট্রাইব্যুনালও এই বিচারকার্যে যুক্ত ছিল। তবে ডেভিডের কাছে প্রাথমিকভাবে ১২ হাজার বন্দীর সংখ্যাটিকে বেশি মনে হয়েছিল এবং তিনি এ ব্যাপারে ড. কামাল হোসেনকে প্রশ্ন করলে চৌকস আইনমন্ত্রী ১৯৭২ সালের *দ্য ইকোনমিস্ট* ম্যাগাজিনের ১৫ এপ্রিলের সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বই পর্যালোচনার প্রবন্ধের ফটোকপি তাঁকে দেখতে দেন। সেই প্রবন্ধটি ছিল ডেভিড লিট্যালজনের লেখা বিখ্যাত বই *প্যাট্রিয়টিক ট্রেইটরস*-এর ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলোতে তাদের জনসংখ্যার তুলনায় যে বিপুল পরিমাণ নাৎসি দালালকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছিল, তার বিপরীতে ৭৫ মিলিয়ন বা সাড়ে ৭ কোটি মানুষের দেশে ১২ হাজার দালাল বন্দীর বিষয়টিকে তুলনামূলকভাবে পরিমিতই বলা চলে বলে ডেভিড তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। আপাতদৃষ্টে মনে হয়, তিনি ড. কামালের যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। বলে রাখা প্রয়োজন যে ডেভিড মার্শাল রাজনৈতিক বন্দী (যে বিষয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মূল আগ্রহ) এবং দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য করেই তাঁর প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। যদিও এ ধরনের পার্থক্যকে ব্রিটিশ ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিসের দক্ষিণ এশীয় বিভাগের কর্মকর্তা আই জে এম সাদারল্যান্ড সমস্যাপূর্ণ মনে করেছিলেন যেহেতু তাঁর ধারণা হয়েছিল যে যদি দালালেরা কেবল পাকিস্তান সরকারকে রাজনৈতিক সহযোগিতার জন্যই আটক হয়েছে এবং তারাও সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।[৬] বলা দরকার, সাদারল্যান্ড তখন পর্যন্ত দালাল আইনের বিষয়ে বিস্তারিত জানতেন না।

১৯৭২ সালের ৫ জুলাই পর্যন্ত ডেভিডের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার আদালতে কেবল ১৩ জনকে দালাল আইনের আওতায় অভিযুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে

একজন বিহারিকে খালাস দেওয়া হয়, পাঁচজনকে দুই মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয় এবং সাতটি মামলা তখনো বিচারাধীন ছিল। অর্থাৎ, ডেভিড তাঁর প্রতিবেদনে দেখাতে চাইছিলেন যে ব্যাপক সংখ্যায় দালালদের বন্দী করা এবং তাদের বিচারের যে আশঙ্কা সে সময়ে নানা পক্ষ থেকে করা হচ্ছিল, তার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক কম। তাই ঢাকায় বিচারের অপেক্ষায় চার হাজার অভিযুক্তের অপেক্ষমাণ থাকার বিষয়টিকে তিনি অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যা হিসেবেই উল্লেখ করেন। এ ছাড়া বহির্বিশ্বে যেমনটা আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে বাংলাদেশ সরকার কেবল বিহারিদেরই দালাল হিসেবে গণহারে গ্রেপ্তার করে বিচার করছে, সেই ভ্রান্ত ধারণাও ডেভিড নাকচ করে দেন এই বলে যে দালাল আইনে গ্রেপ্তারকৃতদের অধিকাংশই মূলত বাঙালি। বিচার শুরু হতে দেরি হওয়ার মুখ্য কারণ হিসেবে যুদ্ধ-পরবর্তী ছয় মাসে পুলিশ বাহিনীর পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তাঁকে জানানো হয়েছিল এবং আইনমন্ত্রী তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে দালাল আইনের মামলাগুলো দুই বছরের মধ্যেই নিষ্পত্তি করা হবে। বিচার শুরু হতে বিলম্ব হওয়ার আরেকটি কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন দালাল আইনে মামলা আদালতে যাওয়ার আগে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দুই পর্বে সাক্ষ্যপ্রমাণ যাচাই-বাছাই করার প্রক্রিয়ার কথা। একজন গণপরিষদ সদস্যের অধীনে থানা পর্যায়ের তথ্য অনুসন্ধান কমিটি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, দুজন গণপরিষদ সদস্য, এক থেকে বারোজন স্বাধীন সদস্য এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত জেলা পর্যায়ের যাচাই কমিটি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রাথমিক পর্যায়ে যাচাই-বাছাই করত। অর্থাৎ, এই পুরো প্রক্রিয়া বিচারকাজ শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্বের অন্যতম কারণ ছিল।

দালাল আইন নিয়ে প্রতিবেদনে ডেভিডের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল। দালালের সংজ্ঞার ব্যাপক পরিধিকে তিনি সে সময়ের আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই দেখেছেন। যদিও আইনটির বিধানে ছিল, সরল বিশ্বাসে আইনসিদ্ধভাবে কোনো অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকলে সেই ব্যক্তিকে যে দালাল হিসেবে গণ্য করা হবে না—সেই অনুগ্রহের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে একই সঙ্গে বেসামরিক নাগরিককে কিংবা মুক্তিবাহিনীর কাউকে হত্যা, তাঁদের সম্পদের ধ্বংসসাধন, ধর্ষণ কিংবা নারীর ওপর ফৌজদারি অপরাধকে ওই বিশেষ বিধানের আওতাবহির্ভূত করে রাখার বিষয়টিকে ডেভিড অন্তত তাত্ত্বিকভাবে, সমস্যাজনক মনে করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন যে অনুগ্রহের ধারাটি আদৌ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে কি না, তা অনেকাংশই নির্ভর করবে জেলার

পাবলিক প্রসিকিউটর এবং যাচাই কমিটিগুলোর বিচক্ষণতার ওপর। অন্য কোনো স্বীকৃত অপরাধ না ঘটালেও কেবল 'দালালি'র অভিযোগ প্রমাণিত হলেই একজন অভিযুক্তকে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ দুই বছরের জেল দেওয়ার শাস্তি নির্ধারণ করা ছিল।[৭] এ ছাড়া সাধারণ আইনের তুলনায় দালাল আইনের প্রভাবে যেসব পরিবর্তন এসেছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন সেগুলো হলো : ক. প্রাথমিক তদন্ত এবং মূল্যায়নকারীর বিলোপ সাধন; খ. দণ্ডবিধির আওতায় ফৌজদারি অপরাধের কারাদণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদ বৃদ্ধি। যদিও খুনের দায়ে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবনে দণ্ডিত করার এখতিয়ার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের ছিল; গ. জামিন দেওয়ার ক্ষমতা বিলোপ; এবং ঘ. সাজাপ্রাপ্ত দালালের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার সরকারি ক্ষমতা। দালাল আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালগুলো যে আদতে সাধারণ ফৌজদারি আদালতের মতোই স্বতন্ত্র বিচার ছিল এবং কোনো গণবিচার ছিল না, সেটি ডেভিড স্পষ্ট করেছিলেন। আর দালাল আইনের অসামান্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে অপরাধ প্রমাণের পদ্ধতি প্রসিকিউশনের ওপর ছেড়ে দেওয়া ছিল। তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো, প্রাথমিক তদন্ত এবং মূল্যায়নকারীর অনুপস্থিতি বাদে দালাল আইনে এই বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচার সব অর্থেই ছিল সাধারণ ফৌজদারি আদালতে পরিচালিত বিচারের মতোই, যা অন্য অনেক কমনওয়েলথভুক্ত দেশে শান্তির সময়ে প্রচলিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করেই পরিচালিত হয়।

দালালদের বিচারের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কাঠামো প্রসঙ্গে ধারণা দিতে গিয়ে ডেভিড উল্লেখ করেন যে এসব আদালত দায়রা বিচারক (সেশন জজ) দ্বারা পরিচালিত। তাঁদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা মূলত ইংলিশ হাইকোর্ট বিচারকদের সমপর্যায়ের। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের যে কয়জন বিচারকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে তিনি উল্লেখ করেন জেলা বিচারক এবং ঢাকার জ্যেষ্ঠ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বিচারক আবদুল হান্নান চৌধুরীর[৮] কথা। হান্নান চৌধুরী তাঁকে জানিয়েছিলেন যে দালাল আইনে আটক সাত হাজার অভিযুক্তকে তিনি জামিনে মুক্তি দিয়েছেন; যদিও দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের জামিন দেওয়ার সুযোগ ছিল না। চৌধুরী তাঁকে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে দালাল আইনভুক্ত অভিযোগের জন্য পুলিশ যদি তাঁকে অভিযুক্তের বিপক্ষে প্রাইমা ফেসি সাক্ষ্যপ্রমাণ না দেখাতে পারে, তাহলে অভিযুক্তের আটককে দালাল আইনের অধীনে প্রাইমা ফেসি আটক হিসেবে বিবেচনা না করে সাধারণ আইনের অধীন জামিনযোগ্য হিসেবে বিবেচনা

করেন। ডেভিড উল্লেখ করেন 'বিপ্লবের' সময় ১৪ হাজার মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্বদানকারী এই বিচারকের সাহসী ভূমিকা তখনো আপিলে চ্যালেঞ্জ হয়নি এবং তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ওই সাত হাজার জামিনে মুক্ত অভিযুক্তদের বিচারের আর প্রত্যাশা নেই। এ বিষয়গুলো ডেভিড ইতিবাচকভাবেই প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

অভিযুক্তদের কৌঁসুলিদের বিষয়ে ডেভিড তাঁর প্রতিবেদনে আলাদাভাবে কিছু তথ্য দিয়েছিলেন। তিনি জানান যে ব্যক্তিগত ঘৃণা, সামাজিক প্রতিকূলতা এবং নিরাপত্তার কারণে মুক্তিযুদ্ধের পর বহু আইনজীবীই দালালদের কৌঁসুলি হওয়ার ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক ছিলেন। তবে বার কাউন্সিল এবং বার অ্যাসোসিয়েশনসের মাধ্যমে দেশের আইনজীবীদের আইনমন্ত্রী এই বার্তা দিয়েছিলেন যে ন্যায্য বিচারের স্বার্থে দালালদের কৌঁসুলি হিসেবে তাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন বলে সরকারও প্রত্যাশা করে। ডেভিড মনে করেন, আইন পেশাজীবীরা সরকারের এই অনুরোধ শুনেছে এবং জনগণও গ্রহণ করেছে। ডেভিড তাঁর প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশে প্রায় চার-পাঁচ হাজার কৌঁসুলি রয়েছেন এবং তিনি হয়তো কেবল তাঁদের ১ শতাংশের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছেন এবং আদালতে কেবল একটি বিচার কার্যক্রমের আংশিক পর্যবেক্ষণ করেছেন, যেটিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির তিনজন কৌঁসুলি ছিলেন। তিনি জোর দিয়েই উল্লেখ করেন যে যতজন কৌঁসুলির সঙ্গে আলাপ করেছেন, তাঁরা সবাই একমত ছিলেন যে দালাল আইনের মামলাগুলোতে অভিযুক্তরা ন্যায়বিচার পাচ্ছেন এবং তাঁদের কৌঁসুলিরাও ভালোভাবেই মক্কেলদের পক্ষে অবস্থান নিতে পারছেন। যে বিষয়টি তাঁকে চমৎকৃত করেছে, তা হলো যখন তাঁকে অ্যাটর্নি জেনারেল জানালেন যে যদি অভিযুক্ত দালাল দরিদ্র হয়, তাহলে সরকারি খরচেই তার জন্য কৌঁসুলি নিয়োগ করার বিধান রয়েছে এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনালে কোনো মামলাই যাবে না অভিযুক্তদের পক্ষে কৌঁসুলির নিয়োগ নিশ্চিত না করা পর্যন্ত। বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল আরেকটি বিষয় ডেভিডকে জানান যে দালাল আইনে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি বিদেশি কৌঁসুলি নিয়োগ দিতে চান, সেটা ইংল্যান্ডের কুইন্স কাউন্সিল থেকেই হোক কিংবা কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো থেকেই হোক, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের আবেদন বিবেচনা করা হবে এবং বাংলাদেশের বারে তাঁদের প্রবেশাধিকারের বিশেষ বিধান করা হবে। এই সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে ডেভিড তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে অভিযুক্তদের আইনি পরামর্শক বিষয়ে দুশ্চিন্তার কোনো অবকাশ নেই। যদিও আমরা এখন

জানি, ডা. মালিকসহ কয়েকজন অভিযুক্তের ক্ষেত্রে পরে বাংলাদেশ কোনো বিদেশি কৌঁসুলিকে আদালতে প্রবেশাধিকার দেয়নি কিংবা কোনো বিশেষ ব্যবস্থা আয়োজনও করা হয়নি।[৯]

ডেভিড তাঁর প্রতিবেদনে যখন জোর দিয়ে উল্লেখ করেন যে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে কেবল রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে কোনো ব্যক্তিকে দালাল আইনের অধীনে গ্রেপ্তার করার কোনো প্রমাণ তিনি পাননি। এ কথা থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ডেভিডের আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। আইনমন্ত্রী তাঁকে যুক্তি দিয়েছিলেন যে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিকর ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও আটকের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া পাকিস্তান আমলের দুটি আইন (ইস্ট পাকিস্তান পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট এবং দ্য সিকিউরিটি অব পাকিস্তান অ্যাক্ট) তখনো বলবৎ থাকলেও ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে একজন ব্যক্তিকেও ওই দুই আইনে গ্রেপ্তার বা আটক রাখা হয়নি। আইনমন্ত্রী আরও জানান, সংসদ অধিবেশন চালু হলে বরং ওই দুটি আইন বাতিল করারও প্রস্তাব করা হবে। রাজনৈতিক বন্দী প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা অ্যামনেস্টির লক্ষ্যকে সম্মান করি। এ বিষয়ে আমরা বিপরীতমুখী অবস্থানে নয় বরং একই পক্ষে রয়েছি। আমরা মুক্ত একটি সমাজ এবং আইনের শাসন চাই।' অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ডেভিডকে জানান, দালাল আইনে আটক যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁদের বিচারের স্থান ও কাল বিষয়ে অ্যামনেস্টির যেকোনো জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন। স্পষ্টতই, ডেভিড মার্শাল বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের এ ধরনের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিতে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্রতিবেদনের শেষে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের জন্য ডেভিড মার্শাল কয়েকটি সুপারিশ রেখেছিলেন। বাংলাদেশ-সম্পর্কিত যেকোনো বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই বিবেচনা করা উচিত বলে তিনি বলে রেখেছিলেন। কেননা এই সমাজের মানুষেরা যুদ্ধকালীন ভয়ংকর আঘাত থেকে কেবল সেরে উঠছে, কাজেই অ্যামনেস্টির উচিত হবে সহানুভূতি, শ্রদ্ধা আর ভদ্রতার সঙ্গেই বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসা। তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের কাছেই সরাসরি আবেদন রাখতে পরামর্শ দেন যেন বিজয়ের প্রথম বর্ষপূর্তির আনন্দ অপেক্ষাকৃত 'কম সৌভাগ্যবান' কিংবা এমনকি 'অনুপযুক্ত' ব্যক্তিদের সঙ্গেও ভাগ করে নেওয়া যায়। নিশ্চিতভাবেই ডেভিডের এই অনুপযুক্ত ব্যক্তিরাই ছিলেন সেসব দালাল, যাদের বাংলাদেশ বিচারের সম্মুখীন করেছিল। বাংলাদেশ

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার জন্য অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে তিনি চারটি পরামর্শ দিয়েছিলেন : ক. বয়স্ক, অসুস্থ, অল্প বয়স্ক এবং গৌণ অপরাধীদের ক্ষমা করা; খ. যাদের কর্মকাণ্ড দণ্ডবিধি বা পেনাল কোডের অধীনে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত নয়, সেসব ব্যক্তিকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ, 'রাজনৈতিক দালালি'র আওতাভুক্তদের ক্ষমা করা; গ. দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা আদালতের কাছে হস্তান্তর করা; কেবল যুদ্ধকালে অর্জিত অবৈধ সম্পদের ক্ষেত্রেই বাজেয়াপ্তের বিধি প্রয়োগ করা এবং দালালদের নিরপরাধ আত্মীয়দের সম্পদ বাজেয়াপ্ত না করা; ঘ. পলাতক দালালদের সম্পদ বাজেয়াপ্তের বিধি সংশোধন করা, যেন উন্মুক্ত আদালতে অভিযুক্তদের অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষে তার প্রয়োগ ঘটে, সেটি অভিযুক্তদের অনুপস্থিতিতে বিচার হলেও এবং শুধু সেটুকু সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া, যা অবৈধ উপায়ে অর্জিত বলে প্রমাণিত এবং যদি সেই অবৈধ সম্পদ পলাতক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে থাকে।

সুনির্দিষ্ট এই চার ধরনের প্রস্তাব ছাড়াও ডেভিড মার্শাল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সব সদস্য ও বন্ধুদের অনুরোধ রাখেন যেন বিহারিদের সাহায্যের জন্য ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্য রেডক্রসকে সমর্থন দেওয়া হয়। মাত্র চার দিনের সফরে ডেভিড আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রীর ব্যাপক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং পুরো প্রতিবেদন পড়লে এমনটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক হবে না যে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ডেভিডের পরিস্থিতি মূল্যায়নে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলেন। ডেভিড মার্শাল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের জন্য তৈরি করা তাঁর এই প্রতিবেদনের এক কপি গোপনীয়তার সঙ্গে সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ হাইকমিশনের কূটনীতিক ডব্লিউ জে ওয়াটসকে পাঠিয়েছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন যে জনপরিসরে যেন এই প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি না দেওয়া হয়। লন্ডনের এফসিও অফিসের সাদারল্যান্ডের কাছে পাঠানো গোপন বার্তায় ওয়াটস আরও উল্লেখ করেছিলেন :

> আপনি এটা জানতেও আগ্রহী হবেন যে মার্শাল আমাকে গোপনীয়তার সঙ্গে জানিয়েছে যে তাঁকে বলা হয়েছে যে ঢাকায় যখন ডা. মালিকের বিচার শুরু হলে তিনি কৌঁসুলি হিসেবে তাঁর পক্ষে লড়বেন কি না। যদি মুজিব তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন যে আদালত কমনওয়েলথের বিচারকদের দ্বারা গঠিত হবে এবং সব সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে, তাহলে মার্শাল এই প্রস্তাবে আগ্রহী আছেন, যদিও তিনি এ-সংক্রান্ত ঝামেলা আর বিপদের বিষয়েও পরিপূর্ণ সজাগ। তিনি আরও বলেছেন, সিঙ্গাপুর সরকারের সম্মতি ছাড়া তিনি এ মামলা নেবেন না আর সে রকমটা ঘটবে বলেও মনে হচ্ছে না।[১০]

বলে রাখা প্রয়োজন যে ডেভিড মার্শাল এমন এক সময়ে বাংলাদেশ সফর করছিলেন, যখন তাঁর পেশাগত ও রাজনৈতিক জীবনে দুর্দিন চলছিল। পেশাগত অসদাচরণের দায়ে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন, যার দায়ে পরে সিঙ্গাপুর বার তাঁকে আইন পেশায় ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং সিঙ্গাপুরের নেতা লি কুয়ান ইউয়ের সঙ্গেও সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি ঘটেছিল। এর ফলে তিনি কিছুদিনের জন্য সিঙ্গাপুরের বাইরে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে চাইছিলেন বলে জানা যায়। ব্রিটিশ কূটনীতিকদের কেউ কেউ তাঁকে সাহায্য করতে চাইছিলেন, তবে তাঁর সঙ্গে অতিরিক্ত যোগাযোগের কারণে সিঙ্গাপুর সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়েও তাঁরা সতর্ক ছিলেন।[১১]

ডেভিড মার্শালের সফর ও প্রতিবেদনের বছরখানেক পর ১৯৭৩ সালের ২৭ মে থেকে ৩০ জুলাই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তরুণ গবেষক ইভোনা তেরলিঙ্গহান দক্ষিণ এশিয়া সফরে আসেন এবং তাঁর কার্যক্রমের ওপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করেন। তাঁর প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল—বাংলাদেশে দালালদের বিচার পরিস্থিতি-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা। আমস্টারডামে জন্মগ্রহণকারী ইভোনা বাংলাদেশে কিছুটা পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন রাষ্ট্রপতি জিয়ার আমলে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ফাঁসির পরিপ্রেক্ষিতে। তখন তিনি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ঢাকা সফর করেছিলেন।[১২] ডেভিড মার্শালের মতো ইভোনা তেরলিঙ্গহানও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনো বাধা ছাড়াই সাক্ষাৎ করতে পেরেছিলেন। প্রতিবেদনে তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্টির সঙ্গে উল্লেখ করেন যে একমাত্র জেলা পর্যায়ের একটা জেলখানায় যাওয়ার অনুমতি না পাওয়া ছাড়া অন্যান্য যেকোনো জায়গায় তিনি ইচ্ছেমতো যেতে পেরেছেন এবং তাঁর পছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরেছেন। এ রকম খোলামেলা আচরণের জন্য সরকারকে তিনি কৃতিত্ব দেন আর অনেকটা ডেভিড মার্শালের মতো ড. কামাল হোসেন ইভোনাকেও বলেন, 'আমরা এ রকমই চাই, আমরা একটা উন্মুক্ত সমাজ চাই, চাই আইনের শাসন, যদিও সব সময় তা ধরে রাখা কঠিন। আমরা অ্যামনেস্টির পক্ষেই আছি।' উল্লেখ্য, ড. কামাল হোসেন তখন আর আইনমন্ত্রী ছিলেন না, নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

ইভোনা তেরলিঙ্গহানের মূল্যায়ন

মনে রাখা প্রয়োজন, ইভোনা যে সময় বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন, তখন দালাল আইনের বিচারপ্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে গভর্নর ডা. মালিকের বিচার সম্পন্ন হয়েছে এবং হাজার হাজার ব্যক্তিকে দালাল আইনে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয়েছিল, যা ডেভিড মার্শালের প্রতিবেদনের সেই ১২ হাজার আটক করা দালালের সংখ্যার চেয়ে প্রায় চার গুণ বেশি ছিল। অবশ্য আটককৃত দালালদের প্রকৃত সংখ্যা জানতে ইভোনাকে বেগ পেতে হয়েছিল, যেহেতু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তার কাছে তিনি একেক রকমের তথ্য পাচ্ছিলেন। এ-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ১৯৭৩ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দালালদের ক্ষমার বিষয়ে একটি ঘোষণা জারি। তা ছিল ওই বছরের নভেম্বরের সাধারণ ক্ষমার তুলনায় কঠোর শর্তযুক্ত। সেই ক্ষমার ফলেও অনেক দালাল ছাড়া পাচ্ছিল বলে জেলখানা থেকেও দালালদের প্রকৃত সংখ্যা জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, কেননা সংশ্লিষ্ট প্রশাসন তেমন সুসংগঠিত ছিল না। ইভোনা উল্লেখ করেন যে মুক্তিযুদ্ধের সময় জেলখানাগুলো মুক্তিবাহিনী আর পাকিস্তান আর্মি তিনবার খুলে দেওয়ায় স্বাধীনতার সময় সেগুলো প্রায় খালি ছিল। এরপর ব্যাপকসংখ্যক ব্যক্তিকে মুক্তিবাহিনী ও পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং অনেকে নিজের নিরাপত্তার জন্য আত্মসমর্পণ করে। যেমন, ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের ধারণক্ষমতা সে সময় মাত্র ১ হাজার ৯৬৬ হলেও ১৯৭২ সালের মার্চে সেখানে বন্দী ছিল ১৩ হাজার। ইভোনা আরও উল্লেখ করেন সেই বন্দীদের বেশির ভাগই ছাড়া পেয়েছিল এবং ১৯৭৩ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহে সেখানে আটক ছিল কেবল ২ হাজার ৮২৪ জন। ডেভিড মার্শালের মতো ইভোনাও তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে এই বিশালসংখ্যক মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পেছনে ছিল ঢাকার সেশন জজ আবদুল হান্নান চৌধুরীর উদার দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি নিজেই ৭ হাজার জনকে জামিনে মুক্তি দিয়েছিলেন; যদিও দালাল আইনে জামিনের সুযোগ ছিল না। বন্দীদের সম্পর্কে ইভোনার পাওয়া তথ্যমতে, প্রাথমিকভাবে আটক ব্যক্তিদের ৩০ শতাংশই সেই সময় ছাড়া পেয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে ইভোনা আরও লেখেন,

> আটককৃত দালালদের নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৯৭২-এর নভেম্বরে জানিয়েছিল যে তাদের সংখ্যা ৪৩ হাজার। স্বরাষ্ট্রসচিব এস আহমেদ আমাকে জানান যে জেলে আটক দালালদের বর্তমান সংখ্যা মাত্র ১০ হাজার ৫০০। যখন আমি বললাম যে এই সংখ্যা গত বছরের মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সংখ্যার তুলনায় বেশ ভিন্ন এবং কোনো ক্ষমা ঘোষণা ছাড়া ২২ হাজার ৫০০ ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার,

> তখন তিনি এই বলে উত্তর দেন যে তাঁর কাছেও এর কোনো ব্যাখ্যা নেই, যেহেতু তিনি কেবল এই বছরের জানুয়ারিতে স্বরাষ্ট্রসচিব হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তিনি আমাকে আরও জানান, তখন পর্যন্ত মোট ৩২ হাজার জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে বিশালসংখ্যক ব্যক্তি বর্তমানে পলাতক।

সাবেক বন্দীদের সঙ্গে কথা বলে এবং কিছু জেলখানার দালালদের সংখ্যার ভিত্তিতে ইভোনা তাঁর প্রতিবেদনে জেলে আটক দালালদের অনুমিত সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ হাজারের মধ্যে হবে বলে উল্লেখ করেন। সরকারি হিসাবের অসংগতির কারণ হিসেবে তিনি অনুমান করেন যে যেহেতু ৫৪ ধারায় অনেক ব্যক্তিকে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আটক করা হয়, তাদের হয়তো দালাল হিসেবে ধরা হয়নি। তবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে ইভোনা দালাল আইনে প্রায় ৪০০ পাকিস্তানিকেও আটক করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন, যাদের মধ্যে ২২ জনের নাম অ্যামনেস্টির কাছে ছিল এবং চট্টগ্রাম থেকে ভবিষ্যতে আরও ৩১১ জনের নাম পাওয়ার কথা ছিল। গ্রেপ্তারকৃত পাকিস্তানিদের সংখ্যার তুলনায় আটককৃত বিহারিদের সংখ্যা বেশি ছিল বলে ইভোনা উল্লেখ করেন। যদিও দালাল হিসেবে বাঙালিদের সংখ্যাই ছিল সর্বোচ্চ। বাংলাদেশে দালাল আইন-সংক্রান্ত কোনো আলোচনায় বা নথিপত্রে পাকিস্তানি নাগরিকদের ওই আইনের আওতায় গ্রেপ্তার করে আটক রাখার তথ্য পাওয়া যায় না। এ হিসাবে ইভোনা প্রদত্ত তথ্য নিশ্চয় চমকপ্রদ ও বিস্ময়করও বটে।

ইভোনা তাঁর প্রতিবেদনে দালাল আইনের সীমাবদ্ধতা এর সংশোধন এবং বিচারপ্রক্রিয়া নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলেন। যেমন দালাল আইনের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করতে গিয়ে ইভোনার পর্যবেক্ষণ এমন যে চাপে পড়ে পাকিস্তানি সরকারের সহযোগী হওয়াদের প্রতি দালাল আইনে যে অনুগ্রহের বিধান ছিল, তা যেন কেবল সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হচ্ছিল, সাধারণ দালালদের ক্ষেত্রে নয়। এ ছাড়া ডেভিড মার্শালের সফরের পর থেকে দালাল আইনে যেসব পরিবর্তন এসেছিল, তার মধ্যে উল্লেখ করেন—সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে কোনো পোস্টমর্টেম সার্টিফিকেট দাখিল বাধ্যতামূলক না থাকা; উপনির্বাচনে কেবল অংশগ্রহণকারী নয়, সেই নির্বাচনে প্রার্থিতার আবেদন করে পরে প্রত্যাহার যারা করেছিল, তাদেরও দালাল আইনের আওতাভুক্ত করা ইত্যাদি। যুদ্ধের পর দেড় বছরেরর মধ্যে মাত্র ১ হাজার ৫০০ জনের দালাল আইনে বিচার হওয়ার বিষয়টি (ঢাকায় মাত্র ২৩৮ জন) ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে চিফ প্রসিকিউটর তাঁকে জানিয়েছিলেন, সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে এবং দালাল

আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এমন দুটি বিচারাধীন মামলার ফলাফলের অপেক্ষায় অনেক দালাল তাঁদের মামলা কার্যক্রমে বিলম্ব করায় খুব অল্পসংখ্যক দালালের বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। এ ছাড়া জেলা পর্যায়ে বেশ কিছু লোক দেড় বছর ধরে কোনো অভিযোগ ছাড়াই আটকাবস্থায় ছিলেন এবং দালাল আইনে গ্রেপ্তার ও আটক রাখার ব্যাপক ক্ষমতা রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে দাবি করা কঠিন হলেও আইনের অপপ্রয়োগের বিষয়টি সরকারি দলের সদস্যরা ছাড়াও স্বয়ং জেলা চিফ প্রসিকিউটর একান্তে ইভোনাকে জানিয়েছিলেন। আর ড. কামাল হোসেন তাঁকে জানিয়েছিলেন, অভিযোগের বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি অবগত এবং এ কারণেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে মিথ্যা অভিযোগ আনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার একটি ধারা যুক্ত করেছিলেন। এমনকি সে রকম ধারায় একজনের শাস্তিও হয়েছিল বলে তিনি ইভোনাকে জানান। তবে রিকনসিলিয়েশন বা মিটমাটের জন্য সরকার যে তখনো প্রস্তুত ছিল না, সেটি ইভোনার কাছে মনে হয়েছিল। কেননা মে মাসের ক্ষমা ঘোষণার পরও দালালদের তালিকা পত্রিকায় প্রকাশ হচ্ছিল (যদিও তাদের অধিকাংশই ছিল পলাতক) আর জুনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয় যে ঢাকা হাইকোর্টের ৩৮ জন কৌঁসুলি এবং ঢাকা জেলার ১৩ জন কৌঁসুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান আর্মির পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিল। এ ছাড়া এপ্রিল মাসে পাকিস্তানপন্থী হিসেবে পরিচিত ১১৯ জন বাঙালির নাগরিকত্ব 'বাতিল' করা হয়েছিল। এসব বিবেচনায় ইভোনার পর্যবেক্ষণ হলো : বিশেষভাবে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা থেকে অভিযুক্ত দালালদের বাদ দেওয়া হচ্ছিল।

বাংলাদেশ সফরকালে ইভোনা ঢাকা ও খুলনায় মোট দুটি বিচার কার্যক্রমের কিছু সময় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং বিশেষভাবে খুলনার এক বিচারকের সঙ্গে আলাপ করে তিনি জানতে পারেন, তখন পর্যন্ত দালাল আইনে সেখানে মোট ২২টি মামলার ক্ষেত্রে মাত্র দুটির রায়ে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ইভোনা লেখেন, অন্তত খুলনার আদালত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে বলে এ বিষয়টি ধারণা দিলেও এটি একই সঙ্গে জেলে থাকা দালালদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সারবত্তা সম্পর্কেও বেশ সন্দেহের সৃষ্টি করে। এ ছাড়া অপর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে যে শাস্তি দেওয়ার ঘটনা ঘটছিল, সেটিও তাঁর মনে হয়েছে। অন্যদিকে ডেভিড মার্শালের মতোই, ইভোনাও বিবাদীদের কৌঁসুলি

থাকার নিশ্চয়তা প্রদানের বিষয়টি বেশ ইতিবাচকভাবেই দেখেছেন। তবে বিদেশি কৌঁসুলিদের বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব ইভোনাকে বলেছিলেন যে তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের উচিত হবে দালালদের কৌঁসুলি হিসেবে বিদেশি পরামর্শকদের নিযুক্তির বিষয়ে অনুমোদন দেওয়া। অন্যদিকে মন্ত্রী তাঁকে জানিয়েছিলেন, বিষয়টি স্থানীয় বার সমিতির সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। আবার ঢাকার বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইভোনাকে জানিয়েছিলেন যে এ ব্যাপারে তাঁদের দিক থেকে সমস্যা হবে না। তবে মন্ত্রণালয় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। স্পষ্টতই, দালালদের বিদেশি কৌঁসুলি নিয়োগের বিষয়টি স্পর্শকাতর ছিল। মামলাভেদে দালালদের কৌঁসুলিদের যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিন্নতা ইভোনা লক্ষ করেছিলেন আর শহরাঞ্চলে দালালদের কৌঁসুলি হওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাবোধের অভাবও যে কমে এসেছিল, তা তাঁকে জানানো হয়েছিল। ঢাকার সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তাঁকে বলেছিলেন,

> গত এক বছরে বিবাদীদের কৌঁসুলি বিষয়ে পরিস্থিতির ভালোই উন্নতি হয়েছে। এটি সরকারের কোনো হস্তক্ষেপের জন্য ঘটেনি (যদিও ড. কামাল হোসেন আমাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে খেয়াল রেখেছেন ডা. মালিক যেন যথাযথভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন); বরং জনমত বেশির ভাগই দালালদের পক্ষে চলে যাওয়ার ফলেই ঘটেছে।

বলা বাহুল্য, ১৯৭২ সালে দালালদের বিচার নিয়ে যতটা উদ্দীপনা ছিল, ১৯৭৩ সালে সেই আগ্রহ ততটাই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। ইভোনা তেরলিঙ্গহানও জনমত পরিবর্তনের আভাস পেয়েছিলেন। প্রতিবেদনের প্রথম দিকেই তিনি লেখেন,

> সম্প্রতি তাঁদের [দালাল] প্রতি জনতার মনোভাবে পরিবর্তন এসেছে। যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের সাধারণ অনুভূতি হলো, যেসব দালালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়নি, তাঁদের অনতিবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া উচিত। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আর ঝুঁকির বিষয়গুলোই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অনুভব করে যে মানবিক কারণে না হলেও অন্তত অর্থনৈতিক বিবেচনায় বিশালসংখ্যক দালালকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বস্তুতপক্ষে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল দালালদের প্রতি যেন বাংলাদেশ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে সে ব্যাপারে সরকারকে উৎসাহিত করা। ১৯৭৩ সালের মে মাসের ক্ষমা কঠোর শর্তাবদ্ধ হলেও তারা সেটিকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে ইভোনা তাঁর প্রতিবেদনে সেই ক্ষমার কিছু সীমাবদ্ধতাও উল্লেখ করেন এই যুক্তিতে যে ক্ষমার আওতায় অনেক বন্দীই

বিবেচিত হবে না। অন্যদিকে ক্ষমার ঘোষণায় একটি বিষয় ছিল যে যাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি, তারা ক্ষমা পাবে। এসব ক্ষেত্রে ক্ষমা বিষয়টিই অপ্রাসঙ্গিক; যেহেতু অভিযোগই নেই বলে ইভোনা ইঙ্গিত দেন। এ ছাড়া তিনি মনে করেন, বেশির ভাগ রাজাকার (যারা কমান্ডার পদমর্যাদার নয়) এবং শান্তি কমিটির সদস্য (যারা কমিটির প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান কিংবা সেক্রেটারি নন) মে মাসের ক্ষমার আওতাভুক্ত হবে। এ বিষয়ে ড. কামাল হোসেন ইভোনাকে জানিয়েছিলেন, বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ দলীয় রাজনৈতিক কারণে তখন পর্যন্ত আরও ব্যাপক আকারে ক্ষমার ঘোষণা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ইভোনা আরও যোগ করেন, পাকিস্তানপন্থী কিছু বিরোধী দলকে দাবিয়ে রাখার উপায় হিসেবে আইনটি উপযোগী বলে হয়তো ভাবতেন কিছু আওয়ামী লীগ নেতা। এ ছাড়া তখন ভাবা হয়েছিল যে যারা পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছিল, উপনির্বাচনে অংশ নিয়েছিল, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিল কিংবা পিস কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করেছিল, তাদের ক্ষমা করা সম্ভব নয়, যেহেতু তারা একটি অপরাধী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে কাজ করেছে। তবে ইভোনা বলেন, সেসব পদ-পদবি যারা গ্রহণ করেছিল, তারাও যে একটি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের চাপের মুখে নানা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে বাধ্য হতে পারে, সেই সম্ভাবনার বিষয়টি দালাল আইনে বিবেচনা করা হয়নি।

ইভোনা তাঁর প্রতিবেদনে মে মাসের ক্ষমার প্রক্রিয়া সম্পর্কেও কিছু ধারণা দেন। দালাল আইনে আটক ব্যক্তিরা (যারা ক্ষমার আওতাভুক্ত) মূলত সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করতেন। সেখানে মুচলেকাস্বরূপ লিখিতভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং সরকারের কাছে ভালো আচরণের প্রতিজ্ঞা করতে হতো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যখন জানানো হলো যে ওই ক্ষমার আওতায় ২০ হাজার ব্যক্তি উপকৃত হবেন, তখন ইভোনা স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে তাঁর দেওয়া আগের ১০ হাজার ৫০০ বন্দীর সংখ্যার তুলনায় মন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যানটি এত বেশি হলো কেমন করে। সচিবের ব্যাখ্যা ছিল এই যে মন্ত্রী আশা করছেন, পলাতক ব্যক্তিরাই মূলত ওই ক্ষমার ঘোষণায় উপকৃত হবে। উল্লেখ্য, দালাল আইনের মামলা, ক্ষমার আওতায় কতজন মুচলেকা দিচ্ছে, কতজন ছাড়া পাচ্ছে, এসব তথ্য ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ব্যবস্থাপনায় প্রথম থেকেই বেশ অসংগতি দেখা যায়। যেমন, ঢাকার সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পলাতক দালালদের কোনো তালিকা ছিল না বলে ইভোনাকে জানানো হয় এবং কতজন পলাতক দালাল

ক্ষমা ঘোষণার পর মুচলেকা দেওয়ার জন্য আত্মসমর্পণ করেছিল, সেই তথ্যও কর্মকর্তাদের কাছে ছিল না। তবে ঢাকার সেই সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট জানান, ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তখন পর্যন্ত ৮৫০ জন মুচলেকার জন্য কাগজপত্র জমা দিয়েছে। এ ছাড়া ইভোনা জানতে পারেন, ক্ষমার সুযোগ নেওয়ার সময়সীমা পার হওয়ার দুই সপ্তাহ পর ঢাকায় ৩৫ জন এবং খুলনায় প্রায় ১০০ জন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল। এই পুরো প্রক্রিয়া সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট (যিনি মূলত একজন প্রশাসক) এবং পাবলিক প্রসিকিউটরের বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ঢাকার সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট ইভোনাকে জানান, যে তাঁর কাছে আসা আবেদনের নিষ্পত্তি করতে প্রায় ছয় মাস লাগতে পারে।

প্রতিবেদনের শেষে ইভোনা পুনরায় উল্লেখ করেন, জনগণের মনোযোগ অতীত থেকে বর্তমানের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার বিষয়গুলোতে সরে গেছে এবং বড় আকারে আটক করে রাখার নীতির পক্ষে কোনো প্রকাশ্য চাপও তিনি লক্ষ করেননি। বরং স্বাধীনভাবে কাজ করছেন, এমন আইনজীবীরা ইভোনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে দালাল আইনে অভিযুক্তদের আটক রাখার বিধির ব্যাপারে তাঁদের নেতিবাচক ধারণাই প্রকাশ করেছিলেন। মে মাসের ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে সরকার যদিও ওই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে বলে ধারণা হচ্ছিল, ইভোনার মতে তাতে পরিস্থিতির খুব একটা মৌলিক পরিবর্তন হবে না। কারণ, ওই ক্ষমার উপকার মূলত তারাই পাবে, যাদের বিরুদ্ধে তখন পর্যন্ত কোনো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়নি। সরকার তখনো মনে করছিল, সাধারণ ক্ষমার মতো বড় পদক্ষেপ নিলে তা জনগণের মনে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে এবং বিরোধী দলগুলোও হয়তো বিষয়টি সরকারবিরোধিতার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। অবশ্য ইভোনা বিরোধী দলের যেসব নেতার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন, তাঁরা সাধারণ ক্ষমার পক্ষেই ছিলেন বলে তাঁর মনে হয়েছিল। ইভোনা তাঁর প্রতিবেদনে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের জন্য সুপারিশ দেওয়ার সময় লেখেন যে খুব সতর্কতার সঙ্গেই এই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত বলে সরকারের কাছে মনে হয়েছিল। কেননা বাইরে খুব বেশি প্রচারণা চালালে হিতে বিপরীত হতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই মূল ব্যক্তি এবং বিষয়টি প্রতীয়মান যে বেশ কয়েকজন সুপরিচিত ব্যক্তির মুক্তির পেছনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। কাজেই তাঁর কাছেই সুপারিশ পেশ করতে

হবে এবং তিনি ইতিবাচক সাড়া না দিলে তবেই কেবল সতর্ক প্রচারণা করা যেতে পারে বলে ইভোনা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। ইভোনার সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল অবিলম্বে দালাল আইনে আর কোনো গ্রেপ্তার না করা, দালাল আইনের অধীনে মামলার দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং আইনটির মেয়াদ কবে শেষ হবে, সেটিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া; অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের অবিলম্বে ক্ষমা করা; ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত নয়, এমন সব দালালকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় আনা ইত্যাদি।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, ডেভিড মার্শাল দালাল আইনে বিচারের পরিস্থিতি নিয়ে সামগ্রিকভাবে যে রকম ইতিবাচক প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন, তার তুলনায় ইভোনা তেরলিঙ্গহানের প্রতিবেদনে পরিস্থিতির জটিলতা ধরা পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ১৯৭২-এর জুলাই মাসের তুলনায় ১৯৭৩-এর জুনে এসে ওই বিচার আয়োজনের প্রভাব ও ব্যাপ্তি আরও পরিষ্কার হচ্ছিল। তবে প্রথম থেকেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের লক্ষ্য ছিল বিজয়ের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দালালদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় সরকারকে উৎসাহিত করা। যেহেতু ১৯৭২ সালে সেটি ঘটেনি আর ১৯৭৩-এর মে মাসের সীমিত পর্যায়ের ক্ষমার ঘোষণায় তারা তেমন সন্তুষ্ট ছিল না, তাই ১৯৭৩ সালেও তাদের লক্ষ্য ছিল বিজয়ের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে, অর্থাৎ ১৯৭৩-এর ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যেই যেন বাংলাদেশ সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেয়। ইভোনা তেরলিঙ্গহানের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ওই বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর সংস্থাটি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি তাদের সুপারিশ পেশ করেছিল। বলা বাহুল্য, অ্যামনেস্টির বহুল প্রতীক্ষিত সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা আসে নভেম্বরের ৩০ তারিখেই, যার ফলে আনুমানিক ৩০ হাজার বন্দীই মুক্তি পাবে বলে তারা জানতে পেরেছিল। উল্লেখ্য, ওই ঘোষণা অনুযায়ী লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যার মতো ফৌজদারি অপরাধের জন্য সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য ছিল না। ডিসেম্বরের ৪ তারিখে ইভোনা তাঁর সহকর্মীদের লেখেন,

> গতকাল আমরা অত্যন্ত আনন্দদায়ক সংবাদ পেয়েছি যে দালালদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। এই অপ্রত্যাশিত ক্ষমা, যার ব্যাপ্তি ব্যাপকই। যেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি এর আওতায় সম্ভবত সব মামলাই অন্তর্ভুক্ত। মিশন রিপোর্টে উল্লিখিত অ্যামনেস্টির সুপারিশগুলো এই ঘোষণায় বাস্তবায়িত হয়েছে এবং শক্ত ইঙ্গিত রয়েছে যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক চাপের ফলেই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।[১৩]

উপসংহার

সবশেষে বলা যায়, সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা কতটুকু বিদেশি চাপের কারণে ঘটেছে আর কতটুকু সরকারের নিজস্ব পর্যায়ক্রমিক ক্ষমার পরিকল্পনার ফলাফল হিসেবে এসেছিল, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। সমসাময়িক বাংলাদেশে একদিকে যেমন ক্ষমার সিদ্ধান্তকে একান্তভাবে তৎকালীন সরকারপ্রধানের মহানুভবতার প্রমাণ হিসেবে দাবি করা হয়, অন্যদিকে ক্ষমা ঘোষণা করার জন্য যেসব বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতা (যেমন মওলানা ভাসানী) সরকারের কাছে সে সময়ে দাবি জানিয়েছিলেন তাঁদের ব্যাপক সমালোচনাও ইদানীং চোখে পড়ে। সত্যিকার অর্থে এ ধরনের সরলীকৃত দলীয় আলোচনা-সমালোচনা তৎকালীন পরিস্থিতির জটিলতা খুব সামান্যই উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে একটা বিষয় স্পষ্ট হলো যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ এই বিচার নিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিল এবং একাধিকবার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে তারা উৎসাহিত করেছিল। একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার এ রকম সক্রিয়তায় নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই একধরনের কূটনৈতিক চাপ অনুভব করেছিল। কিন্তু যা লক্ষণীয় তা হলো, সে সময় বাংলাদেশ সরকার বিদেশি সংস্থার এসব আলোচনা-সমালোচনায় আক্রান্ত বোধ করেনি কিংবা তাদের শত্রুজ্ঞান করেনি। উল্লেখ্য, সাধারণ ক্ষমার পরে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার বিষয়েও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্বদেশে দালালদের যথাযথ বিচার নিয়ে যাঁরা আন্তরিকভাবেই সক্রিয় ছিলেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে হতাশ হলেও, সাধারণ ক্ষমার ঘোষণায় রাজনৈতিকভাবে তৎকালীন সরকার যেমন সব পক্ষ থেকে অভিনন্দিত হয়েছিল, কূটনৈতিকভাবেও তারা এই উদার সিদ্ধান্তের কারণে সমাদৃত হয়েছিল। তবে এতে দালাল আইন, বিচার, ক্ষমার বিষয়গুলো নিয়ে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে তর্কবিতর্কের যে অবসান ঘটেনি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

● **মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান** পিএইচডি গবেষক, স্ট্রসলার সেন্টার ফর হলোকাস্ট অ্যান্ড জেনোসাইড স্টাডিজ, ক্লার্ক ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ।

পাদটীকা

১. এই প্রতিবেদনে মূলত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালের দুটি সরেজমিন প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে লেখা হয়েছে। প্রথম প্রতিবেদনটি ছিল

ডেভিড মার্শালের, (জুলাই ১৯৭২) যার শিরোনাম হলো, Report to Amnesty International on Conditions of Trails of Collaborators, Proposed Trials of Prisoners of War and on Biharis in Bangladesh এবং দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি (আগস্ট, ১৯৭৩) ছিল ইভোনা তেরলিঙ্গহানের, Report of the Mission to South Asia, Including Pakistan, Bangladesh, India and Nepal from 27th May to 30th July 1973. এই লেখায় সচেতনভাবেই ওই দুই প্রতিবেদনে আলোচনার বিবরণ কিছুটা বিস্তারিতভাবেই দেওয়া হয়েছে যেহেতু কোনো গবেষণায় এখন পর্যন্ত প্রতিবেদনগুলো তেমনভাবে ব্যবহৃত হয়নি। প্রতিবেদন দুটি সংরক্ষিত রয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আর্কাইভে। এ ছাড়া ব্রিটিশ ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস রেকর্ডসেও ডেভিড মার্শালের প্রতিবেদনটি সংরক্ষিত রয়েছে। ইভোনা তেরলিঙ্গহানের প্রতিবেদনটি জোগাড় করা হয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক গবেষক সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়ার সহায়তায়। এ ছাড়া নিউজিল্যান্ডের গবেষক স্যামুয়েল জ্যাফও কিছু দলিল দিয়েছিলেন, যা এই প্রতিবেদন তৈরিতে কাজে এসেছে। ওই দুটি প্রতিবেদনেই বাংলাদেশ বিষয়ে প্রধান বিষয়বস্তু ছিল দালালদের বিচারপ্রক্রিয়া। তাই অন্য বিষয়গুলো (বিহারি জনগোষ্ঠী, যুদ্ধবন্দী, ইত্যাদি) বর্তমান আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে।

২. দেখুন, রহমান, মোহাম্মদ সাজ্জাদুর (২০২১) *ব্রিটিশ নথিপত্রে দালাল আইন এবং গভর্নর মালিকের বিচার : একটি প্রতিবেদন*। সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ পেপার ৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Vanessa Ng. (2019) 'David Marshall Fought in WWII, Became a POW and Still Became Chief Minister.' Available from, https ://thekopi.co/2019/12/04/david-marshall/ [Accessed on 12 May, 2022].

৪. এই সংখ্যার সূত্র তিনি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেননি।

৫. যদি আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কথাও বিবেচনা করা হয়, তাহলে দালালদের কেবল বেসামরিক নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়।

৬. এফএসবি ১৪/১, ১ ডিসেম্বর ১৯৭২। সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ কূটনীতিক ডব্লিউ জে ওয়াটসের কাছে লন্ডন থেকে এফসিও দক্ষিণ এশীয় বিভাগের আই জে এম সাদারল্যান্ডের গোপন চিঠি। FCO 37/1057। ন্যাশনাল আর্কাইভস, কিউ, রিচমন্ড। ইউকে।

৭. উল্লেখ্য, দালাল আইনে একাধিকবার সংশোধনী আনা হয়েছিল এবং শাস্তির মেয়াদের ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন এসেছিল।

৮. ডেভিড মার্শালের প্রতিবেদনে নামটি ভুল টাইপ করা হয়েছিল। তিনি আবদুল হান্নান চৌধুরীর বদলে আবদুল হোসেন চৌধুরীর নাম লিখেছিলেন।

৯. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন, রহমান, মোহাম্মদ সাজ্জাদুর (২০২১) *ব্রিটিশ*

নথিপত্রে দালাল আইন এবং গভর্নর মালিকের বিচার : একটি প্রতিবেদন। সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ পেপার ৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১০. উল্লেখ করা প্রয়োজন, ওয়াটসের বিবরণে তথ্যবিভ্রাটের সম্ভাবনা রয়েছে কারণ, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দালাল আইনে ট্রাইব্যুনালের বিচারকেরা কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন, এ রকম প্রতিজ্ঞা করার তথ্য অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, এর কোনো কারণও নেই। কেননা দালাল আইনেই স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে, কারা বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। অনুমান করা যায়, পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের সম্ভাব্য বিচারের আন্তর্জাতিক আয়োজনের যে আলাপ চলমান ছিল সে সময়ে তার সঙ্গে দালাল আইনের ফলে গঠিত অভ্যন্তরীণ বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিষয়টিকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই বিভ্রান্তি বেশ কিছুদিন কূটনৈতিক মহলে যে ছিল, তা এই প্রবন্ধের লেখক অন্যান্য ব্রিটিশ দলিলেও লক্ষ করেছেন।

১১. আইনি পরামর্শক রুশফর্ডের নিকট এফসিও সাউথ ওয়েস্ট প্যাসিফিক ডিপার্টমেন্টের জে কে হিকম্যানের গোপন চিঠি, ৩১ অক্টোবর ১৯৭২।

১২. Lifschultz///, L. (2011) Abu Taher and the Supreme Court of Bangladesh, Part 3. *The Daily Star*. 31 July. Available from, https ://www.thedailystar.net/news-detail-196443. [Accessed on June 15, 2022].

১৩. Yvonne Terlingen, Circular to Groups with Bangladesh Prisoners, Research Department, AI. 4 December 1973.

খাতি সাহিত্য চিন্তা

স্বপ্নকথা, রাইনের সোনা ও রক্তকরবীর যক্ষপুরী : ধনতন্ত্র ও তিন জাদুর জগৎ

এস আমিনুল ইসলাম

সারকথা

রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী নাটক *রক্তকরবী*তে যে চেতনা, তা কি আধুনিক, পাশ্চাত্যমনা, নাকি এই নাটকে ধনতান্ত্রিক পশ্চিমা বিশ্বের লোভ ও আত্মহীন জগতের বাইরে উত্তরাধুনিক অন্য কোনো দিশা খোঁজা হয়েছে? জার্মান নাট্যকার স্ট্রিন্ডবার্গের *আ ড্রিম প্লে* এবং জার্মান গীতগুরু ভাগনারের *দ্য রিং অপেরার* সমান্তরালে রেখে *রক্তকরবী*কে বিচার করেছেন সমাজবিজ্ঞানী এস আমিনুল ইসলাম। তাঁর নজরে *স্বপ্নাটক*-এর চেয়ে অনেক বেশি উত্তর-আধুনিক *রক্তকরবী*। আধুনিক সময়ের মানবতার সংকটের উন্মোচন ঘটায় *রক্তকরবী*। *রক্তকরবী*র ভেতরের দর্শন এবং এর গ্রামীণ পুরাকল্প খুলে দেখানো হয়েছে এই প্রবন্ধে।

I've put in so many enigmas and puzzles that it will keep professors busy for centuries arguing over what I meant and that's the only way of insuring one's immortality.—James Joyce, *Ulysses*

ভয় হচ্ছে, পালা সাঙ্গ হলে ভিখ মিলবে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।

—**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**, *রক্তকরবী* প্রসঙ্গে

ভূমিকা

রক্তকরবী বাংলা ভাষার মহত্তম নাটক। এই নাটক নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্ক প্রায় অন্তহীন। নাটকটির ওপর নতুনভাবে আলোকসম্পাত করা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য *রক্তকরবী* নাটক নিয়ে দুজন মার্ক্সবাদী রবীন্দ্র

সমালোচক যে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটির ওপর নতুনভাবে দৃষ্টিপাত করা। এর জন্য আমি বেছে নিয়েছি স্ট্রিন্ডবার্গের *স্বপ্ননাটক* ও ভাগনারের *দ্য রিং অব দ্য নিবেলুঙ*-এর মতো *অপেরা* এবং তুলে ধরেছি তাদের সঙ্গে *রক্তকরবী*র তুলনামূলক আলোচনা। আমার বক্তব্য হচ্ছে, পৃথিবীর তিন মহত্তম শিল্পীর তিন হিরণ্ময় শিল্পকর্ম দেখিয়েছে—ধনতন্ত্রের বীভৎস পাতাল এবং তা করতে গিয়ে তাঁরা অন্তর্লগ্ন করে ফেলেন মিথ ও সমকালীন বাস্তবতা, মূর্ত করে তোলেন মানব-অস্তিত্বের আনন্তিক দ্বন্দ্বকে। এই তিনটি শিল্পকর্মে শেক্সপিয়ারের নাটকের মতো সুপ্ত হয়ে আছে অধুনাবাদী ও উত্তর-অধুনাবাদী শিল্পরীতির ছাপ।

এই আলোচনায় প্রবেশ করার আগে দুটি শব্দের ব্যবহার স্পষ্ট করে নিতে চাই। আধুনিকতা শব্দটি আধুনিক কালের সঙ্গে যুক্ত, যার সূচনা ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে সমাজের এই রূপান্তরকে চিহ্নিত করা হয় আধুনিকতা হিসেবে। এই অর্থে আধুনিক সাহিত্যের বয়স সুদীর্ঘ। সাহিত্য আন্দোলন হিসেবে আধুনিকতার শুরু ১৮৫০ সালের পরে। সাহিত্য ও শিল্পের নতুন রূপকে চিহ্নিত করতে ইংরেজিতে ইদানীং ব্যবহার করা হয় 'মডার্নিজম' বা বাংলায় তাকে আমরা বলতে পারি 'অধুনাবাদ'[১]। যেহেতু আধুনিকতা একটি বহুমুখী অর্থযুক্ত শব্দ, তাই স্পষ্টতার প্রয়োজনে এই বিভাজনটি জরুরি।

রক্তকরবী নিয়ে বিতর্ক

প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস[২] ও হিতেন্দ্রনাথ মিত্র[৩] মনে করেন, *রক্তকরবী*র উৎস স্ট্রিন্ডবার্গের *স্বপ্ননাটক*[৪]। প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাসের মতে, ১৯০৮ সালে *শারদোৎসব* লেখার আগেই রবীন্দ্রনাথ *স্বপ্ননাটক* পড়েছিলেন। এ সময় থেকে *ফাল্গুনী* পর্যন্ত তাঁর সব নাটকের ওপর স্ট্রিন্ডবার্গের তিনটি নাটকের প্রবল প্রভাব পড়েছে। নাটক তিনটি হচ্ছে *The Road to Damascus*, *A Dream Play* এবং *The Ghost Sonata*। ঋণশোধ, ঋণমুক্তি বা আধ্যাত্মিক মুক্তি হচ্ছে এ নাটকগুলোর মূলভাব। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও লক্ষ করা যায় একই ধুয়া।

'শুধু স্ট্রিন্ডবার্গের একটি নাটক *A Dream Play* থেকে নেওয়া এই তথ্যগুলো থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপক নাটকগুলো লেখার আগে বা লেখার সময় বেশ যত্ন করেই স্ট্রিন্ডবার্গ পড়েছিলেন।' *রক্তকরবী*র প্রথম নাম ছিল যক্ষপুরী এবং পরে নন্দিনী। রবীন্দ্রনাথ নাটকটির নন্দিনী নাম পরিবর্তন করে কেন *রক্তকরবী* রেখেছিলেন, সে সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেনকে মৃত্যুর আগে যা বলেছিলেন, তা

হচ্ছে ঘরের কাছে লোহালক্কড়ের আবর্জনায় চাপা পড়া করবীগাছের ফুটন্ত রক্তাভ শাখার দৃশ্য তাঁকে নাটকটির নতুন নামকরণে প্রণোদিত করেছিল। কিন্তু *রক্তকরবীর* উল্লেখ যক্ষপুরী বা নন্দিনী নাটকের খসড়াতেও রয়েছে। ফলে ক্ষিতিমোহন সেন অথবা রবীন্দ্রনাথ কেউ মিথ্যা বলছেন।

স্ট্রিন্ডবার্গের *A Dream Play* এবং *The Ghost Sonata*—দুটি নাটকের মূল প্রতীক দুর্গ এবং ফুল। প্রথম নাটকে পর্দা ওঠার পর দেখা যায় দুর্গের ওপর স্ফুটনোন্মুখ চন্দ্রমল্লিকা ফুল, যা নাটকের শেষে সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে চিরন্তন নারীর প্রতীক হিসেবে। দ্বিতীয় নাটকে ফুলকে ব্যবহার করা হয়েছে সৃষ্টির প্রতীক হিসেবে। ফুলটির মূল মাটির পৃথিবী, ডাঁটি পৃথিবীর অক্ষপথ এবং ফুলগুলো নক্ষত্রমালার প্রতীক।

স্বপ্ননাটক-এ প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় ইন্দ্রের কন্যা চন্দ্রমল্লিকা ফুল নিয়ে কাচমিস্ত্রির সঙ্গে আলাপ করছে। কাচমিস্ত্রি জানায়, They don't like the dirt, so they shoot up as fast as they can into high to bloom and to die. *রক্তকরবী* নাটকও শুরু হয়েছে কিশোরের সঙ্গে নন্দিনীর ফুল নিয়ে সংলাপের মাধ্যমে। 'কিশোরও জঞ্জালের মধ্যে ফুল খুঁজে পেয়েছে' (পৃ ২৪)। *স্বপ্ননাটক*-এ ইন্দ্রকন্যা দুর্গে বন্দী রাজকর্মচারী সম্পর্কে বলে : I believe there is a prisoner inside waiting for me to set him free। নন্দিনীও যক্ষপুরীর দুর্গে বন্দী রাজা সম্পর্কে বলছে : 'ইচ্ছা করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।'

রক্তকরবীর মতো স্ট্রিন্ডবার্গের নাটকে প্রথমে থেকেই রাজকর্মচারী আকৃষ্ট হয়েছে ইন্দ্রকন্যার প্রতি।

Daughter : 'What do you see in me?'

Officer : 'The beautiful, which is the harmony of the universe. There are lines in your form which I have only found in the movement of the stars, in the melody of strings, in the vibrations of light…'

রক্তকরবীর রাজা বলে : 'বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে, সেই ছন্দ… সেই ছন্দে গ্রহ-নক্ষত্রের দল…আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর।' এ দুটি সংলাপের মিলের দিকে নজর কেড়েছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ[৫]।

নন্দিনীকে বিশু ডাকে 'দুখজাগানিয়া' বলে। স্ট্রিন্ডবার্গের নায়িকা ইন্দ্রকন্যা Agnes আত্মাহুতি দেয় অগ্নিশিখায়। নন্দিনী প্রাণ হারায় সর্দারের হাতে। রবীন্দ্রনাথ নামের সংকেতও ব্যবহার করেছেন। নন্দিনী বলে : 'বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র

তার বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র হয়ে এসেছি।' দুটি নাটক শেষ হয় ফুলের প্রসঙ্গ দিয়ে।

দুটি নাটকে চরিত্রের মধ্যেও বেশ মিল। রয়েছে খনির প্রসঙ্গও। দুটি নাটকেই খনি নরকের প্রতীক। নাট্যদৃশ্যের ক্ষেত্রেও উচ্চারিত একই রকম সাদৃশ্য। *রক্তকরবী* নাটকে সব ঘটনার দৃশ্যপট দুর্গের জানালার বাইরের বারান্দা। *স্বপ্ননাটক*-এ প্রথম দৃশ্য ঘটে দুর্গের সামনে। এরপর একটিমাত্র দরজা রূপান্তরিত হতে থাকে। স্ট্রিন্ডবার্গ তাঁর নাটকে ঋতুমণ্ডলের আবর্তনকে ব্যবহার করেছেন। শঙ্খ ঘোষও দেখিয়েছেন, *রক্তকরবীর* মধ্যে রয়েছে ঋতুমণ্ডলের গূঢ় ব্যবহার।

প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস মনে করেন, *রক্তকরবীর* মধ্যে যে কৃষিসভ্যতার জয়গান ও প্রকৃতিবাদ উচ্চারিত, তা শুধু প্রগতিবিরোধী নয়, ফ্যাসিবাদের কাছাকাছি।

রক্তকরবীর ভাবনায় উচ্চকিত রবীন্দ্রনাথের শ্রেণিগত অবস্থান—'গরহাজির জমিদার'। তিনি সমকালের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে থেকেছেন। শান্তিনিকেতনে সংবর্ধনা জানিয়েছেন বড় লাটকে। *রক্তকরবী* লেখার কিছু আগে শ্রীনিকেতনে শুরু হয় এক মার্কিন নারীর আর্থিক অনুদানের সাহায্যে গ্রামোন্নয়নের কাজ। দেশীয় রাজদরবারে এবং বণিক-শিল্পপতিদের কাছে ঘুরে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেন প্রচুর অর্থ।

হিতেন্দ্র মিত্রও নাটকটি সম্পর্কে একই বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কিছুটা অবিশ্বাস্য এবং অনেকখানি বিস্ময়কর যে দুজন রবীন্দ্র সমালোচক রূপক বা 'সাংকেতিক' নাটক *রক্তকরবীর* মধ্যে বাস্তবতার অনুষঙ্গ খুঁজছেন। দুজন সমালোচকের বক্তব্যকে যথার্থভাবে বিশ্লেষণের জন্য আমি জ্যাক স্টিলিঙ্গার-এর[৬] এবং উত্তর-অধুনাবাদী তাত্ত্বিক আঙ্গিক ব্যবহার করতে চাই। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য সমালোচনায় লেখক মৃত। কিন্তু উত্তর-অধুনাবাদী তাত্ত্বিক জ্যাক স্টিলিঙ্গার জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছেন যে লেখককে ছাড়া রচনাকে (text) বোঝা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য যে পরিমার্জনা প্রয়োজন, তা হচ্ছে নির্জন প্রতিভার ধারণা বর্জন। কোনো লেখকই একা লেখেন না। যেকোনো রচনার পেছনে থাকেন একাধিক লেখক। পশ্চিমি সাহিত্যের ধ্রুপদি ধারা থেকে কয়েকটি উদাহরণ তিনি বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন এবং অন্যান্য অনেক উদাহরণ পরিশিষ্টে সংযোজিত করেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন কিটসের 'Sonnet to sleep'-এর তিন থেকে পাঁচজন রচয়িতা। জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর স্ত্রী হ্যারিয়েট মিলের। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ পরস্পরকে সাহায্য করেছেন।

কোলরিজ স্বীকার না করেই অন্যের লেখা প্রচুর ব্যবহার করেছেন। তাঁর *The Wasteland*-এর ৩৫০ থেকে ৪০০ পঙ্‌ক্তি বা পাণ্ডুলিপির প্রায় অর্ধেকটাই বদল বা বাতিল করেছিলেন এজরা পাউন্ড। জনপ্রিয় বা সৃষ্টিশীল রচনায় প্রকাশনা সংস্থার সম্পাদকসহ অন্যদের ভূমিকাও রচনাকে নানাভাবে পরিবর্তন করে। শেক্‌সপিয়ার অন্যের লেখা শব্দবন্ধ অনায়াসে ব্যবহার করেছেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, *স্বপ্ননাটক*-এ একটি দৃশ্য রয়েছে, যেখানে তরুণ রাজকর্মচারী অপেরা হাউসের সামনে তার প্রেয়সীর জন্য অপেক্ষা করছে। হাতে উজ্জ্বল তাজা গোলাপ। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে যায়; প্রতিবার সে ফিরে যায়। লোকটি বৃদ্ধ হয়, গোলাপের শুধু শুকনো ডাল থাকে। তবু সে দয়িতার জন্য আশা করে। দৃশ্যটি কি বেকেটের *Waiting for Godot* নাটকের পূর্বাভাস তৈরি করে দেয় না!

টি এস এলিয়ট[৭] The Ghost Sonata-এর Hyacinth-কে তাঁর *The Waste Land* গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'The Burial of the Dead'-এ ব্যবহার করেছেন। এলিয়টের কবিতায় ফুলটি হচ্ছে বসন্তের উর্বরতার প্রতীক। কিন্তু *The Ghost Sonata*-এর মধ্যে তা সুন্দর অথচ শ্বাসরোধী। (Styan, 1983)

বিষয়টি মনে রাখলে *রক্তকরবীর* আরও পরিশীলিত পাঠ সম্ভব হবে। বিষয়টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সচেতন ছিলেন[৮]।

'Browning পড়তে পড়তে "The Englishman in Italy" কবিতায় দেখলুম... আমার কবিতায় পর্বত সম্বন্ধে দুটো লাইন আছে তার সঙ্গে এর অনেকটা মিলছে—'। তিনি খুব স্পষ্ট করে বলছেন, 'হোমার, ভার্জিল, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবির কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রও কথাসাহিত্যের রূপের "আদর্শ" পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন—এক দিক থেকে এটা অনুকরণ, আরেক দিক থেকে এটা আত্তীকরণ। অনুকরণ করবার অধিকার আছে কার। যার আছে সৃষ্টি করবার শক্তি। আদান-প্রদানের বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের জগতে চলেছে।'

'বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে, সে তো বিদেশি নয়, সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েছে এই যে, যে বাংলা ভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না, এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করছে ও গৌরব করছে।'

তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস ও হিতেন্দ্রনাথ মিত্র সঠিক। বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্য আমরা মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ফ্রেডরিক

জেমসনের[৯] বক্তব্য তুলে ধরতে পারি।

"We are left with that pure and random play of signifiers that we call postmodernism, which no longer produces monumental works of the modernist type but ceaselessly reshuffles the fragments of the preexistent texts, the building blocks of older social and cultural production, in some new and heightened bricolage : metabooks which cannibalize other books, metatexts which collate bits of other texts—such is the logic of post modernism in general…."

স্ট্রিন্ডবার্গের জগৎ

রবীন্দ্রনাথ সত্যিই *A Dream Play* নাটকটি পড়েছিলেন কি না, তা এখন হয়তো আর জানা সম্ভব নয়। তবে দেখা যেতে পারে স্ট্রিন্ডবার্গের নাটকটির ভিন্নতর পাঠ সম্ভব কি না। স্ট্রিন্ডবার্গ একদা বলেছিলেন তাঁর জীবন নাটকের মতো। এই ভিন্নতর পাঠ প্রয়োজন তাঁর জীবন এবং নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯০২ সাল তিনটি গ্রন্থের জন্য উল্লেখযোগ্য—হবসনের *Imperialism*, ফ্রয়েডের *The Interpretations of Dream* এবং স্ট্রিন্ডবার্গ যাকে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক বলে অভিহিত করেছিলেন—*A Dream Play*। নিৎশের মতো স্ট্রিন্ডবার্গ বদ্ধ উন্মাদ হননি, তবে ১৮৮৮ সালে তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়েছিলেন। নিৎশেকে তিনি লিখেছেন : Dearest Doctor, I will, I will, I will be mad'[১০]। স্ট্রিন্ডবার্গের ভয়াবহ মানসিক দোলাচলের মূলে ছিল নারীর প্রতি আকর্ষণ এবং ভয়াবহ বিদ্বেষ। বাবা অস্কার স্ট্রিন্ডবার্গ ছিলেন স্টিমারের টিকিট বিক্রেতা—সচ্ছল পেটিবুর্জোয়া। মা ছিলেন গৃহ ও হোটেল পরিচারিকা। স্ট্রিন্ডবার্গের জন্মের সময় তাঁর পিতা দেউলিয়া হয়েছিলেন। ১৩ বছর বয়সে তাঁর মা মারা যান। বাবা বাড়ির পরিচারিকাকে বিয়ে করায় স্ট্রিন্ডবার্গ ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ভয়ংকরভাবে অসুখী তাঁর শৈশব এবং কৈশোর জীবন। তাঁর পেশাগত জীবনও ছিল বিচিত্র। তিনি ছিলেন শিক্ষক, গৃহশিক্ষক, অভিনেতা, সাংবাদিক, গ্রন্থাগারিক ও টেলিগ্রাফ-কেরানি।

স্ট্রিন্ডবার্গের প্রায় সব নাটকই নির্মিত হয়েছে নারী-পুরুষের দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে। নারীকে তিনি চিত্রিত করেছেন ভয়ালরূপে। ১৯০১ সালে ৫৫ বছরের স্ট্রিন্ডবার্গ তৃতীয়বারের মতো প্রেমে পড়ে বিয়ে করেন হ্যারিয়ে বস নামের এক বাইশ বছরের তরুণীকে। বিয়ের পর থেকে তাঁদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। জুন

মাসে হ্যারিয়ে স্ট্রিন্ডবার্গকে ছেড়ে চলে যান এবং ফিরে আসেন ৪৫ দিন পরে। হ্যারিয়ের প্রত্যাবর্তনকে স্ট্রিন্ডবার্গ খ্রিষ্টের মরুভূমিতে কাটানোর প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করলেন। এই মিলনের মাধুর্যকে তিনি বিধৃত করলেন *স্বপ্ননাটক*-এ; যা তিনি শুরু করেন এ সময়ে। *স্বপ্ননাটক* নির্মিত হয়েছে ১৫টি দৃশ্যের পরিসরে। ১২টি স্থানে নাটকের সব ঘটনা ঘটে। ১৯০৭ সালে প্রথম অভিনয়ের সময়ে নাটকটির চরিত্র ছিল ৪৬টি। প্রতিটি চরিত্রই নায়িকা অ্যাগনেসের কল্পনাপ্রসূত[১১]।

নাটকটির বীজকাহিনি হচ্ছে পৃথিবীর মানুষের অভিযোগ এবং আর্তির সত্যিই কোনো কারণ আছে কি না, তা জানার জন্য ইন্দ্র তাঁর কন্যাকে পৃথিবীতে পাঠান। তার পরে রয়েছে কিছু দীপ্রদৃশ্য। মানবসমাজকে আলোকিত করার জন্য অ্যাগনেস বিয়ে করে এক আইনজীবীকে। কিন্তু অপরাধীদের সমর্থন করতে করতে সে-ও বৃদ্ধ হয়ে যায়; তাকেও মনে হয় অপরাধী। তাদের বিবাহিত জীবনেও নেমে আসে যন্ত্রণা। একজনের সুখ অন্যের 'বেদনা'। দারিদ্র্য ও অনটন। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য পরিচারিকা কৃষ্টিন দরজা-জানালা নিশ্ছিদ্র করে বন্ধ করে দেয়।

অ্যাগনেস এবং আইনজীবী যখন ভূমধ্যসাগরের তীরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে যায়, তখন তারা দুজন কয়লাশ্রমিকের দেখা পায়, যাদের কাছে সেই স্বর্গলোক নরক। অ্যাগনেস যখন জিজ্ঞাসা করে কেন মানুষ নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করতে চায় না, তখন আইনজীবী উত্তর দেন—সব সংস্কারকামীকে জেলখানা অথবা পাগলা গারদে যেতে হয়। একটি দৃশ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যনিবাসের, যেখানে স্বাস্থ্যহীন মানুষ তাদের স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে এসেছে। এখানে দেখা যায়, এক কবি কাদার বালতি হাতে, সামান্য প্রেমের জন্য ব্যাকুল এক কুৎসিত নারী এবং এক অন্ধ ধনী। সেখানে যে সুখী দম্পতিকে দেখা যায়, তারা সুখ নষ্ট হওয়ার আগেই জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে চায়।

গুহার মধ্যে কবির সঙ্গে অ্যাগনেসের দেখা হয়। এখানেই অ্যাগনেস কবির কাছে জীবনের ধাঁধার সমাধান জানিয়ে দেয়। কালের শুরুতে ব্রহ্মাকে বিমোহিত করে জগৎ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল মায়া। যেহেতু মানুষ ব্রহ্মা এবং মায়ার সন্তান। তাই জীবন মায়া এবং বেদনাবিদ্ধ। মানুষের যন্ত্রণার জন্য কর্ম দায়ী নয়, দায়ী ঈশ্বর।

*স্বপ্ননাটক*ও এক দীপ্র মিথ। জীবনের সব শূন্যতার উৎস ভারতীয় মিথ। *স্বপ্ননাটক* প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে এসে যায়, তা হচ্ছে স্ট্রিন্ডবার্গ তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য কেন ইন্দ্রকন্যাকে বেছে নিলেন। এর একটি প্রত্যক্ষ কারণ

হচ্ছে হ্যারিয়ের ছিল কৃষ্ণ চুল, বাদামি চোখ। তাঁর বাড়ি জাভায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গ্রন্থাগারিক হিসেবে স্ট্রিন্ডবাগ চীনা পাণ্ডুলিপির তালিকা নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি বুদ্ধ সম্পর্কে বইপত্র ঘেঁটেছিলেন। তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন নিৎশে এবং শোপেনহাউয়ের দ্বারা। একই বছর তিনি নিজের জন্য আয়োজন করেছিলেন ত্রিমূর্তির খেলা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে ত্রিভুজ আকারে। এই ত্রিমূর্তিকে তিনি ব্যবহার করেছেন বেশ কয়েকবার। প্রাচ্যের প্রতি এই আকর্ষণ একেবারে অহেতুক নয়। প্রাচ্যবাদ তখন বিস্তৃত হচ্ছে, ঘনীভূত হচ্ছে। স্ট্রিন্ডবার্গ তাঁর অস্তিত্বের যন্ত্রণার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন প্রাচ্যের ঈশ্বরের মধ্যে। অস্তিত্বের যন্ত্রণার জন্য মানুষ দায়ী নয়; দায়ী পতিত ঈশ্বর—মায়ার ফাঁদে পতিত ঈশ্বর। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু যক্ষপুরীকে অনিবার্য নিয়তি হিসেবে মেনে নিচ্ছেন না। কাব্যিক ও গীতল খেলার ভেতর দিয়ে এক নারী অনায়াসে ভেঙে ফেলে যক্ষপুরী। তার ভেতর নিয়ে আসে ফসলের প্রান্তর, প্রকৃতির মুগ্ধতা। দুই শিল্পীই তুলে ধরছেন সমকালীন অস্তিত্বের সংকট, তবু কি মেরুময় দূরত্ব দুই নাটকের মধ্যে, দুই প্রবল প্রতিভার মধ্যে!

২.

ভিলহেলম রিশার্ড ভাগনারের 'দ্য রিং অব নিবেলুং'

ভিলহেলম রিচার্ড ভাগনার (মে ২২, ১৮১৩-ফেব্রুয়ারি ১৩, ১৮৮৩) জন্মগ্রহণ করেছিলেন জার্মানির লাইপসিশে। ঠিক মার্ক্স যে বছর যে মাসে জন্মেছিলেন, তখনই ভাগনারের জন্ম। দুই মহৎ প্রতিভা মৃত্যুবরণ করেছেন একই বছর। ভাগনারের প্রথম জীবন কাটে ড্রেসডেনে। ১৮৪৯ সালে স্যাক্সন সরকারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয়, তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় এবং তিনি পালিয়ে গিয়ে শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যান।

ভাগনার ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও ইহুদিবিদ্বেষী। হিটলার ছিলেন ভাগনারের ভক্ত। ভাগনারের ব্রিটিশ স্ত্রী উইনিফ্রেড ছিলেন নাৎসি এবং তার পাঠানো কাগজে হিটলার লিখেছিলেন তাঁর কুখ্যাত গ্রন্থ *মাইন কাম্প*। তা সত্ত্বেও বিখ্যাত কবি ডব্লিউ এইচ অডেন লিখেছিলেন, ভাগনার ছিলেন পৃথিবীর 'মহত্তম প্রতিভা'। বোদলেয়ার, মালার্মে, ভারলেন ছিলেন তাঁর পূজারি। এমনকি ফ্রয়েডের আগেই তিনি তুলে ধরেছিলেন জীবন এবং মরণমুখী প্রেষণার কথা[১২]।

ভাগনার *দ্য রিং* অপেরাটি লিখতে শুরু করনে ১৮৫০ সালে। এটি শেষ হয় ১৮৭৪ সালে। অপেরাটির উৎস ছিল নরওয়ের পুরাকাহিনি। চারটি পর্বে বিন্যস্ত

অপেরাটি ১৫ ঘণ্টার বেশি সময় নিয়ে পরিবেশিত হয়। ২০টির বেশি চরিত্র নিয়ে জটিল কাহিনিবিন্যাসে সমৃদ্ধ ভাগনারের অপেরা।

দ্য রিং-এর মূল উপজীব্য হচ্ছে ক্ষমতা ও প্রেমের দ্বন্দ্ব। ব্রিটিশ নাট্যকার বার্নার্ড শ যেমন বলেন :

First, *The Ring*, with all its gods and giants and dwarfs, its water-maidens and Valkyries, its wishing-cap, magic ring, enchanted sword, and miraculous treasure, is a drama of today, and not of a remote and fabulous antiquity. It could not have been written before the second half of the nineteenth century, because it deals with events which were only then consummating themselves. (Bernard Shaw, 2020)[১৩]

ক্ষমতার প্রধান প্রতীক হচ্ছেন দেবতা বোটান। তিনি তরুণ বয়সে বুদ্ধি ও ক্ষমতার প্রতীক অ্যাশ বৃক্ষের একটি শাখা কেটে তা দিয়ে তৈরি করেন একটি শক্তিশালী বর্শা। যার মধ্যে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন আইন ও নিয়ম। তার ভিত্তিতেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রতাপশালী ও দেবতাদের রাজা। তৈরি করতে শুরু করেন এক সুরম্য প্রাসাদ। ওদিকে রাইন নদীর তলদেশে রয়েছে সোনার ভান্ডার। তার পাহারায় থাকে রাইনের জলপরিরা। এই সোনা পাওয়ার শর্ত হচ্ছে প্রেমের প্রত্যাখ্যান। বামন আলবেরিশ জলপরিদের প্রেমে ব্যর্থ হয়ে স্থির করে প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করার। তারপর পেয়ে যায় রাইনের সোনা। এই সোনা থেকে সে তৈরি করে জাদুর আংটি, যা তাকে করে তোলে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আংটির জোরে সে অন্য বামনদের দাসে পরিণত করে ও তাদের সোনা আহরণে নিযুক্ত করে।

বোটান চেয়েছিলেন সোনা ও আংটি কুক্ষিগত করতে। কিন্তু দৈত্যদের সঙ্গে চুক্তি থাকায় তার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি মানুষের বেশ ধারণ করে এক মানবীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ফলে বোটানের দুই সন্তান জন্মলাভ করে। পুত্রের নাম সিগমুন্ড, কন্যার নাম সিগলিন্ডি। শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য পালাতে পালাতে সিগমুন্ড হাজির হয় এক অরণ্যগৃহে, যার সঙ্গে রয়েছে এক বিশাল অ্যাশ বৃক্ষ। বোটান এই গাছে বিদ্ধ করে রেখেছিলেন এক বিশাল তরবারি। এই তরবারি বের করতে পারবে শুধু সত্যিকারের কোনো বীর। গৃহটি ছিল বোন সিগলিন্ডির। সে এখানে বাস করছিল তার স্বামীর সঙ্গে। অপরিচিত ভাই-বোন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সিগলিন্ডির স্বামী হুনডিং ঘরে ফিরে দেখেন সিগমুন্ডকে, যাকে তিনি

খুঁজছিলেন, সেই শত্রু। নিয়মানুযায়ী তিনি রাতের জন্য অতিথিকে আশ্রয় দেন, কিন্তু জানিয়ে দেন পরদিন সকালে তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে হবে। বোটান প্রথমে চেয়েছিলেন এই যুদ্ধে সিগমুন্ড জিতুক। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও বিয়ের দেবী ফ্রিকা তাঁকে মনে করিয়ে দেন সিগমুন্ড নিয়ম ভঙ্গ করেছেন, তারই মৃত্যু হওয়া উচিত। দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় বোটান এসে সিগমুন্ডের তরবারি ভেঙে ফেলেন। তার ফলে নিহত হন সিগমুন্ড। পরিশেষে রাইনের পরিরা পেয়ে যায় আংটিটি। চিতার আগুন স্পর্শ করে দেবতাদের প্রাসাদ। পুড়ে যায় তাদের সৌধ। সব ধ্বংসের মধ্যে থেকে যায় রাইনের পরিরা।

সোনা বা আংটির পেছনে ছুটতে গিয়ে দেবতা, দৈত্য ও নশ্বর প্রাণী সবাইকে বরণ করতে হয় মৃত্যু। ধ্বংস হয়ে যায় দেবতাদের প্রাসাদ। ক্ষমতার অন্বেষা সৃষ্টি করে মৃত্যুর মিছিল। অন্তিমে থেকে যায় প্রেম ও প্রকৃতি।

ভাগনার আশা করেছিলেন যে মিথভিত্তিক নাটকই হলো বর্তমান যুগের সংকট তুলে ধরার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়।[১৪]

'রক্তকরবী'

জেমস জয়েসের মতো রবীন্দ্রনাথও মনে করেছিলেন *রক্তকরবী* নাটকটিকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে কেটেও সমালোচকেরা 'কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না'। তাঁর বক্তব্য এখনো সত্য রয়ে গেছে।

ভাগনারের অপেরার সঙ্গে *রক্তকরবী*র মিল ও অমিল প্রবল। দুটি শিল্পকর্মেই সোনা এবং ক্ষমতা একই বৃন্তে যুক্ত। এর বিপরীতে বিরাজমান প্রেম ও প্রকৃতি। এই বৈপরীত্য শুধু ভাগনার বা রবীন্দ্রনাথে নয়, তা মূর্ত শেক্সপিয়ার ও মার্ক্সের চিন্তায়ও। *অর্থনৈতিক এবং দার্শনিক পাণ্ডুলিপিতে*[১৫] মার্ক্স দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন শেক্সপিয়ারের সোনার ওপর কবিতা থেকে। 'মানবজাতির বারবনিতা' এবং 'দৃশ্যমান ঈশ্বর' এই সোনালি ধাতু। এই হলুদ ধাতু বদলে দেয় আমাদের জীবনের সবকিছুকে। এই কবিতার সারাৎসার হিসেবে মার্ক্স তুলে ধরেছেন মুদ্রার স্বর্গীয় ক্ষমতাকে, যা মানবজীবনের জন্য তৈরি করে অমোঘ পারক্য বা বিচ্ছিন্নতা।

যক্ষপুরী শুধু সোনার পুঞ্জীভবন ও পারক্যের জনপদ নয়। তা মানবিক বঞ্চনারও পাতালপুরী। সমকালীন বা বর্তমান সময়ে তার উদাহরণের অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথও তা তুলে ধরেছেন। এই উদাহরণ আমরা চার্লস ডিকেন্সের লেখায় পাই। *হার্ড টাইমস*[১৬] উপন্যাসে তিনি শহরটির বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, কোকটাউন শহরটি যেন লাল-কালো আঁকা ঠিক যেন 'বন্য মানুষের

মতো'। এ ছিল যন্ত্র এবং উঁচু চিমনির শহর। ডিকেন্সের বিবরণ তুলে ধরা যাক :

'শহরটিতে ছিল কয়েকটি বড় রাস্তা। প্রতিটি একই রকম, অনেকগুলো ছোট ছোট রাস্তা, সেগুলো ছিল আরও একই রকম। শহরের মানুষ ছিল সবাই একই রকম, যারা সবাই একই সময়ে একই রাস্তা দিয়ে একই শব্দ করে প্রতিদিন একই কাজ করতে ঢুকত এবং বেরোত। এভাবেই কাটত তাদের জীবন—গত দিন এবং আগামী দিনের বছরের পর বছর।' [প্রবন্ধকারের অনুবাদ]

'শহরের সব লেখা ছিল সাদা-কালোর। জেলখানাকে মনে করা যেত হাসপাতাল, হাসপাতালকে জেলখানা, টাউন হলকে মনে করা যেত দুটির যেকোনো একটি।...সংখ্যা, সংখ্যা, সংখ্যা শহরের সব বস্তুগত বিষয়ে ছিল তার রাজত্ব, সংখ্যা, সংখ্যা, সংখ্যা, সমস্ত অবস্তুগত বিষয়ে ছিল তার ছায়াপাত।' [প্রবন্ধকারের অনুবাদ]

রক্তকরবী[৭] লেখা হয়েছিল ১৯২৩ সালে ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। তার আগের বছর অবশ্য ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়েছিল। নাটকটি শেষ হয় ১২ ঘণ্টার কম সময়ে, কিন্তু তার মধ্যে আবর্তিত হয় নানা ঋতু। স্ট্রিন্ডবার্গের *স্বপ্ননাটক*-এর মতো *রক্তকরবী*র উৎস ছিল রাণু নামের এক কিশোরীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ। নন্দিনী রাণুরই প্রতিচ্ছবি। নাট্যপরিচয়ের প্রথম বাক্যে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'এই নাটকটি সত্যমূলক।' তারপরই তিনি জানাচ্ছেন ঘটনাটি ঘটছে যক্ষপুরীতে। পৌরাণিক যক্ষপুরীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না। (রব. ১৫ : ৩৪৩) সোনার খনির উপমা ব্যাপ্ত করে কালকে; যুক্ত করে অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে, যক্ষপুরীকে যুক্ত করে ধনতন্ত্রের সঙ্গে। যুক্ত করে শেক্সপিয়ার, মার্ক্স এবং ভারতের নারীকে। *রক্তকরবী*তে কোনো যন্ত্র বা কল নেই। শুধু কলের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নয়, তাঁর বিরোধ সেই কলের সঙ্গে, যা স্তব্ধ করে দেয় প্রাণের প্রবাহকে, বিনষ্ট করে আনন্দকে। এ বিষয়টিও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে ধনতন্ত্র কলের চেয়ে পুরোনো। তিনি কল ছাড়াও ধনতন্ত্রের অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো *রক্তকরবী*র মধ্যে অনুসন্ধান করতে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ ধনতন্ত্রকে দেখছেন মূলধনের অন্তহীন সংগ্রহের মধ্যে, তার বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, তার সংস্কৃতির অবদমনের মধ্যে। তার সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরছেন দানবীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মানবীয় সংস্কৃতির বিরোধ।

যক্ষপুরী শুধু মিথের নয়, আধুনিক নগরও বটে। এখানে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হতে থাকে মূলধন। জীবন্ত শ্রম মৃত শ্রমে পরিণত হয়। নগর গ্রাম থেকে মানুষকে

টেনে আনে, টেনে আনে অনুপ, উপমন্যু, শঙ্কু, কঙ্কু, গজ্জুর মতো তরতাজা তরুণদের। ধনতন্ত্রের শোষণ তাদের পরিণত করে প্রাণশূন্য যন্ত্রে। তারা চিনতে পারে না নন্দিনীকে।

যক্ষপুরী প্রয়োজনের জগৎ, পাতালের জগৎ। *রক্তকরবী*র অধ্যাপক ঠিকই শনাক্ত করেন যক্ষপুরীর বাস্তবতাকে।

'আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের-বোঝা-মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ওই ধুলোর নাড়ির ধন—সোনা।' [৩৪৬] রাজাও জানিয়ে দিচ্ছেন তার ক্ষমতার উৎস। 'পৃথিবীর নিচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি।'

মূলধনের বিস্তৃত পুঞ্জীভবনের কথা আরও স্পষ্ট করে তোলে বিশু, 'এক দিনের পর দুদিন, দুদিনের পর তিন দিন; সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দুহাত, দুহাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালের পর দুতাল, দুতালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছায় না।'

মার্ক্সের ভাষায় আদিম সঞ্চয়ের পাশাপাশি মূলধনের বিস্তৃত পুঞ্জীভবন হচ্ছে ধনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য[১৮]। অধ্যাপক নন্দিনীকে জানিয়ে দেন যক্ষপুরীতে, 'কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।' 'সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়।' এই ধনতন্ত্র বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী তার শোষণ। এই বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক আধুনিকতার কোনো অতীত নেই, নেই কোনো ভবিষ্যৎও। তা নিজেকে নিরন্তর পুণরুৎপাদন করে। অধ্যাপকের ভাষায়, 'এদের সেই থাকাটা এত ভয়ংকর বেড়ে গেছে যে লাখো লাখো মানুষের ওপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে? জাল তাই বেড়েই চলেছে।' বিশ্বব্যাপী শোষণ চলে অস্ত্রে, মদে এবং মতাদর্শে। ফাগুলালের সংলাপে পাওয়া যায়, 'দেখনি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে পায়ে পায়ে।' বাক্যটিতে পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের 'জিন মহামারি'র উল্লেখ। তখন লন্ডনে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছিল মদের ব্যবহার, বিশেষ করে শ্রমিকদের মধ্যে[১৯]।

রাজা থাকেন তাই জালের আড়ালে। নিজেকে আড়াল করে রাখেন অন্য মানুষের স্পর্শ থেকে, মুক্ত স্থান থেকে। নন্দিনী রাজাকে জানিয়ে দেন যক্ষপুরীর সত্যিকার রূপ, 'দেখছ না, "সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে?"...হ্যাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।' এই বাক্যগুচ্ছের

সঙ্গে সহজেই মিলিয়ে নেওয়া যায় সমাজবিজ্ঞানী জিমেল বা ডেভিড হার্ভের[২০] আধুনিক নগরের ছবি। জিমেলের[২১] ভাষায়, মেট্রোপলিসে, 'He becomes a single cog over against the vast overwhelming organization of things and forces which gradually takes out of his hands everything connected with progress, spirituality and value.' একইভাবে ধনতান্ত্রিক আধুনিকতার মধ্যে অতীত নেই। তার সব দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। 'রাজা বলে, পুরাণ বলে কিছু নেই। বর্তমানকালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।'

নগরে প্রবল পারক্য, বিস্তীর্ণ অবসাদ। রাজা নামহীন, অধিকাংশ মানুষ নামহীন। নামহীন, পরিচয়হীন জনতা অবসাদকে ঝেড়ে ফেলতে চায়। বিশু জানিয়ে দেয়, 'আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে।'

মাস সোসাইটি বা গণসমাজের (যার তাত্ত্বিক নির্মিতি ঘটেছিল প্রধানত ১৯২০-এর দশকে গণমাধ্যম ও গণভোগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে)[২২] প্রতীকটিও স্পষ্ট বিশুর সংলাপে, 'মনে হতো, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই।'

নেপথ্য থেকে রাজা বলেন, 'নন্দিনী, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম। যেন কোনো দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে গুমরে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে।'

একি দূরদেশের প্রথম মহাযুদ্ধের রূপক নয়? আধুনিকতার প্রান্তরজুড়ে মৃত এবং মৃত্যুমুখীদের দৃশ্য। ১৯২২ সালে বেরিয়ে গেছে এলিয়টের *ওয়েস্ট ল্যান্ড*[২৩]। এলিয়টের কবিতায় পাথরের গুমরানি। ক্লান্ত পাহাড় কি একই সঙ্গে 'নিখিল নেতি'র সমকাল ও 'স্থির' সনাতন সময় নয়!

রক্তকরবীর মধ্যে ঘটে মিথের বিস্ময়কর ব্যবহার। যক্ষের মিথ প্রকাশ করে নানা তাৎপর্য। বৃহৎ ঐতিহ্যের পরিসরে যক্ষপুরীর অধীশ্বর কুবের। তিনি পাতাল এবং ধনসম্পদের অধিপতি। তিনি কখনো চিত্রিত হয়েছেন পাতালের অধিপতি হিসেবে, অথচ তাঁর নিজের আবাস পর্বতশৃঙ্গে। দূর থেকে যক্ষপুরীকে মনে হয় মেঘের স্বর্ণপুরী, 'সোনার চূড়া'। একটি বিবরণে কুবেরকে চিত্রায়িত করা হয়েছে শ্বেতকায় মানুষ হিসেবে, যার তিনটি পা বিকল। যক্ষপুরীর রাজা জালের আড়ালে

প্রায় নিশ্চল। নামহীন এই রাজা মকররাজ হিসেবে পরিচিত। মকর হচ্ছে পুরাণের সামুদ্রিক প্রাণী, যা বরুণ অথবা কামদেবের বাহন।

লোকজ ঐতিহ্যের মধ্যে যক্ষের ধন মিথটি ভিন্ন এক মাত্রা পেয়ে যায়। অতীতে কোনো ধনশালী কৃপণ ধন রক্ষার জন্য মাটির তলায় ঘর নির্মাণ করে কোনো বালককে ধরে তার পূজা দিত এবং তারপর তাকে ভূগর্ভস্থ কোটরে আটকে রেখে দিত। মৃত্যুর পর সেই বালক যক্ষযোনি লাভ করে কৃপণের ধন রক্ষা করত এবং তার ইচ্ছা অনুসারে উত্তরাধিকারীকে যক্ষের ধন প্রদান করত।

মিথের এই লোকজ রূপটি রবীন্দ্রনাথ কবিতার মধ্যে ব্যবহার করেছেন ১৯২৮ সালে।

এ কূপের তলে মোর যক্ষের ধন
একটি দিনের দুর্লভ সেইখন
চিরকাল ভরি' রহিল লুকানো।

রক্তকরবীর রাজা যেন একই সঙ্গে আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যের পক্ষে, উপনিবেশের পক্ষে। প্রান্তের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর ও শক্তিমান হওয়া সম্ভব নয়, এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আধুনিকতার সমস্ত বিকৃতি সত্ত্বেও তাই নন্দিনীর আকর্ষণ রাজার প্রতি। কামধেনু নন্দিনীর ডিসকোর্স তাই প্যাস্টোরাল বা গ্রামীণ ডিসকোর্স। রাজাকে যে ডাকে ফসলের প্রান্তরে, পশ্চিম যে 'লোহার খাঁচা' তৈরি করেছে, যেখানে প্রবল পারক্য, প্রবল বস্তুসর্বস্বতা সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। এই সভ্যতার পক্ষে আর মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়—মানবিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এর সব নেতিবাচক দিক সত্ত্বেও আধুনিকতার শক্তি আছে, আছে সংগ্রহের শক্তি, উৎপাদনের শক্তি।

ঐতিহ্যের মধ্যেও আছে দানবীয় রূপ, স্থির প্রাচীনতা, দুর্দমনীয় লালসা। মিথের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ঐতিহ্যের এই নেতিবাচক দিক। যক্ষপুরী একই সঙ্গে দানবপুরী, একই সঙ্গে মেট্রোপোলিস। রাজার জন্য প্রয়োজন প্রেম এবং প্রান্তর। নন্দিনীর প্রয়োজন শক্তির। উভয়ের মিলনে জন্ম নেবে নতুন সভ্যতা, উত্তর-আধুনিক সভ্যতা। রবীন্দ্রনাথ চিনে নেন আধুনিকতার নরককে, ঐতিহ্যের কৃষ্ণবিবরকে। তিনি মেলান আধুনিকতার শক্তির সঙ্গে ঐতিহ্যের প্রেমের লীলাকে। এই মিলন ঘটে নারীর আয়োজনে, উদ্যোগে। নন্দিনীর সঙ্গে প্রথম আলাপেই রাজা শুনতে পান দূরাগত গান 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয়রে চলে, আয় আয় আয়।'

মাটির আঁচল ভরে ওঠে পাকা ফসলে একই গানে নাটকটি শেষ হয়।

রবীন্দ্রনাথ *রক্তকরবীর* মধ্যে ভেঙে ফেলেন প্রয়োজনের জগৎ। তিনি নির্মাণ করেন সংস্কৃতির ভুবন—দিয়নোসাসের মুক্ত মত্ত কুসুমকোমল চৈতন্য বা নিৎশের দিয়নোসীয় সংস্কৃতি[২৪]। তিনি যোজনা করেন পরাক্রান্ত সভ্যতা বা প্রবল সংস্কৃতির বিপরীত ইউটোপিয়া। ইউটোপিয়া অযৌক্তিক নয়, তা অতীতমুখী নয়। তা অগ্রসর হতে চায় বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে। *রক্তকরবীর* মধ্যে যোজিত হেজেমোনিক ডিসকোর্স এবং তার বিপরীতে প্যাস্টোরাল ডিসকোর্স।

প্রবল বাচন বা ডিসকোর্স নির্মাণ করে প্রয়োজনের জগৎ। রাজা প্রবল বাচনের উৎস, যক্ষপুরী প্রবল বাচনের প্রান্তর। প্রবল বাচন স্তব্ধ করে রাখে বিরুদ্ধ কণ্ঠ, সব প্রতিবাদ। নন্দিনী যক্ষপুরীতে নিয়ে আসে সংস্কৃতির ভুবন—দিয়নোসাসের মুক্ত, মত্ত, কুসুমকোমল চৈতন্য বা দিয়নোসীয় সংস্কৃতি। *রক্তকরবীর* ফুল ইউটোপিয়ার চিহ্নক। কল্পলোকের আভাস আসে প্যাস্টোরাল ডিসকোর্স থেকে। তা অতীতমুখী নয়, অযৌক্তিক নয়। তা মুক্তির প্রান্তর তৈরি করে। তৈরি করে উর্বরতার শরীর, উর্বরতার প্রান্তর। তা নির্দেশ করে ভবিষ্যতের একমাত্র পথ। মুক্তি ঐতিহ্যের মধ্যে নেই। মুক্তি নেই আধুনিকতার মধ্যে। দুয়ের সদর্থক মিলনে মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ সাংস্কৃতিক 'সম্পদ'কে ব্যবহার করেছেন দ্বৈত সংকটের পটভূমিতে। এই সংকটের একটি রূপ হচ্ছে উপনিবেশের প্রান্তিক অস্তিত্বের সংকট। অন্যদিকে তাঁর মননে কাজ করেছে সভ্যতার সংকট—আধুনিকতার সংকট। ফলে রামায়ণের মিথকে তিনি ব্যবহার করেছেন অনেক জটিলভাবে।

ঔপনিবেশিক বাচনের বিপরীতে তিনি নির্মাণ করছেন প্রতিবাদী বাচন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি 'আপন'কে সমস্যা-কণ্টকিত করে তুলছেন। ঔপনিবেশিক আধুনিকতাকেও তিনি একক, কেন্দ্রিক এবং সমগ্র বাচন হিসেবে দেখছেন না। তিনি বরং মেলাচ্ছেন উভয়ের ক্রিয়াশীলতার বিস্তারকে। তাকেই তিনি নির্মাণ করছেন শৈল্পিক বাচন হিসেবে। তিনি আপন সংস্কৃতি থেকে তুলে আনছেন আদিম কামনার দ্যুতি। তাকে স্থাপন করছেন আধুনিকতার প্রচণ্ড শক্তির ওপর এবং ভেঙে ফেলছেন সেই শক্তিকে, খুলে দিচ্ছেন আধুনিকতার লোহার খাঁচাকে মায়াবী বাচনে। ভেঙে ফেলছেন অমোঘ পুরুষতন্ত্র, ইস্পাত-কঠিন আমলাতন্ত্র, নিষ্ঠুর কর্তৃত্ব, অন্তহীন পারক্য, মানবতার স্পর্শহীন নিরন্তর উৎপাদন। রবীন্দ্রনাথ অন্য যুগের লোকজ বিশ্বাসকে মেলে ধরেন পশ্চিমকে চেনার জন্য। দেশজ অভিজ্ঞানকে অস্ত্র হিসেবে তুলে নেন আগ্রাসী পশ্চিমের বিরুদ্ধে। বৈশ্বিক ধনতন্ত্র একই সঙ্গে নির্মাণ করে প্রগতির পথ এবং ভয়াল আধুনিকতা।

জোসেফ কনরাড কুর্টজের[২৫] চরিত্রের মধ্যে বিধৃত করেন আহরণের সেই প্রচণ্ড লালসা—বিশ্ব, বস্তু, মানুষ এবং মূল্যবোধের ওপর আধিপত্য সৃষ্টির প্রবল বাসনা, যার তাত্ত্বিক রূপ মেলে কার্ল মার্ক্স এবং ম্যাক্স ভেবারের মধ্যে। মার্ক্স চিহ্নিত করেছিলেন ধনতন্ত্রে মূলধনের নিরন্তর পুঞ্জীভবনের প্রক্রিয়া, বিশ্বব্যাপী সংগ্রহের রূপ, জীবিত শ্রমের ওপর মৃত শ্রমের আধিপত্য এবং তার পরিব্যাপ্ত বিচ্ছিন্নতা। ভেবার আধুনিকতাকে শনাক্ত করেছিলেন প্রকৃতির ওপর নির্মোহ আধিপত্য হিসেবে, তা জন্ম দেয় 'যন্ত্রতুল্য যুক্তিবদ্ধতা', যা অন্তিমে তৈরি করে লোহার খাঁচা[২৬]। ধনতন্ত্র এক নিষ্ঠুর প্রয়োজনের জগৎ। প্রয়োজনের পরিধির বাইরে তা চূর্ণ করে দেয় সব মানবিক সম্পর্ককে। 'অন্ধকারে হৃদয়'-এর মতো *রক্তকরবী* মিথের পরিসরে স্থাপন করে এক ভয়ংকর পুঞ্জীভবন, প্রয়োজন এবং বিচ্ছিন্নতার জগৎ। তাকে শনাক্ত করতে কলকারখানার প্রয়োজন হয় না।

রবীন্দ্রনাথ, উপনিবেশের প্রান্ত থেকে চিহ্নিত করছেন পশ্চিমকে, আধুনিকতাকে, তার নিরন্তর মুনাফার স্ফীতিকে, বস্তুর পুঞ্জীভবনকে, অসীম পারক্যবোধকে, রক্তাক্ত প্রতিযোগিতাকে। এই সব কিছু দিয়ে তিনি সজ্জিত করছেন তার মিথিক যক্ষপুরীকে—যা মিথের মতো প্রাণহীন, জনহীন। এই পাতালে বিবর্ণ, বিমর্ষ, নামহীন মানুষের ভিড়। অসীম শক্তি আর শূন্যতার রক্তাক্ত বিরোধে ক্লান্ত রাজা। স্ট্রিন্ডবার্গের *স্বপ্ননাটক*-এ রাজকর্মচারী প্রাসাদ থেকে মুক্ত হতে চায় না। দুঃখ তার নিয়তি। মুক্তির কোনো পথ নেই, কালের কোনো অগ্রসর দিগন্ত নেই, এমনকি কোনো স্বপ্নও নেই। ভাগনারের অপেরায় অন্তহীন ক্ষমতার লিপ্সা ডেকে আনে শুধু মৃত্যু, ধ্বংস ও বিনাশ। তবু বিজয়ী হয় প্রকৃতি। রাইনের সোনা ফিরে যায় জলের গভীরে।

কিন্তু *রক্তকরবী*র রাজা মুক্তি চান। প্রাণের চাঞ্চল্য, জীবনের ছন্দ তাকে আলোড়িত করে। রাজা শেষ অবধি বেরিয়ে আসেন, ভেঙে ফেলেন মিথকে, প্রাচ্যকে, ভেঙে ফেলেন পশ্চিমকে, আধুনিকতাকে। *স্বপ্ননাটক* প্রধানত অধুনাবাদী, যেখানে যন্ত্রণা এবং অমঙ্গল অনিবার্য নিয়তি, মুক্তির পথ নেই। *রক্তকরবী* প্রধানত উত্তর-অধুনাবাদী যৌবনের লীলা, ছন্দের লীলায় তা বিধ্বস্ত করে যন্ত্রকে, বস্তুর অন্তহীন সৃজনকে, নির্মূল করে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধকে। *রক্তকরবী*র ভাষা যেন ভারহীন, গভীরতাহীন—তা কেবলই ছন্দময়, গীতল। রঞ্জনের খোঁজে নন্দিনী তার যৌবন এবং যৌনতাকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। নন্দিনীর কামনাময় প্রবর্তনা যেন জাগিয়ে তোলে নিষ্পেষিত যক্ষপুরীকে। রাজা ভেঙে ফেলেন নিজের সৃষ্ট জগৎকে—যা কঠিন, নিরেট, যা কেবলই বস্তুকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে

তোলে, অন্ধ, আনন্দহীন জীবনকে ডুবিয়ে রাখে মদের নেশায়।

নন্দিনী প্রথম সৃষ্টির মতো সবাইকে আহ্বান করে ফসলের জগতে, প্রকৃতির অনন্ত লীলার মধ্যে। বিস্ময়করভাবে জটিল *রক্তকরবীর* ভূগোল। তার মিথিক নগর, পুরাণের নগর, সমকালীন নগর। ডাবলিন, লন্ডন অথবা ভিয়েনার মতো স্পষ্ট নয়—অপরিচিত, অস্পষ্ট নগর। কিন্তু তার বিবরণ অনিবার্যভাবে তুলে ধরে ধনতান্ত্রিক নগরকে, তার বিপন্ন জগৎকে যেখানে শ্রেণিভেদ মেরুময়, দীর্ণ ব্যক্তিজীবন, যেখানে মানুষ বসবাস করে অনন্ত অন্ধকারে। কিন্তু এই অস্পষ্ট নগর যুক্ত হয়ে যায় পুরাণের সঙ্গে, সমকাল সম্পৃক্ত হয়ে যায় অতীতের সঙ্গে। এ শুধু পশ্চিমের নগর নয়। এ নগর প্রাচ্যেরও বটে। লোভের সঙ্গে ত্যাগের, বস্তুর সঙ্গে প্রাণের, নারীর সঙ্গে পুরুষের, অন্ধকারের সঙ্গে আলোর, শূন্যতার সঙ্গে আনন্দের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ইতিহাসের পর্বে পর্বে বস্তুর, ক্ষমতার কাঠামো গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে বন্দীশালা, বসে যায় সতর্ক পাহারা। তবু মানুষ বিদ্রোহী হয়, প্রতিবাদী হয়।

ডেভিড হার্ভে লন্ডনের দাঙ্গার প্রসঙ্গে সমকালীন ধনতন্ত্রের নতুন নামকরণ করেছেন feral capitalism বলে। নগর কখনো দানবীয়, কখনো পাশবিক। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা, রবীন্দ্রনাথের দেখা লন্ডন অথবা ২০১১ সালের লন্ডন বারবার একই চিত্র তুলে ধরে।

রক্তকরবীর নামহীন নগর একই সঙ্গে আধুনিক নগর—ভয়াল এবং পাশব এবং অন্যদিকে তা বিদ্রোহী নগর; উত্তর-আধুনিক নগর, আরও স্পষ্ট করে বললে 'উত্তর-নগর' জনপদ। অনেকেই এখন মনে করছেন নগরে এত বেশি বিভাজন তৈরি হচ্ছে, এত বেশি দূষণ জমে উঠছে, এত বেশি শ্রেণিদ্বন্দ্ব গড়ে উঠছে, এত বেশি অপরাধ পুঞ্জীভূত হচ্ছে যে নগরকে বাদ দিয়ে আমাদের গ্রামীণ জনপদের স্বতঃস্ফূর্ত মানবিকতার মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ভাগনারের সুপ্রাচীন আখ্যান, স্ট্রিন্ডবার্গের স্বপ্নপুরী, রবীন্দ্রনাথের যক্ষপুরী প্রবলভাবে বিধৃত করে অধুনাবাদীদের যন্ত্রণাকাতর ধনতন্ত্রকে—এলিয়টের 'ওয়েস্টল্যান্ড', র‍্যাবোর নরককে। *রক্তকরবীর* মধ্যে যে কৃষিসভ্যতার জয়গান ও প্রকৃতিবাদ উচ্চারিত, তা প্রতিক্রিয়াশীল নয়, তা এখন মানবমুক্তির অনিবার্য পথ। এমনকি রবীন্দ্রনাথ *স্বপ্ননাটক* পড়ে থাকলেও তাঁর মধ্যে *স্বপ্ননাটক*-এর ছাপ থাকলেও *রক্তকরবী* এক অনন্যসাধারণ শিল্পকর্ম। প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস ও হিতেন্দ্রনাথ মিত্রের সমস্ত অভিযোগ তাই ভিত্তিহীন।

রক্তকরবীর নগর উত্তর-আধুনিক ভিন্ন একটি কারণেও। তা নিহিত তার অস্পষ্টতার মধ্যে, তার অপরিচয়ের মধ্যে। রাজার পরিচয় নেই, পরিচয় নেই

শ্রমিকদের—এ এক পরিচয়হীন জনপদ। *রক্তকরবীর* উত্তর-আধুনিকতা মূর্ত রাজার আত্মপরিচিতির সংকটের মধ্যে। রাজা কি নগরে স্বেচ্ছাবন্দী রঞ্জন? মুক্ত রাজাই কি রঞ্জন? বিশু কোন অর্থে রঞ্জনের অপর পিঠ? অথবা রাজা কি রাবণের নতুন জন্মরূপ? আমাদের সংশয় থেকে যায়। স্ট্রিন্ডবার্গের নন্দিনীর উৎস, তার প্রত্যাবর্তনের কথা আমরা জানতে পারি, কিন্তু নন্দিনীর আবির্ভাব অকস্মাৎ। আমাদের জানা হয় না নন্দিনী কে। কেন রঞ্জনকে খুঁজতে সে এই শহরেই এল? নন্দিনী কি বিবাহিত? নন্দিনীর মধ্যে শুধু আমরা পাই নিৎশের দিয়নোসীয় বিভূতি।

রক্তকরবীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিধৃত করেন সত্তার ভগ্ন রূপ, সত্তা এবং অপরের নিরন্তর বিরোধ, যা পরিকীর্ণ দেশ-কালের ঊর্ধ্বে। যে আদিম এবং সমকালীন গুহার ভেতরে রাজা বাস করেন, তা তাকে নিঃশেষিত করে না, তার অপর বা Other রয়ে যায়। ফলে থেকে যায় রঞ্জন, অদৃশ্য তবু বর্তমান, জীয়মান, মৃত তবু মুক্ত।

পশ্চিমে সাম্প্রতিক কালে সাহিত্য সমালোচনার যে বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে, তা হলো রোমান্টিকতাবাদ, অধুনাবাদ বা উত্তর-অধুনাবাদ কোনো একক, বিশুদ্ধ প্রতিকল্প নয়। সাহিত্য বা শিল্পের এ তিনটি রূপ ঢেউয়ের মতো ক্রমান্বয়ে তৈরি হয়েছে, একে অপরকে স্পর্শ করেছে, আলোড়িত করেছে। ক্যাথলিন হুইলার[২৭] দেখিয়েছেন, রোমান্টিসিজম এবং নিৎশে ও দেরিদার ভাবনার মধ্যে রয়েছে কিছু কিছু মিল। যাকে বলা হয় রোমান্টিক শ্লেষ, তা কিন্তু আবার ভেঙে ফেলে রোমান্টিক কল্পনারাজ্যের আবহ এবং আবেশ। রোমান্টিকতাবাদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে উত্তর-অধুনাবাদী উপাদান। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো গবেষক এমনকি শেক্সপিয়ারের মধ্যে লক্ষ করছেন উত্তর-অধুনাবাদের উপস্থিতি[২৮]। একইভাবে সমালোচকেরা স্ট্রিন্ডবার্গের উত্তর-'নরক' কালের নাটকের মধ্যে, বিশেষ করে, *স্বপ্ননাটক*-এর মধ্যে উত্তর-অধুনাবাদী চৈতন্য এবং কৌশল চিহ্নিত করেছেন[২৯]।

রবীন্দ্রনাথ স্ট্রিন্ডবার্গের মতো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বিশ্বসাহিত্যের সব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টিকে কোনো একটি অভিধায় চিহ্নিত করা যাবে না। তিনি যেমন রোমান্টিকতাবাদকে তাঁর চূড়ান্ত বিকাশের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি তিনি নতুন নতুন চৈতন্য এবং সৃষ্টিকৌশলে নির্মাণ করেছেন বাংলা সাহিত্যে অধুনাবাদ এবং উত্তর-অধুনাবাদ। স্ট্রিন্ডবার্গের *স্বপ্ননাটক*-এর চেয়ে অনেক বেশি

উত্তর-আধুনিক *রক্তকরবী*। কেননা স্ট্রিন্ডবার্গ অধুনাবাদী যন্ত্রণা এবং অমঙ্গলের চরম বোধ থেকে সরে আসতে পারেননি। *রক্তকরবী* সে তুলনায় অনেক বেশি জীবন-মৃত্যুঘন, দ্বান্দ্বিক অথচ ছন্দময়। ভাগনার সংগীতের মধ্যে, মিথের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করেন বিনাশী সমকালকে, স্ট্রিন্ডবার্গ চিহ্নিত করে দেন যন্ত্রণাকাতর মানবজীবনের অনিবার্য নিয়তিকে, রবীন্দ্রনাথ ভেঙে ফেলেন মিথকে, যক্ষপুরীর অতলান্ত শোষণের জগৎকে। নাটকের সংগীতে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে সোনার বিপরীতে মুক্ত প্রান্তরজোড়া সোনালি ফসল, রাইন না হলেও অচেনা নদী, নৌকার রূপকল্প। রক্তাক্ত ধনতন্ত্রের বিপরীতে বহমান থাকে প্রেম ও প্রকৃতি। অবিকল যেন ভাগনারের কালজয়ী অপেরার মতো।

● **এস আমিনুল ইসলাম** সমাজবিজ্ঞানী, সম্মাননীয় অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পাদটীকা

১. এস আমিনুল ইসলাম। আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। বারাসাত স্পন্দন, পঞ্চম সংখ্যা, ২০৯-২০।

২. প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী : তথ্য ও তত্ত্ব, অনুষ্টুপ, চতুর্বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

৩. হিতেন্দ্রনাথ মিত্র

৪. August Strindberg. A Dream Play in Anthony Caputi(ed.) Modern Drama. New York : W.W. Norton.

৫. শঙ্খ ঘোষ (২০০৯)। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক। কলকাতা : দে'জ।

৬. Jack Stillinger (1991). Multiple Authorship and the Myth of Solitary Genius. Oxford : Oxford University Press.

৭. Eliot. T. S. 1992. Collected Poems. Calcutta : Rupa.

৮. প্রভাতকুমার শর্মা (১৯৮৬)। রবীন্দ্রনাথ এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য। কলকাতা : গ্রন্থালয়

৯. Fredric Jameson (2006). Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. New Delhi : ABS publishers, p 96.

১০. F. L Lucas (1962).The drama of Ibsen and Strindberg. London, Macmillan

১১. J.L. Styan(1983). Modern Drama in Theory and Practice,Vol.3 : Expressionism and Epic Theatre. Cambridge : Cambridge University Press.

১২. Sheridan, Daniel James (2013). Wagner and "Grand" Opera : Performing

the Nation Through Embodied Sonorous Spectacle. Doctor of Philosophy thesis. Carleton University.

১৩. Bernard Shaw (1898). The Perfect Wagnerite : A commentary on the Niblung's Ring. London.

১৪. Sheridan, Daniel James (2013), opcit, p8.

১৫. Karl Marx (1844). Economic and Philosophic Manuscripts

১৬. Charles Dickens. Hard Times. New Delhi : Harper Collins, India.

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫০), রক্তকরবী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড। কলকাতা : বিশ্বভারতী; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০২)। চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড। কলকাতা :বিশ্বভারতী; রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৪)। রবি ও সে। ঢাকা : ডেলভিসটা ফাউন্ডেশন; অশোক কুমার মিশ্র (২০১১)। রবীন্দ্রনাট্যে রূপ :অরূপ। কলকাতা : দে'জ।

১৮. Karl Marx (n.d). Capital, Vol. 1. Moscow : Progress.

১৯. Ernest l. Abel (2001). The Gin Epidemic : Much ado about what? Alcohol and Alcoholism, Volume 36, Issue 5, September 2001, Pages 401-405,

২০. Georg Simmel (1971). "The Metropolis and Mental Life," in Donald n. Levine (ed.) Georg Simmel on Individuality and Social Forms. Chicago : University of Chicago, p337.

২১. David Harvey (2013). Rebel Cities : From the Right to the City to the Urban Revolution. New York : Verso.

২২. S. Aminul Islam (1991). City, Media and the Lonely Crowd in America, in Nazrul Islam and Fakrul Alam (eds.). The American City. Dhaka : Bangladesh Association for American Studies, pp 75-104.

২৩. T.S. Elliot, op cit.

২৪. Friedrich Wilhelm Nietzsche. (1995). The Birth of Tragedy. New York : Dover Publications.

২৫. Joseph Conrad (1990). Heart of Darkness. New York : Dover.

৩৬. Max Weber (1967). p 183.

২৭. Kathleen Wheeler (1993). Romanticism, Pragmatism and Deconstruction; Patric B Williams (2007).

২৮. Hugh Grady (1991). The Modernist Shakespeare : Critical Texts in a Material World. Oxford : Clarendon Press. (p.207).

২৯. Klaus van den Berg (2009). Strindberg's A Dream Play : Postmodernist Visions on the Modernist Stage. Cambridge : Cambridge University Press.

খাতি চিন্তা
বই আলোচনা

মুক্তিযুদ্ধের দিকে বিশ্বের ‘ভালোবাসায় বাড়ানো হাত’

রওশন জামিল

ভালোবাসায় বাড়ানো হাত: **মতিউর রহমান**
প্রথমা প্রকাশন, ২০২২

একটা কথা বোধ করি আমরা মোটামুটিভাবে বিশ্বাস করি বা বিশ্বাস করতে চাই যে লেখক-শিল্পীরা, সবাই না হলেও, বেশির ভাগই মোটাদাগে জোরালো রাজনৈতিক ধ্যানধারণা পোষণ করে থাকেন, যদিও তাঁদের সবাই হয়তো সমানভাবে উচ্চকিত হন না। তাঁদের কেউ কেউ লড়াকু জীবন বেছে নেন এবং একবার কোনো বিষয়ে পরিষ্কার অবস্থান নিয়ে ফেলার পর আর ভয় বা প্রলোভনের মুখে পিছিয়ে যান না। নিজেদের বিশ্বাসের জন্য নিজেদের জীবন বাজি রাখতে তাঁরা অকুতোভয়।

দেশে দেশে শাসনকাঠামোর নানা রূপ ও তার ভ্রষ্টাচার আমরা দেখেছি। পাশাপাশি লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদেরও দেখেছি যাঁরা গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে চেষ্টা করেছেন দুনিয়াটাকে বাসযোগ্য করে তোলার। বর্ণবাদ-উত্তর দক্ষিণ আফ্রিকার লড়াকু কবি-অনুষ্ঠানশিল্পী লেবাগং মাশিলের মতো এঁরা জানেন, ‘নীরবতা কাউকে সাহায্য করে না। নীরবতা ভয়ের জন্ম দেয় কেবল।’

বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা প্রশ্নের জন্ম দেয়। সংকট বা সামাজিক বিপ্লবের সময়ে লেখক-শিল্পীদের ভূমিকা কী? যখন কোনো জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় ব্যক্তিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়ে ধ্বংস করা বা ভাঙা হচ্ছে, শিল্প কীভাবে এ ধরনের পরিচয়কে পুনর্নির্মাণে সহায়তা করে? তা কি সত্য ও স্বাধীনতার সপক্ষের নিরলস

যোদ্ধা হওয়ার মাধ্যমে? নাকি পলায়নপর সাংবাদিকতাধর্মী লেখা বা শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে; ভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সমাজবদ্ধ মানুষের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নগুলো মিলিত হয় একটি মৌলিক প্রশ্নে এসে : শিল্পী-লেখকদের নৈতিক দায়িত্ব কী এবং তাঁরা যখন অন্যায় দেখেন তখন তাঁদের কাছে কী প্রত্যাশা করা যায়?

বিশ্ব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, যুগে যুগে যুদ্ধবিগ্রহ, সংকটের সময়ে লেখক-শিল্পীরা নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এ কথা যেমন সত্য বর্তমানে চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের বেলায়, যেখানে রুশ হামলার প্রতিবাদে কেবল সে দেশের শিল্পীরাই নন, খোদ রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশের লেখক-বুদ্ধিজীবীরাও এই আক্রমণের নিন্দা করেছেন। একইভাবে স্পেনের গৃহযুদ্ধেও আমরা ফ্যাসিবাদী ফ্রাঙ্কো সরকারের বিরুদ্ধে লেখক-শিল্পীদের আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠন করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখি।

এ দেশের মানুষের জন্য ১৯৭১ একটা গর্বের সময়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ছিল সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে বাঙালির ঐক্য গড়ে তোলা। সেই ঐক্যের এক অভূতপূর্ব চিত্র আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের পর। পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনই বদলে দিয়েছিল তাঁর কথা, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হও।' বাংলার মানুষ হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন সেই আহ্বানে।

সম্মুখ রণাঙ্গনে তো বটেই, পেছনেও গানে, নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রযোজনায়, নাটকে লেখক-শিল্পীরা বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার আকুতিকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। আগুনঝরা '৭১-এর স্মৃতিচারণা করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গায়ক মঞ্জুশ্রী নিয়োগী একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁরা কেবল বিজয়ের গানই করেননি, তাঁদের অনেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রাথমিক প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছিলেন।

বলতে কি, যেকোনো গণ-আন্দোলনের সময়েই সাধারণত বৈষম্যের সব দেয়াল ভেঙে পড়ে, সর্বস্তরের মানুষ এক মহৎ উদ্দেশ্যে এক পতাকাতলে সমবেত হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কেবল বাঙালি নয়, 'আন্তর্জাতিক পরিসরেও দেশে দেশে বিশ্বনন্দিত শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি বা গায়কেরা একইভাবে আমাদের স্বাধীনতার সমর্থনে মহতী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা কবিতা পাঠ করে, কনসার্টে গান গেয়ে, ছবি এঁকে এবং

সংহতি আন্দোলন গড়ে তুলে আমাদের মহাবিপর্যয়ের দিনগুলোতে পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন।'

এঁদের একদম পয়লা কাতারে ছিলেন আর্জেন্টিনার প্রখ্যাত লেখক রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, ফ্রান্সের মানবতাবাদী সংগ্রামী লেখক আঁদ্রে মালরো, ভারতের পণ্ডিত রবিশঙ্কর, 'বিটলস'-এর গায়ক জর্জ হ্যারিসন ও রিঙ্গো স্টার, নোবেল বিজয়ী কবি ও গায়ক বব ডিলান, মার্কিন বিট কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ, রুশ কবি আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি, অস্কারজয়ী যুক্তরাজ্যের অভিনেত্রী গ্লেন্ডা জ্যাকসন, মার্কিন গায়িকা জোয়ান বায়েজ প্রমুখ।

ভালোবাসায় বাড়ানো হাত : মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি লেখক-শিল্পী বন্ধু বাংলাদেশের অভ্যুদয়লগ্নের সেই সোনালি সময়ের শব্দরূপ। গ্রন্থটির লেখক *প্রথম আলো*র সম্পাদক মতিউর রহমান নিজেও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ইতিহাসের ভান্ডার মন্থন করে মুক্তিযুদ্ধের নানান ঘটনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানোর ব্যাপারে তাঁর একধরনের 'পাগলামি' আছে। এ বই তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

ভূমিকা বাদে বইটির মূল অংশ আট অধ্যায়ে বিভক্ত : কলকাতার লেখক-শিল্পীদের ভূমিকা, বোম্বের শিল্পীদের স্মরণীয় অবদান, মিছিলের সামনে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, জোয়ান বায়েজের 'সং অব বাংলাদেশ' : রবিশঙ্কর, জর্জ হ্যারিসন ও কনসার্ট ফর বাংলাদেশ, ওভালে 'গুডবাই সামার' কনসার্ট, লন্ডনে 'কনসার্ট ইন সিমপ্যাথি ১৯৭১', এবং নিউইয়র্কে অ্যালেন গিন্সবার্গ ও আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কির কবিতাপাঠ।

এর বাইরে পরিশিষ্ট অংশে রয়েছে আরও ছয়টি অংশ, যেখানে বিভিন্ন প্রামাণ্য নথি উপস্থাপিত হয়েছে : রূপান্তরের গান; রবিশঙ্কর : আমি একজন বাঙালি, কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-এর ধারা বর্ণনা ও অনুষ্ঠানসূচি, বীরেন্দ্রশঙ্কর : লন্ডনে 'কনসার্ট ইন সিমপ্যাথি ১৯৭১', 'কনসার্ট ইন সিমপ্যাথি ১৯৭১'-এর অনুষ্ঠানসূচি এবং ক্রিস চার্লসওয়ার্থ : ওভালে শিরোপা কে ধরে রাখল।

এ বইয়ের পরতে পরতে বিধৃত হয়েছে সেই উত্তাল সময়ের স্মৃতি, কীভাবে প্রতিবেশী ভারতের সেই সময়ের সব ভাষার শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তার কথা। চলচ্চিত্র নির্মাতা-লেখক সত্যজিৎ রায়, গায়িকা লতা মঙ্গেশকর, লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও লেখক বিষ্ণু দে, লেখক মুলকরাজ আনন্দ, শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন, অভিনেতা রাজকাপুর, গায়ক ও সুরকার শচীন দেববর্মন, সংগীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, ভূপেন হাজারিকা,

সলিল চৌধুরী, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কাইফি আজমি, লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কে ছিলেন না সেখানে!

এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মতিউর রহমান লিখেছেন, 'কলকাতার রবীন্দ্রসদনে সুচিত্রা মিত্র গাইছেন "আমার সোনার বাংলা" আর তাঁর দুই চোখ বেয়ে অবিরল ঝরছে অশ্রুধারা—উপস্থিত বন্ধু আবুল হাসনাতের কাছ থেকে শোনা এই দারুণ আবেগপূর্ণ দৃশ্যের কথা যখনই মনে হয়, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে, তাঁকে শতবার অভিবাদন জানাই (১২)।'

পূর্ব বাংলায় গণহত্যা শুরু হওয়ার পরপরই এর কিছু সংবাদ পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে দ্রুতই লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং [সে] দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বও সজাগ ও উদ্যোগী হয়ে ওঠে। এরই প্রেক্ষাপটে ২৮ মার্চ একদল স্বনামখ্যাত বুদ্ধিজীবী একটি বিবৃতি দেন গণহত্যার নিন্দা ও বাঙালির জয়ের বিষয়ে প্রত্যয়দীপ্ত আশাবাদ ব্যক্ত করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুশোভন সরকার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, প্রবোধচন্দ্র সেন, মৈত্রেয়ী দেবী, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, অম্লান দত্ত, গৌরকিশোর ঘোষসহ আরও অনেকে। তাঁরা বলেন, 'আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। ...পূর্ব বাংলার জনগণ সাহস, অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও সীমিত অস্ত্রবল নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েক ডিভিশন সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করছেন। পূর্ব বাংলার মানুষের জয় হবেই।'

এককথায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কলকাতার লেখক-কবি, শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সবাই তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বহুমুখী কাজ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এসবের পাশাপাশি তাঁরা কবিতা লিখেছেন, প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং বই প্রকাশ করেছেন, ছবি এঁকেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে কলকাতার উর্দুভাষীদের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন গঠনের কাজে কবি কাইফি আজমি, কলকাতার উর্দুভাষী কবি পারভেজ শাহিদি, কবি গোলাম কুদ্দুস, তরুণ সান্যালসহ অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন।

পিছিয়ে ছিলেন না চিত্রশিল্পীরাও। সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে বিড়লা একাডেমিতে ১৭ জন বাংলাদেশি শিল্পীর ৬৬টি ছবি নিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। এই প্রদর্শনীতে শিল্পী কামরুল হাসানের তৈলচিত্র ছিল পাঁচটি, দেবদাস চক্রবর্তী ও নিতুন কুন্ডুর দুটি

করে কাজ ছিল। মুস্তাফা মনোয়ারের ছবি ছিল আটটি। প্রাণেশ মণ্ডলের ছবি ছিল চারটি। আরও ছিল কাজী গিয়াসউদ্দিন, আবুল বার্‌ক আলভী, চন্দ্রশেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, স্বপন চৌধুরীসহ অন্যদের শিল্পকর্ম।

বাংলাদেশকে সহায়তা করার লক্ষ্যে মহারাষ্ট্রে গঠিত হয়েছিল 'বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি।' এর প্রধান মনোনীত হন বোম্বের ব্যবসায়ী শ্রীহরিশ মহীন্দ্র, ভাইস চেয়ারম্যান অভিনেত্রী ওয়াহিদা রেহমান ও শর্মিলা ঠাকুর, সম্পাদক বেগম মাহবুব নসরুল্লাহ এবং যুগ্ম সম্পাদক সলিল ঘোষ। মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দিতে নানাবিধ ভূমিকা গ্রহণ করে এই কমিটি।

তবে সবচেয়ে সাড়া জাগিয়েছিল বোধ করি 'বৃহৎ বোম্বে বাঙালি সমাজ' আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শচীন দেববর্মনের 'তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল।' প্রেক্ষাগৃহের আনুমানিক তিন হাজার দর্শক মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিলেন এই গানে। অনুষ্ঠানে আরও গান করেন মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সলিল চৌধুরী প্রমুখ।

এমন শিক্ষিত বাঙালি নেই, যিনি আর্জেন্টাইন বুদ্ধিজীবী, লেখক ও সাহিত্য সমালোচক ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর নাম শোনেননি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কারণে এ অঞ্চলের মানুষের কাছে তিনি পরিচিত। বয়সের ভারে তিনি তখন দুর্বল, তবু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার প্রতিবাদে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এইরেসে যে মিছিল হয়েছিল, তার পুরোভাগে ছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো।

জোয়ান বায়েজের নাম মানুষ জানতে শুরু করে গত শতকের ছয়ের দশকের শুরু থেকেই, একজন প্রতিবাদী শিল্পী হিসেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের নেতৃত্বে কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকারের যে বিরাট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন বায়েজ। একইভাবে দেশে ও বিদেশে মানবাধিকার, বন্দিমুক্তি এবং যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালের জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে জোয়ান বায়েজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ১২ হাজার দর্শক-শ্রোতার সামনে 'বাংলাদেশ' গানটি করেছিলেন। তারপর মিশিগান ইউনিভার্সিটির আরেকটি বড় কনসার্টে গেয়েছিলেন 'দ্য সং ফর বাংলাদেশ।' এটি 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর মতো ব্যাপক সাড়া জাগাতে না পারলেও 'সে সময়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাশাসকদের নির্মম অত্যাচারের

চিত্র তুলে ধরতে পেরেছিল।'

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সবচেয়ে সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান ছিল ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ১ আগস্টের 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ।' পণ্ডিত রবিশঙ্কর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বজনমত গড়ে তোলা এবং শরণার্থীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য তাঁর ছাত্র ও বন্ধু বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ড বিটলসের শিল্পী জর্জ হ্যারিসনকে নিয়ে আয়োজন করেন এই অবিস্মরণীয় কনসার্টের। হ্যারিসন তখন তাঁর *রাগা* অ্যালবামের জন্য লস অ্যাঞ্জেলেসে কাজ করছিলেন। সে সময় রবিশঙ্কর তাঁকে জানান যে তিনি বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য একটা কনসার্ট করতে আগ্রহী। তাঁর কাছ থেকেই হ্যারিসন জানতে পারেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত নানা খবর। তিনি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন, এ কাজে রবিশঙ্করকে তাঁর সাহায্য করা উচিত। ৪০ থেকে ৫০ হাজার দর্শক-শ্রোতা 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণে একই দিনে অনুষ্ঠানটি দুবার মঞ্চস্থ করা হয়।

এর বাইরে আরও যেসব অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে আছে ওই বছরেরই ১৮ সেপ্টেম্বর দ্য ওভাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের, যা বর্তমানে কিয়া স্টেডিয়াম নামে পরিচিত, 'গুডবাই সামার : কনসার্ট ফর বাংলাদেশ।' এ অনুষ্ঠান ঘিরে বেশ মজার একটা তথ্য হচ্ছে ব্যান্ড হু ও ফেসেসের মধ্যকার ঠান্ডা লড়াই। স্বভাবতই উভয় ব্যান্ডই নিজেদের সেরাটা নিংড়ে দিয়েছিল সে কনসার্টে। ফলে কনসার্ট হয়ে উঠেছিল আরও জমজমাট। মার্টিন উইলিয়ামসনের বর্ণনা থেকে জানা যায়, দর্শকেরা সেদিন এসেছিলেন বর্ণাঢ্য জিনস, টপস, ফ্রকসহ রংবেরঙের জামাকাপড় পরে।

প্রখ্যাত অভিনেত্রী গ্লেন্ডা মে জ্যাকসন ছিলেন 'কনসার্ট ইন সিমপ্যাথি ১৯৭১'-এর অন্যতম আকর্ষণ। ওই বছরই ডি এইচ লরেন্সের *উইমেন ইন লাভ* উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত একই নামের চলচ্চিত্রের জন্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড অস্কার অর্জন করেন তিনি। লন্ডন ছাড়া আরও সাত স্থানে সপ্তাহজুড়ে অনুষ্ঠিত হয় এই কনসার্ট। এমনকি নেদারল্যান্ডসেও তাঁদের অনুষ্ঠান হয়েছিল। লন্ডনের 'কনসার্ট ইন সিমপ্যাথি' অনুষ্ঠানে একা গ্লেন্ডা জ্যাকসনই কবিতা পাঠ করেননি, আরও ছিলেন অনেক লোকশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী। পশ্চিমবঙ্গ এবং লন্ডনের শিল্পীরা ছাড়াও ছিলেন বাংলাদেশের দুজন লোকসংগীতশিল্পী—মোহাম্মদ মোশাদ আলী ও শাহ আলী সরকার। ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের লোকসংগীতশিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, গায়ক সবিতাব্রত দত্ত, অভিনেতা-সংগীতশিল্পী রুমা গুহঠাকুরতা প্রমুখ।

বিখ্যাত মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ ১৯৭১ সালের ২০ নভেম্বর জনপ্রিয় রুশ কবি আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কিসহ আরও অনেককে নিয়ে নিউইয়র্কের ২৯৭ ইস্ট সিক্সটিনথ স্ট্রিটের সেন্ট জর্জ চার্চে একটি কবিতাপাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সে অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন আমেরিকান কবি ও নাট্যকার কেনেথ কচ, আমেরিকান কবি ও গায়ক এড স্যান্ডার্স, কবি ও অভিনেতা পিটার অরলোভস্কি, বিট কবি গ্রেগরি কর্সো ও ডিক গ্যালাপ, কবি ও ঔপন্যাসিক মাইকেল ব্রাউনস্টেইন, অ্যান ওয়াল্ডম্যান, কবি ও প্রাবন্ধিক রন প্যাজেট প্রমুখ। গিন্সবার্গের অবস্থান সব সময়ই যুদ্ধবিরোধী ছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামেও তিনি ছিলেন সামনের সারির একজন। ১৯৬৫ সালে ভিয়েতনামের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের কর্মীদের সমস্যার উত্তরণের পথ হিসেবে অ্যালেন গিন্সবার্গ সৃষ্টি করেন তাঁর অমর শব্দযুগল 'ফুলেল শক্তি'। তিনি বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীতে অস্ত্রের শক্তির চেয়ে মানবিকতার শক্তি বড়। তাই তাঁর হাতেই সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে উঠল হাতিয়ার।

রুশ কবি আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি (১২ মে ১৯৩৩—১ জুন ২০১০) ছিলেন গিন্সবার্গের বন্ধু। তিনি ছিলেন সোভিয়েত যুগের অন্যতম সাহসী লেখক এবং সোভিয়েত জনগণের বড় প্রেরণা। রুশ নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ একবার বহিষ্কারের হুমকি দিয়েছিলেন তাঁকে। তাঁর কবিতা অনুবাদ করেছেন ডব্লিউ এইচ অডেনের মতো কবি ও লেখক। নোবেলজয়ী লেখক বরিস পাস্তেরনাক ছিলেন তাঁর পরামর্শদাতা।

এ কথা বোধ করি নিশ্চিত করেই বলা যায় যে এসব কবি ও শিল্পীকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল একাত্তরে বাংলাদেশের মানুষের বেদনা। বাঙালির লড়াই-সংগ্রামের দুঃখ-কষ্ট মর্মে অনুভব করে তাঁরা গান বেঁধেছিলেন, কবিতা পাঠ করেছিলেন সুদূর আর্জেন্টিনায়, যুক্তরাষ্ট্রে, ইংল্যান্ডে এবং ভারতে। তাঁদের স্নেহসিক্ত বাড়ানো হাত বিরাট শক্তি, বিরাট অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। একইভাবে বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধের ময়দানে যেমন লড়েছেন, তেমনি লড়াই করেছেন গান, কবিতা, লেখা ও পাঠের মাধ্যমে। বাঙালির স্বাধীনতাসংগ্রাম কোনো একমাত্রিক ব্যাপার নয়, তা স্পর্শ করেছিল এ দেশের মানুষের জীবনের সব প্রান্ত। *ভালোবাসায় বাড়ানো হাত : মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি লেখক-শিল্পী বন্ধু* সেই সংগ্রামমুখর অবদানেরই আলেখ্য। মুক্তিযুদ্ধ গবেষণার ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে একটি আকরগ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে।

মানবিক দেশ, সমাজ ও পৃথিবীর ডাক তো বহুদিন বেজে চলছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকেও উঠেছে এই ডাক এবং বিশ্ব তা শুনেছে ও সাড়া দিয়েছে। এই আলোড়ন বাংলাদেশের পাশে টেনে এনেছিল গত শতকের ষাটের দশকের সেরা সব শিল্পী, লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবী এবং মানবতার মহান মনীষীদের। বাংলাদেশের গণহত্যা থামানো এবং মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পক্ষে শুধু 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'ই নয়, আরও অনেক তৎপরতা এক করেছিল সে সময়ের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদীদের। রাজনীতি ও দেশের সীমানা পেরোনো সেসব মানুষ কীভাবে 'বিশ্বমানবতা' নামের ধারণাটিকে হৃদয়কাড়াভাবে বাস্তব করে তুলেছিলেন, সেই ইতিহাস বলে গেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সম্পাদক মতিউর রহমান তাঁর '*ভালোবাসায় বাড়ানো হাত*' বইটিতে। এই বইয়ের আলোচনা কেবল বাংলাদেশের যুগান্তকারী ইতিহাসের কথাই বলে না, অন্য এক পৃথিবীর স্বপ্নবান মানুষের আদলও মনের ভেতর ফুটিয়ে তোলে। রাজনৈতিক ইতিহাস আর শিল্পের রাজনৈতিকতা কীভাবে মিলে যায়, এই গ্রন্থ তারই দলিল। আমাদের সময়ে হৃদয় আর রাজনীতির এই যোগসাজশ ক্রমেই বিরল হয়ে যাচ্ছে।

● **রওশন জামিল** লেখক ও অনুবাদ।

খাতি চিন্তা
বই আলোচনা

মধ্যবিত্তের দুই চরিত্র, স্বৈরতন্ত্রের রাজনীতি ও ব্রিন রোজেনফেল্ডের অটোক্রেটিক মিডল ক্লাস

সামজীর আহমেদ

দ্য অটোক্রেটিক মিডল ক্লাস: হাউ স্টেট ডিপেনডেন্সি রিডিউসেস দ্য ডিমান্ড ফর ডেমোক্রেসি গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ২০২০ সালে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে

গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের অধ্যয়নে দুটি সমান্তরাল ভুল কোনো চ্যালেঞ্জ ছাড়াই দীর্ঘকাল টিকে ছিল। ভুল দুটির প্রথমটি হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে গণতন্ত্রের সঙ্গে সমার্থক হিসেবে ধরে নেওয়া, যা অ্যারিস্টটলের সময় থেকে চলমান। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রকে তার ভাবাদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে কেবল জোরের ওপর টিকে যাওয়া ব্যক্তির শাসন হিসেবে দেখা। ব্রিন রোজেনফেল্ডের *দ্য অটোক্রেটিক মিডল ক্লাস* বইটির প্রকাশ পর্যন্ত এই দুই চিন্তাই রাজনৈতিক গবেষণাজগতে প্রবল ছিল।

রোজেনফেল্ড তাঁর বইটির শুরুতেই দেখিয়েছেন মধ্যবিত্তকে গণতন্ত্রের সমান্তরাল ধরার ভুলটা কোথায় ঘটে। এ ক্ষেত্রে একেবারে গোড়ার ভুল হচ্ছে মধ্যবিত্তকে একটা একক সত্তা হিসেবে ধরে নেওয়া। অথচ মধ্যবিত্তের ভেতর রয়েছে যথেষ্ট বৈচিত্র্য, শ্রেণি-উপশ্রেণি-বর্গ ও বৈশিষ্ট্য। রোজেনফেল্ড রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিসত্তার ভেতর আবিষ্কার করেন একটি অতি বড় ফাটল বা দূরত্ব। এর ভিত্তিতে তিনি মধ্যবিত্তকে দুই ভাগে বিভক্ত বলে ধরে নিতে পারেন। মধ্যবিত্তের এই খণ্ডিত অংশের এক দল হলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাভোগী মধ্যবিত্ত, আর অন্য দলটি হলো সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে নিজ চেষ্টায় বিকশিত মধ্যবিত্ত। এই দুই দল গণতন্ত্রের প্রতি মোটামুটি

বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে থাকে। রোজেনফেল্ডের মাঠপর্যায়ের গবেষণালব্ধ উপাত্ত অন্তত তা-ই বলে। প্রথম শিবির গণতন্ত্রের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। কারণ, গণতন্ত্রের ভেতর সমতার ধারণা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং সেখানে ব্যক্তির যোগ্যতা নিরূপণের পদ্ধতি আদর্শগতভাবে মেধাভিত্তিক। গণতন্ত্রের এসব বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত সরকারি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীকে তার সুবিধাগুলোর ব্যাপারে অনিশ্চিত করে তোলে। ফলে এই গোষ্ঠী খুবই যুক্তিসংগত কারণে স্বৈরতন্ত্রের পক্ষ নেয়। অপর পক্ষে এই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে নিজস্ব চেষ্টায় গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত যেহেতু কোনো সরকারের প্রতি বিনিময়সূত্রে দায়বদ্ধ নয়, তাই এই গোষ্ঠী সংগত কারণেই গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নেয়। কারণ, ধরে নেওয়া যায় যে গণতন্ত্র অন্যায্য সুবিধার বদলে মেধাভিত্তিক সমতার দুয়ার অবারিত করে। রোজেনফেল্ড পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে গবেষণা চালিয়ে মোটাদাগে এসব সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক আচরণ এবং কীভাবে তা স্বৈরতন্ত্রের সহায়ক শক্তি হয়ে ওঠে, তার ব্যাখ্যাই বইটির মূল আলোচ্য বিষয়। মধ্যবিত্তের গণতন্ত্রকামী অপর অংশ বইটির মূল আলোচনার অংশ নয় বরং ওই অংশটি এসেছে স্বৈরতান্ত্রিক বা রাষ্ট্রীয় মধ্যবিত্তকে চিহ্নায়নের স্বার্থে।

রোজেনফেল্ডের গবেষণার একটি বড় দিক হলো স্বৈরতন্ত্রকে পাঠের বৃহত্তর ক্যানভাস নির্মাণ করা। কোনো স্বৈরশাসকই যে শুধু তাঁর একক ব্যক্তি ক্যারিশমার ফসল নন, তা লেখক দারুণ সফলভাবে দেখাতে বা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। কোনো বিশেষ স্বৈরশাসকের ক্ষমতা দখলের পেছনে অল্পবিস্তর ব্যক্তিগত ক্যারিশমার ভূমিকা থাকলেও স্বৈরশাসক ও শাসন টিকে থাকে একটি কাঠামোর ওপর। সেই কাঠামোর ভিত্তিটা নির্মিত হয় স্বৈরতান্ত্রিক মধ্যবিত্তের দ্বারা। আধুনিক স্বৈরশাসক ও প্রাচীনকালের রাজার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক স্বৈরশাসক একধরনের হেজেমনিক ক্ষমতাকাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, যেখানে জোরই সর্বশেষ বা মূল কথা নয়। বইটিতে লেখক সেই বৃহত্তর কাঠামোটি স্পষ্ট করেছেন।

এই কাঠামোটি বুঝতে স্বৈরতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত আসলে কী, তা রোজেনফেল্ডকে অনুসরণ করে আলোচনা করা যাক। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ও প্রাপ্যের অতিরিক্ত সুবিধায় পরিপুষ্ট, তারা সংগত কারণেই গণতন্ত্রের চেয়ে স্বৈরতন্ত্রকে নিজ শ্রেণিগত স্বার্থে বেশি পছন্দ করে, তাকে স্বৈরতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত বলে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি কীভাবে স্বৈরতান্ত্রিক

ক্ষমতাকাঠামোর অংশীদার হয়ে ওঠে, সে সম্পর্কে রোজেনফেল্ড বলেন, 'এই বইয়ে আমি তুলে ধরতে চাই যে উচ্চতর শিক্ষা ও পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষেরা প্রায়ই স্বৈরতন্ত্রের পক্ষাবলম্বন করে। কারণ, স্বৈরতান্ত্রিক সরকার এই গোষ্ঠীটিকে সম্পদ অর্জনের উপায় (যেমন চাকরি, বেতন, বিশেষ সুবিধাদি এবং উপরি আয়ের সুযোগ) করে দেয়। স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো রাষ্ট্রীয় সম্পদে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে এবং যারা এই কাঠামোর পক্ষে কাজ করে, তাদের পুরস্কৃত করে। ক্ষমতার আনুকূল্য, দুর্নীতি এবং অন্যান্য বিষয়; যেগুলো মূলত পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে, তা কার্যত আরও বেশি কিছু করে থাকে। এগুলো গণতন্ত্র এবং অন্যান্য ভিন্নমত সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তৈরি করে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামোকে টেকসই করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।... সুতরাং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্বৈরতন্ত্রের প্রতি বৈরী এক ফাঁদ হওয়ার বদলে আদতে এই গোষ্ঠী স্বৈরতন্ত্রের চাকায় নিরাপত্তা-হুক হিসেবে কাজ করে, যা স্বৈরতন্ত্রকে তার গতিপথে শক্ত করে ধরে রাখে।'

আসলে স্বৈরতন্ত্র তার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে এবং মজবুত রাখতে জনগণের মধ্য থেকে এই বিশেষ শ্রেণিটি জন্ম দেয় আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সুবিধাগুলোর বিনিময়ে। চাকরি, পেনশন, চাকরির নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা, বিভিন্ন বাড়তি ভাতা, দুর্নীতির সুযোগ, নিয়মিত তদারকির বাইরে রাখা, অপেক্ষাকৃত কম কর্মঘণ্টা ইত্যাদি সুযোগের মাধ্যমে এই শ্রেণিটি তৈরি করা হয়। এর পাশাপাশি আছে সরকারের বিনিয়োগে সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা বা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া কাজ। এসব কাজের ব্যবসায়িক সুবিধাভোগীরাও এই বিশেষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠে। স্বৈরতন্ত্র রাষ্ট্রের ওপর এমনভাবে জেঁকে বসে যে ব্যক্তিগত বা অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিকাশ রীতিমতো বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যদিও রাজনৈতিক ব্যাকরণ মেনে বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থাকে স্বৈরতান্ত্রিক বলা যাবে না, তবু রোজেনফেল্ডের অনেক বর্ণনা দেশীয় ক্ষমতার আচরণের সঙ্গে মিলে যায়।

আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হলো নির্বাচনী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা কোনো কারণে ঝুঁকির মুখে পড়লেই সেই ক্ষমতার ধরন স্বেচ্ছাচারিতার নিকটবর্তী হয়ে ওঠে। জনগণের থেকে ক্ষমতার উৎস সরে গেলে তখন ক্ষমতাকামী দলের কাছে এমন একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, যে তার শাসনকে সাহায্য করবে ও টেকসই ভিত্তি দেবে। ফলে ক্ষমতাকামী দল ও তার আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন বা মোটাদাগে সরকারি সুবিধাপুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরস্পর নির্ভরযোগ্যতা

জরুরি হয়ে ওঠে। রোজেনফেল্ড তাঁর বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিয়েছেন ঠিক কারা এই সরকারি মদদপুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত হতে আগ্রহী হয়। তাঁর মতে, একজন শিক্ষার্থী সে যে মত বা যেমন সামাজিক শ্রেণি থেকেই আসুক না কেন, মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রজদের দ্বারা গঠিত নেটওয়ার্কই তাকে সরকারি মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে উৎসাহী করে তোলে।

সরকারি চাকরি ও সরকারের সম্পর্ক বিষয়ে রোনাল্ড কোহেনের আগের একটি গবেষণায় দেখা যায়, গরিব ও দীর্ঘ সময় ধরে উপনিবেশিত থাকা দেশগুলোতে সিভিল সার্ভিসের প্রতি চাকরিপ্রার্থীদের উদগ্র টান থাকে। নাইজেরিয়ার চাকরিপ্রার্থীরা সরকারি চাকরিকে বলে 'ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট চাকরি'। দীর্ঘ সময় ধরে উপনিবেশিত থাকা দেশ ও স্বৈরতান্ত্রিক দেশের মধ্যে মিল হলো এই উভয় প্রকার দেশেই অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রাদুর্ভাব বেশি। ফলে তারা ক্ষমতার বৈধতা ও তার পক্ষের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনে একটি সুবিধাপুষ্ট শ্রেণি গঠন করে। এমন শ্রেণি সৃষ্টি শুধু জোরমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষেই সম্ভব। কারণ, স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের হাতে থাকে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা। ফলে জবাবদিহি না থাকার কারণে এ ধরনের সরকার রাষ্ট্রীয় সুবিধার পছন্দমতো ব্যবহার করতে সক্ষম। স্বৈরতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত মূলত এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার উৎপাদ বা ফসল।

বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণামূলক অনেক ধরনের প্রামাণিক উপাত্ত ও তার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন লেখক। স্বৈরতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই রাজনৈতিক আচরণ বয়স বা লিঙ্গভেদে পরিবর্তিত হয় কি না, সেটাও পরখ করে দেখেছেন এবং এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফল খুব উল্লেখযোগ্য রকম ভিন্ন নয়। গবেষক দেখিয়েছেন, ১৯৯১ সালের পর থেকে তাঁর গবেষণাক্ষেত্রের দেশগুলোতে (পূর্ব ইউরোপের সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলো) প্রায় ৬৭ শতাংশ মধ্যবিত্ত সরকারি চাকরি বা পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়েছে। যেকোনো স্বৈরতান্ত্রিক দেশেই এই সংখ্যা খুব একটা কম হওয়ার কথা নয় কাঠামোগত কারণেই। স্বৈরতন্ত্র যেহেতু গণতন্ত্রের যথাসম্ভব কম শাসনের বিপরীতে অতিশাসনকে তার মূল চরিত্র হিসেবে গ্রহণ করে, ফলে সে তার সঙ্গে যোগসূত্রের বাইরের কাউকে বিকশিত হতে দিতে আগ্রহী নয়। এ ছাড়া আরেকটি কারণে স্বৈরতন্ত্র এই শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি জন্ম দিতে পারে। আর তা হলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এ ধরনের উন্নয়ন প্রচুর কর্মক্ষেত্র তৈরি করে এবং সরাসরি সরকারি চাকরির বাইরেও একটা অংশকে সরকারের প্রতিনিধিত্বমূলক মধ্যবিত্তের অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করে। সরকারি কাজগুলোর টেন্ডারকে কেন্দ্র করেও একটি

সুবিধাভোগী গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে। আবার এরই বিপরীতে সরাসরি সরকারি চাকরিরতরাও লাভবান হতে পারে কম তদারকি বা কাজ বণ্টনের বা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে।

রোজেনফেল্ড তাঁর বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে আরেকটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ে প্রামাণিক উপাত্ত হাজির করেছেন। এ অধ্যায়ে তাঁর গবেষণা জিজ্ঞাসা হচ্ছে, মধ্যবিত্ত স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয় কি না বা কোন মধ্যবিত্ত, কখন আন্দোলনে যোগ দিতে পারে। আসলে রোজেনফেল্ডের এই প্রশ্ন তাঁর মূল তত্ত্বেরই সম্পূরক প্রশ্ন, যা তাঁর মূল তত্ত্বকেই শক্তিশালী করেছে। ২০১১-১৩ সালের রাশিয়ান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে গবেষক এই ফলাফলে উপনীত হন যে স্বৈরতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে না। কারণ, বর্তমান ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোনো ব্যবস্থা তার বর্তমান পাওয়া অতিরিক্ত সুবিধাগুলোকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারে, এমনটাই তাঁর বিশ্বাস। তবে এই রাষ্ট্রীয় মধ্যবিত্তও বিশেষ ক্ষেত্রে আন্দোলনে অংশ নিতে পারে। আর সেটা হচ্ছে বাড়তি সুবিধা ও নিশ্চয়তা আদায়ের আন্দোলন। অধিকার বা স্বাধীনতার মতো রাজনৈতিক শব্দ এই গোষ্ঠী এড়িয়ে চলে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলন অনেকটা এই শ্রেণির আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্তির পথটা আরও অবারিত করে তোলা। আমলা, চিকিৎসক, শিক্ষকসহ সরাসরি সরকারি বেতনভুক্ত বিভিন্ন পেশাজীবীর আন্দোলন মূলত এ ধরনের আন্দোলন, যা ওই নির্দিষ্ট সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে না বরং এসব চাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে তার বৈধতাকে পোক্ত করে।

এই রাষ্ট্রীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভোগ্য সুবিধাগুলো আবার প্রকারান্তরে স্বৈরতন্ত্রকে ঝুঁকির মুখে ফেলে। কারণ, তখন মধ্যবিত্ত এমন দুটি শ্রেণিতে ভাগ হয়ে পড়ে, যাকে ঘুষগ্রহীতা ও ঘুষদাতা হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। এক পক্ষের সুবিধা ও নিশ্চয়তা নিশ্চিতকরণে অপর পক্ষ আরও অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে আরও ঝুঁকিতে পড়ে যায়। আর এ অবস্থা আন্দোলন বা স্বৈরতন্ত্রবিরোধী ক্ষোভকে আরও উসকে দিতে পারে। ফলে রাষ্ট্রীয় মধ্যবিত্ত ও অরাষ্ট্রীয় মধ্যবিত্তের সম্পর্ক দৃশ্যতল বা উপরিতলের চেয়ে আরও জটিল ও গভীর।

আমি মনে করি, স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোয় রাষ্ট্রীয় মধ্যবিত্তের পরিপোষণের জন্য নিয়মের যে লঙ্ঘন ঘটে, তা-ই জন্ম দেয় সিন্ডিকেটকেন্দ্রিক রাজনীতির। রাষ্ট্রীয় মদদ ছাড়া কোনো সিন্ডিকেটই সিন্ডিকেট হয়ে উঠতে পারে না। ফলে ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটগুলোও রাষ্ট্রীয় মধ্যবিত্ত হিসেবেই শনাক্ত হতে পারে। তবে

এর স্থানিক বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। অন্যদিকে রোজেনফেল্ডের এই গবেষণা মুখোশি বা ছদ্মবেশী গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কতখানি পাঠযোগ্য, তা আরও বিশদ গবেষণার দাবি রাখে। বাংলাদেশের মতো দেশে রাষ্ট্রীয় মধ্যবিত্ত বলে যাকে চিহ্নিত করা সম্ভব, তা আসলে ক্রমশ রাষ্ট্রীয় উচ্চবিত্ত হয়ে উঠছে কি না এবং রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধির পুরোনো মানদণ্ড হিসেবে যে মধ্যবিত্ত পরিচিত, তা আসলে ক্রমশ অন্য দুই শ্রেণিতে অনেকখানি বিলীন হয়ে পড়ছে কি না, তা-ও গবেষণার দাবি রাখে।

বইটির মূল অবদান হচ্ছে মধ্যবিত্তকে একক সত্তা হিসেবে দেখার প্রবণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা ও মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক আচরণের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যকে স্পষ্ট করে তোলা এবং মধ্যবিত্ত যে গণতন্ত্রের সমার্থক কোনো ধারণা নয় বরং মধ্যবিত্তের শক্তিশালী অংশটি গণতন্ত্রবিরোধী হতে পারে, তা গবেষণালব্ধ ফলাফলসহ উপস্থাপিত করা।

রোজেনফেল্ডের সফলতা এখানেই যে তাঁর এই বইটি কেবল কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বা প্রচলিত ভুলের শোধন প্রস্তাব দিয়েই শেষ হয় না। এটি সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষিতভেদে আরও কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয় এবং স্বৈরতন্ত্রের কাঠামোবদ্ধ পাঠকে উৎসাহিত করে। গণতন্ত্র, রাজনৈতিক আচরণের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতাকামী আমলাতন্ত্রের মতো বিষয়গুলোতেও রোজেনফেল্ডের এই গবেষণা দারুণ প্রভাব রাখতে সক্ষম।

প্রিন্সটন স্টাডিজ ইন পলিটিক্যাল বিহেভিয়ার সিরিজের ব্রিন রোজেনফেল্ডের *দ্য অটোক্রেটিক মিডল ক্লাস; হাউ স্টেট ডিপেনডেনন্সি রিডিউসেস দ্য ডিমান্ড ফর ডেমোক্রেসি* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ২০২০ সালে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস পাবলিকেশন্স থেকে। বইটির বাজারমূল্য ১০০ ইউএস ডলার।

● **সামজীর আহমেদ** একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ ছিল উত্তেজনাভরা রোমাঞ্চকর এক সময়। একদিকে ভারতের সেনাপ্রধানের তরফে আত্মসমর্পণের জন্য দেওয়া বার্তা, অন্যদিকে তৎকালীন পূর্ব পূর্বাঞ্চলীয় পাকিস্তানের গভর্নর ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। মুক্তিযুদ্ধের সামরিক ইতিহাসের এক চকিত চিত্র তুলে ধরা হলো এই অনূদিত বার্তাগুলোতে। সামরিক সংকেত ও ভাষাভঙ্গি রক্ষা করে মূল বার্তার স্বাদ দেওয়া হয়েছে এতে। অনুবাদ করেছেন **মনোজ দে**।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজির জন্য
ভারতের সেনাপ্রধান শ্যাম মানেকশর বার্তা

প্রথমত—বাংলাদেশে যুদ্ধবিরতিসংক্রান্ত আপনার বার্তাটি নয়াদিল্লির জাতিসংঘ কার্যালয় মারফত আজ বেলা আড়াইটায় পেয়েছি।

দ্বিতীয়ত—জেনারেল ফরমান আলীকে এর আগে দুই দফায় পাঠানো বার্তায় জানিয়েছিলাম যে আমি নিশ্চয়তা দেব (ক) বাংলাদেশে আমার কাছে যেসব সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করবে, তাদের সবার নিরাপত্তা, (খ) সব বিদেশি নাগরিক, জাতিগত সংখ্যালঘু এবং পশ্চিম পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কর্মচারীরা—তারা যে-ই হোক না কেন, সবার জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। যেহেতু আপনি যুদ্ধ বন্ধের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, আমি প্রত্যাশা করি আপনি এই মর্মে আদেশ জারি করবেন যে বাংলাদেশে আপনার কর্তৃত্বাধীন সব বাহিনী অবিলম্বে অস্ত্রসংবরণ করে এবং আমার অগ্রসরমাণ বাহিনী যেখানেই অবস্থিত, সেখানেই যেন আত্মসমর্পণ করে।

তৃতীয়ত—আমি আপনাকে আন্তরিক নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে যেসব সদস্য আত্মসমর্পণ করবে, তাদের সঙ্গে সৈন্যদের উপযুক্ত মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আচরণ করা হবে এবং আমি জেনেভা কনভেনশনের বিধিবিধান মেনে চলব। তা ছাড়া যেহেতু আপনার অনেক আহত ব্যক্তি রয়েছে, আমি তাদের সুচিকিৎসা এবং মৃতদের যথাযথ সৎকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব। তারা যেখান থেকেই আসুক না কেন, তাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার কমান্ডের অধীন কোনো বাহিনী থেকে কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

চতুর্থত—আপনার কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভারত ও বাংলাদেশের বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল অরোরাকে নির্দেশ দেব যাতে আপনার বাহিনীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বিমান ও স্থল হামলা থেকে তারা বিরত থাকে। আমার

আন্তরিকতার নিদর্শন হিসেবে আজ বিকেল পাঁচটা থেকে ঢাকায় বিমান হামলা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছি।

পঞ্চমত—আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি যে আপনার সৈন্যরা অহেতুক হতাহত হোক, সেই ইচ্ছা আমার নেই, যেহেতু আমি মানুষের প্রাণহানি ঘৃণা করি। অবশ্য আমি যা উল্লেখ করলাম তাতে আপনি সম্মত না হলে ভারতীয় সময় ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় সর্বশক্তি দিয়ে পুনরায় আক্রমণ শুরু করা ছাড়া আমার হাতে আর কোনো বিকল্প থাকবে না।

ষষ্ঠত—আলোচনা দ্রুত এগিয়ে নেওয়া এবং সব বিষয় দ্রুত ফয়সালা করার জন্য আজ ১৫ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় বিকেল পাঁচটা থেকে শ্রবণ-পর্যবেক্ষণে (listening watch) বেতার সংযোগের ব্যবস্থা আমি করেছি। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে দিনে ৬৬০৫ (৬৬০৫) কিলোহার্টজ, রাতে ৩২১৬ কিলোহার্টজ। কল সাইন হবে সিএএল (কলকাতা) এবং ডিএসি (ঢাকা)। আপনার প্রতি আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনার সিগন্যালম্যানদের নির্দেশ দিন, যাতে তারা অবিলম্বে মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ পুনরায় চালু করে।

জরুরি ১৪১৩৩২/অশ্রেণিভুক্ত/জি০০১৩

হইতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী

বরাবর গভর্নর পূর্ব পাকিস্তান, কমান্ডার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড

প্রেসিডেন্টের থেকে গভর্নর ও জেনারেল নিয়াজির জন্য। আমার গভর্নরের গোপনীয় বার্তায় প্রসঙ্গে। শত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আপনি বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে গেছেন। জাতি আপনার জন্য গর্বিত এবং গোটা বিশ্ব আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব, তার সবটাই আমি করেছি। আপনি এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন, যেখানে আর প্রতিরোধ তৈরি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এবং তাতে কোনো প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যও সাধিত হবে না। এটা কেবল আরও বেশি প্রাণহানি ও ধ্বংস ডেকে আনবে। এখন যুদ্ধ বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সশস্ত্র বাহিনীগুলোর সব সদস্য, পশ্চিম পাকিস্তানের সব নাগরিক এবং অনুগত সব লোকের প্রাণ রক্ষার উদ্যোগ আপনার নেওয়া উচিত। এই ফাঁকে আমি জাতিসংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, যাতে পূর্ব পাকিস্তানে অবিলম্বে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড বন্ধের জন্য তারা ভারতকে চাপ দেয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এবং অন্য যেসব মানুষ দুর্বৃত্তদের লক্ষ্যবস্তু, তাদের সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

প্রিয় জেনারেল নিয়াজি, ঢাকা, ১৫-১২-৭১

সেনাবাহিনীর করণীয় সম্পর্কে আপনাকে ও গভর্নর হিসেবে আমাকে পাঠানো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্দেশ (জি০০১৩ তারিখ ১৪-১২-৭১) প্রসঙ্গে আপনি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কি না, সেটা কি আমি জানতে পারি। বার্তাটিতে খুব পরিষ্কারভাবে বলা আছে, 'এখন যুদ্ধ বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সশস্ত্র বাহিনীগুলোর সব সদস্য, পশ্চিম পাকিস্তানের সব নাগরিক এবং অনুগত লোকদের প্রাণ রক্ষার উদ্যোগ আপনার নেওয়া উচিত।' বার্তায় আরও বলা আছে, 'আপনি এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন, যেখানে আর

প্রতিরোধ তৈরি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং তাতে কোনো প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যও সাধিত হবে না।' হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড এখনো চলমান এবং মানুষের প্রাণহানি ও সম্পদ ধ্বংস চলছেই। প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদসহ, আপনার অনুগত
এ এম মালেক
ফোন-২৫২৯১১,১২

১৬০২২৩
ভারতের চিফ অব স্টাফ শ্যাম মানেকশর প্রতি লে. জেনারেল নিয়াজির বার্তা

মার্কিন কনস্যুলেটের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে আপনার বার্তাটি পেয়েছি। সর্বাগ্রে মানুষের জীবন রক্ষার বিষয়টি আমার দিককার প্রস্তাবের ভিত্তি। এবং সেটা কেবল সম্ভব হতে পারে (যদি) সব সেনাকে সময়মতো ভালোভাবে জানানো যায় এবং সতর্কতার সঙ্গে সব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যোগাযোগের সমস্যা এবং আমার বাহিনীর মধ্যকার বিচ্ছিন্নতার কারণে যুদ্ধবিরতির সময় আরও ছয় ঘণ্টা বাড়ানো প্রয়োজন। যদি এর আগে ঢাকায় দুই দেশের স্টাফদের মধ্যে একটি প্রস্তুতিমূলক সভার আয়োজন করা যায়, তাহলে বিষয়টি অনেক সহজতর হয়ে যাবে। দয়া করে যুদ্ধবিরতির সময় পূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় সময় বেলা তিনটা পর্যন্ত বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করুন। ঢাকা বিমানবন্দরে আপনার কর্মকর্তাদের কারা এবং কখন নামবে, তাদের সম্ভাব্য নাম জানাবেন। এই ফাঁকে আপনার অনুরোধে যুদ্ধবিরতির আনুষ্ঠানিকতা এগিয়ে নিই। সমাপ্ত

ডিটিজি থেকে বার্তা/০৭ ১২০০ অতিগোপনীয় এ৬০০৫
জরুরি
হইতে : গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তান
বরাবর : সদর দপ্তর, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, রাওয়ালপিন্ডি

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের জন্য। পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত অবস্থা আপনার নজরে আনা জরুরি বলে মনে করছি। জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন, সেনারা বীরত্বের সঙ্গে লড়ছে। কিন্তু গোলাবারুদ ও বিমানের সহযোগিতা ছাড়া তাদের ব্যাপক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। বিদ্রোহীরা এখনো পেছন থেকে হামলা অব্যাহত রেখেছে। এতে করে প্রাণহানি যেমন হচ্ছে, আবার সামরিক সরঞ্জামেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। সেগুলো প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। পূর্ব ও পশ্চিম সেক্টরের যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে এসেছে। মেঘনা নদীর পূর্ব দিকের পুরো সামরিক করিডর হাতছাড়া হওয়ার বিষয়টি এড়ানো যাচ্ছে না। এরই মধ্যে যশোরের পতন হয়েছে। এ বিপর্যয় পাকিস্তানপন্থীদের নৈতিক মনোবলের ওপর ভয়ানক একটা আঘাত। নিজেদের মধ্যকার যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় বেসামরিক প্রশাসন অকেজো হয়ে পড়েছে। চট্টগ্রাম থেকে কোনো যানবাহন চলাচল না করায় এবং প্রদেশের মধ্যে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খাদ্য ও অন্যান্য রসদ সরবরাহ

ফুরিয়ে আসছে। এমনকি সাত দিনের মধ্যে ঢাকার খাদ্য ফুরিয়ে যাবে। খাদ্য ও জ্বালানি ছাড়া জীবনযাত্রা একেবারে অচল হয়ে যাবে। যেসব জায়গা থেকে সেনাবাহিনী চলে এসেছে, সেসব জায়গার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। বিদ্রোহীরা সেখানে হাজার হাজার পাকিস্তানপন্থীকে হত্যা করছে। লাখ লাখ অবাঙালি ও পাকিস্তানের প্রতি অনুগত মানুষ মৃত্যুর প্রহর গুনছে। সরাসরি শারীরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া বিশ্বসম্প্রদায়ের মৌখিক সহানুভূতি এবং এমনকি বস্তুগত সহযোগিতাও বাস্তবে কোনো কাজে আসবে না। যদি আমাদের কোনো বন্ধুরাষ্ট্র এ ধরনের কোনো সহযোগিতা করতে চায়, তবে সেটা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে করতে হবে। যদি এমন কোনো সহযোগিতা না পাওয়া যায়, তবে আমার সনির্বন্ধ মিনতি হচ্ছে, আপনি আপস করুন, যাতে করে সভ্য ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় এবং লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা পায় এবং অবর্ণনীয় দুর্দশা এড়ানো যায়। যখন যুদ্ধের শেষটা অনিবার্য, তখন এটা কি আমাদের জন্য খুব বড় ত্যাগ হবে? যদি সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহলে যা-ই ঘটুক না কেন, আমরা লড়ে যাব। অনুরোধটা জানিয়ে রাখলাম।

জরুরি ডিটিজি : ০৭১৯২৫/অতিগোপনীয়
হইতে :— সদর দপ্তর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক
বরাবর :— গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তান

প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে গভর্নরের জন্য। আপনার ৭ ডিসেম্বর তারিখে উল্লেখিত এ৬০০৫ নম্বর জরুরি বার্তা প্রসঙ্গে। সম্ভাব্য করণীয় সবকিছুই আমাদের হাতে রয়েছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে সর্বাত্মক ও তিক্ত যুদ্ধ চলছে। বিশ্বশক্তি যুদ্ধবিরতির জন্য খুব জোরালো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার উপর্যুপরি ভেটোর পর বিষয়টি সাধারণ সভায় ওঠানো হচ্ছে। খুব উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল নিউইয়র্কে ছুটে যাচ্ছে। দয়া করে বাকিদের আশ্বস্ত করুন যে ওখানে আপনারা যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন, সেটা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সজাগ আছি। আমার নির্দেশনা মোতাবেক কী সামরিক কৌশল গ্রহণ করা হবে, সেটা নিয়ে জেনারেল নিয়াজিকে সেনাপ্রধান দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। খাদ্য রেশনিং এবং অন্য সব অত্যাবশ্যকীয় জিনিস কাটছাঁট করে ব্যবহারের জন্য আপনার দিক থেকে এবং আপনার সরকারের দিক থেকে এখন একটি শক্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা দরকার, যাতে যুদ্ধ সর্বোচ্চ সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যায় এবং বিপর্যয় ঠেকানো যায়। আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমরা সবাই প্রার্থনা করছি।

জরুরি ডিটিজি ০৯১৮০০
হইতে : গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তান অতিগোপনীয়
বরাবর : সদর দপ্তর প্রধান সামরিক প্রশাসক এ-৪৬০০

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের জন্য। সেনারা হতাশ হয়ে পড়েছে। পশ্চিম দিক থেকে শত্রুরা ফরিদপুরে পৌঁছে গেছে। আর পূর্ব দিকে শত্রুরা কুমিল্লা ও লাকসামে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে এড়িয়ে মেঘনা নদীর কাছে এসে পড়েছে। চাঁদপুর শত্রুর হাতে পতন হওয়ার অর্থ হচ্ছে সব

নদীপথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। যদি কারও সহযোগিতা আসন্ন না হয়, তবে শত্রুরা যেকোনো দিন ঢাকার উপকণ্ঠে এসে যাবে। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিনিধি বেসামরিক নাগরিক, বিশেষ করে অবাঙালিদের জীবন রক্ষার জন্য ঢাকাকে উন্মুক্ত নগর হিসেবে ঘোষণা দিতে পারেন। আমি তাঁর এ প্রস্তাব গ্রহণ করার পক্ষে। এর অনুমোদনের জন্য শক্তিশালী নির্দেশনা প্রয়োজন। জেনারেল নিয়াজি এতে সম্মত নন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাওয়া এবং ঢাকা হাতছাড়া হলে মূল্য চুকাতে হবে—এমনটা মনে করছেন তিনি। এই পদক্ষেপের ফলে সব সশস্ত্র বাহিনী, সিএমএম ও পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ এবং অস্থানীয় ও স্থানীয় অনুগতরা গণহত্যার শিকার হতে পারেন। আমি আবারও আপনাকে অনুরোধ করছি, যাতে দ্রুত যুদ্ধবিরতি এবং রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। অন্যথায় পূর্ব রণাঙ্গন দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে এবং এমনকি পশ্চিম রণাঙ্গন দিয়ে ভারতীয় সেনারা যখন চলে আসবে, তখন সত্যিকারের বিপদ উপস্থিত হবে। অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে ভারতীয় বাহিনীকে স্থানীয় অধিবাসীরা স্বাগত জানাচ্ছে এবং তাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করছে। বিদ্রোহীদের তৎপরতার কারণে আমাদের সেনাদের পক্ষে নিজেদের পশ্চাদপসরণ এবং রণকৌশল প্রণয়ন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব স্পষ্ট বিন্যাসের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের আত্মত্যাগ অর্থহীন।

জরুরি
হইতে : সদর দপ্তর সিএমএলএ ডিটিজি : ০৯২৩০০
বরাবর : গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড

অতিগোপনীয়। জি-০০০১। প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে গভর্নর ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডারের প্রতি। আপনাদের ৯ ডিসেম্বরের গোপনীয় বার্তা এ-৪৬৬০ পেয়েছি এবং সেটার মর্ম পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। আপনারা আপনাদের প্রস্তাবের বিষয়ে আমার সম্মতি চেয়েছেন। আমার পক্ষ থেকে যা কিছু করণীয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সব পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরস্পরের পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতার বিষয়টাকে বিবেচনা করে, পূর্ব পাকিস্তান-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ আপনাদের সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলাম। আপনি যে সিদ্ধান্ত নিন না কেন, সেটার অনুমোদন আমি দেব। একই সঙ্গে আমি জেনারেল নিয়াজিকে নির্দেশনা দিচ্ছি, যাতে তিনি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং সে অনুযায়ী সবকিছুর বন্দোবস্ত করেন। আপনি আপনার বার্তায় বেসামরিক নাগরিক এবং বিশেষ করে সেনাসদস্য ও সিএমএম সদস্যদের অনর্থক জীবনহানি এড়াতে যে প্রচেষ্টার কথা বলেছেন, সেটা এগিয়ে নিতে পারেন। সৈন্যদের সুরক্ষা নিশ্চিতে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে যত ধরনের রাজনৈতিক পথ খোলা আছে, সবটাই গ্রহণ করতে পারেন।

ডিটিজি থেকে পাঠানো বার্তা ১০ অতিগোপনীয় এ-৭১০৭ জরুরি
হইতে : গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তান
বরাবর : সদর দপ্তর, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের জন্য। আপনার ০৯২৩০০ ডিসেম্বরের জি-০০০১ বার্তার

পরিপ্রেক্ষিতে। চূড়ান্ত ও গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করায় আমি জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব পল মার্ক হেনরিকে দেওয়ার জন্য কয়েকটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় (নোট) সাব্যস্ত করেছি। আপনার অনুমোদন পাওয়ার পর সেগুলো তাঁর কাছে হস্তান্তর করা হবে। (নোট শুরু।) পূর্ব পাকিস্তানের কঠিন বাস্তবতায় সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোনো অভিপ্রায় সশস্ত্র বাহিনীর কখনোই ছিল না। যাহোক এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো, যাতে করে সশস্ত্র বাহিনী প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান সরকারের সব সময়ের অভিপ্রায় ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির রাজনৈতিক সমাধান করা, সে ধরনের একটা মীমাংসা এখন সন্নিকটে। বিপুল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে গেছে, এখনো তারা সেই লড়াইটা চালাতে পারে; কিন্তু আরও রক্তপাত এড়াতে ও নিরীহ মানুষের জীবন রক্ষার্থে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো করছি। যেহেতু রাজনীতিজনিত কারণ থেকেই সংঘাতের উৎপত্তি হয়েছে, সেহেতু এর সমাধান রাজনৈতিক উপায়েই হতে হবে। অতএব, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ হিসেবে আমি এখন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ঢাকায় শান্তিপূর্ণভাবে সরকার গঠনের আয়োজন করার আহ্বান জানাচ্ছি। এই প্রস্তাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটা বলার দায়িত্বও অনুভব করছি যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আরও ইচ্ছা হলো, তাদের ভূমি থেকে যেন দ্রুত ভারতীয় বাহিনী চলে যায়। আমি তাই জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, ক্ষমতা হস্তান্তরের শান্তিপূর্ণ আয়োজন যাতে করা হয়। সেই সঙ্গে অনুরোধ করছি (এক.) অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকর (দুই.) পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানে মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন, (তিন.) পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরতে আগ্রহী সব পশ্চিম পাকিস্তানির প্রত্যাবাসন, (চার.) ১৯৪৭ সাল থেকে বসতি স্থাপনকারী সব ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, (পাঁচ.) পূর্ব পাকিস্তানের কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাতে প্রতিশোধমূলক আচরণ করা না হয়, সেটার নিশ্চয়তা দেওয়া। আমি এটা পরিষ্কার করতে চাই যে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এটা আমার পক্ষ থেকে দেওয়া সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব। সশস্ত্র বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রশ্নে যাতে কোনো প্রশ্ন তোলা না হয় এবং তেমন প্রশ্ন যাতে না ওঠে এবং এই প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা না হয়, তাহলে সশস্ত্র বাহিনী শেষ সৈন্যটি বেঁচে থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবে (নোট সমাপ্ত।) জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে এবং তিনি নিজেকে আপনার কমান্ডের অধীনে ন্যস্ত করেছেন। দ্রুত অনুমোদনের জন্য আপনাকে অনুরোধ রইল।

জরুরি ১১০৪৩০ই অতিগোপনীয় জি০০২

হইতে : প্রেসিডেন্ট
বরাবর : গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তান
ইনফো : ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার মেজর জেনারেল ফরমান আলী

পুনরাবৃত্তি করবেন না। আপনাকে পাঠানো শেষ বার্তার ওপর ভিত্তি করে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে অতিগুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ও সামরিক

পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। আরও ৩৬ ঘণ্টা আমাদের অবস্থান যেকোনো মূল্যে ধরে রাখা অত্যাবশ্যক। দয়া করে, এই বার্তা জেনারেল নিয়াজি ও জেনারেল ফরমানকে পৌঁছে দেবেন।

জরুরি ১০ এনআইএল অতিগোপনীয় জি০০০২
হইতে সদর দপ্তর, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক
বরাবর গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তান

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। ১০ ডিসেম্বর আপনার পাঠানো জরুরি বার্তা এ-৭১০৭ প্রসঙ্গে। আপনার পাঠানো বার্তায় যে খসড়া প্রস্তাব আপনি দিয়েছেন, তাতে আপনি আগে যা পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং আমি যা অনুমোদন করেছিলাম, বিষয়গুলো তার থেকে অনেকটা ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষমতা হস্তান্তর, রাজনৈতিক সমাধান এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সেনা প্রত্যাবাসন প্রভৃতি বিষয় আপনি উল্লেখ করেছেন। এই বার্তা এই ধারণা দিচ্ছে যে আপনি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কথা বলছেন। কার্যত, এটার অর্থ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানকে মেনে নেওয়া। চলমান বাস্তবতায় পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে আপনার করণীয় খুবই সীমিত। তাই আপনি এমন একটি খসড়া তৈরি করুন, যেটা আপনার এখতিয়ার মোতাবেক হয়। (উদ্ধৃতি শুরু) ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক আকাশ ও সমুদ্রপথে সম্পূর্ণ অবরোধ করা এবং এর ফলে বেসামরিক নাগরিকের অনর্থক ও নির্বিচার রক্তপাত ঘটছে, তাতে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাকে কর্তৃপক্ষ হিসেবে মনোনীত করেছে। আমি তাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে যদিও পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী শত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়ে গেছে এবং এখন পর্যন্ত তারা সেই লড়াইটা লড়ে যেতে সক্ষম; আরও রক্তপাত ও নির্দোষ মানুষের প্রাণহানি এড়াতে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো করছি :
এক. পূর্ব পাকিস্তানে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড বন্ধে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা
দুই. ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ী হওয়া লোকজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তিন. পূর্ব পাকিস্তানের কোনো লোকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আচরণ না করার নিশ্চয়তা দেওয়া। চার. পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর সব সদস্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
আমি এখানে স্পষ্ট করতে চাই যে পূর্ব পাকিস্তানে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড বন্ধে এর সবগুলোই আমার দিক থেকে দেওয়া নির্দিষ্ট প্রস্তাব এবং সশস্ত্র বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রশ্ন এখানে বিবেচনা করা হবে না এবং সেই প্রশ্ন এখানে তোলাও যাবে না। (উদ্ধৃতি শেষ) এই রূপরেখার মধ্যে আপনি আপনার ইচ্ছেমতো কোনো কিছু যুক্ত বা বদল করতে পারেন। ক্ষমতা হস্তান্তর ও রাজনৈতিক সমাধান, জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদনের একটি বিষয়; এবং সেটা করা হচ্ছে।

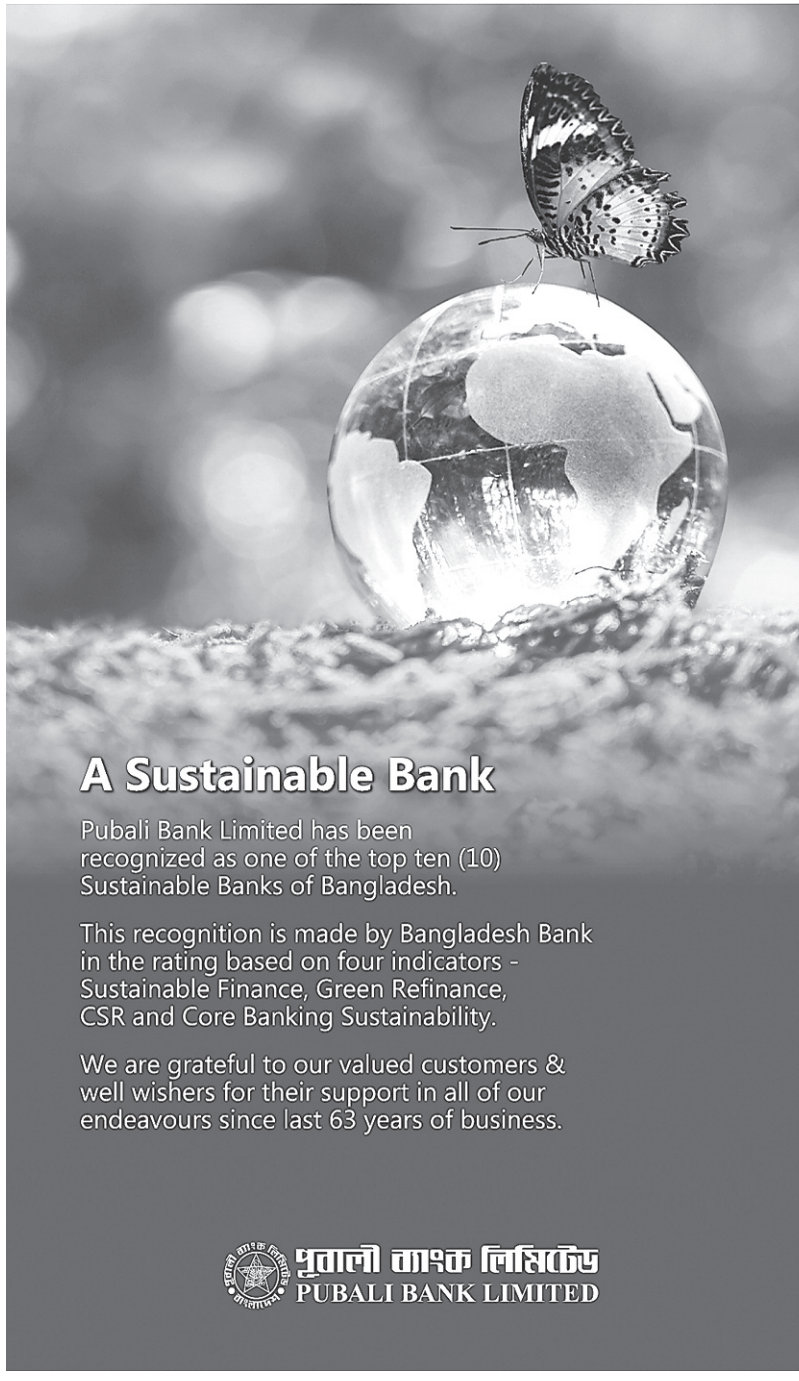
A Sustainable Bank
Pubali Bank Limited has been recognized as one of the top ten (10) Sustainable Banks of Bangladesh.
This recognition is made by Bangladesh Bank in the rating based on four indicators - Sustainable Finance, Green Refinance, CSR and Core Banking Sustainability.
We are grateful to our valued customers & well wishers for their support in all of our endeavours since last 63 years of business.
পুবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED

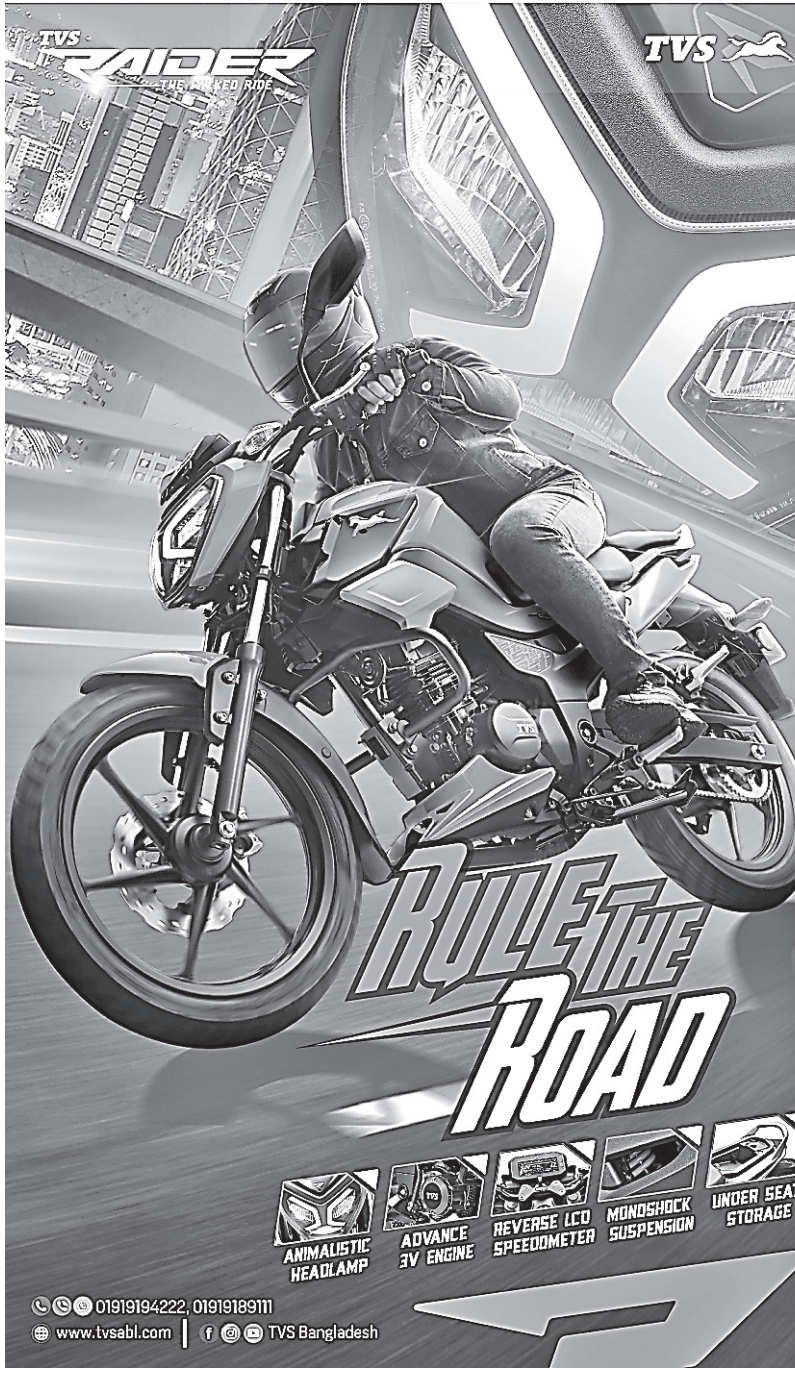
TVS RAIDER
THE ANIMATED RIDE
TVS
RULE THE ROAD
ANIMALISTIC HEADLAMP
ADVANCE 3V ENGINE
REVERSE LCD SPEEDOMETER
MONOSHOCK SUSPENSION
UNDER SEAT STORAGE
01919194222, 01919189111
www.tvsabl.com
TVS Bangladesh

EXPERIENCE LUXURY WITH BANK ASIA CREDIT CARD

VALUE ADDED SERVICES

- Easy Buy Facility @ 0% interest
- Hospital Bill EMI Facility @ 5% Interest (Flat)
- Buy One Get One Free* (BOGO) Facility
- Any POS Purchase EMI Facility @ 9% interest (Flat)
- Complementary Airport Protocol Service Facility*
- Free Balaka Lounge Access Facility*
- Reward Point Redeem Benefits
- Triple Benefit Credit Shield Facility
- Discount Facilities on Renowned Merchant Outlets

WE OFFER

- Minimum Fees & Charges
- No CIB Charge
- Free SMS Service
- Free Supplementary Card

*T&C Apply

cards.bankasia-bd.com
24/7 service 16205

Bank Asia

সেলফিন
আগামীর ব্যাংকিং
চলতে ফিরতে জার্নিতে
ব্যাংকিং করি মনের খুশিতে
■ ইন্সট্যান্ট ভার্চুয়াল প্রিপেইড কার্ড (ভিসা/মাস্টারকার্ড)
■ নিজে নিজে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা
■ সরাসরি বৈদেশিক রেমিট্যান্স গ্রহণ
■ ইউটিলিটি (ডেসকো, ডিপিডিসি, তিতাস ও ওয়াসা) বিল প্রদান
■ ই-টিকেটিং (বাস, এয়ার ও লঞ্চ)
■ রিকোয়েস্ট মানি, এটিএম ক্যাশ আউট
■ ই-কমার্স/মার্চেন্ট পেমেন্ট
■ স্কুল/কলেজ ফিস পেমেন্ট
■ খিদমাহ্ (ক্রেডিট) কার্ডের বিল প্রদান
■ যেকোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট/কার্ডে ফান্ড ট্রান্সফার
■ যেকোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট/কার্ড, এমক্যাশ ও সিআরএম এর মাধ্যমে ইন্সট্যান্ট ক্যাশ ইন
Cellfin
Balance
User Name
Add Money
Fund Transfer
Top Up
Marchant Pay
Cash Withdraw
Bill Pay
Request Money
Remittance
Bank Accounts
Cards
Split a Bill
Complaints
Statement
Offers
Scan to Pay
Location
Referal
এক অ্যাপেই
সকল ব্যাংকিং সমাধান
ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত
www.islamibankbd.com
contact center 16259 or 02-8331090

ধর্মীয় আস্থায় ব্যাংকিং

বিশিষ্ট ইসলামিক ব্যক্তিত্বদের দ্বারা গঠিত স্বাধীন শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি (SSC) কর্তৃক পরিচালিত 'এমবিএল তাকুওয়া' ইসলামিক ব্যাংকিং সারা দেশে ৪৫টি ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে।

তাকুওয়া ইসলামিক ব্যাংকিং সেবাসমূহ

ডিপোজিট প্রোডাক্ট ও স্কিম

- আল-ওয়াদিয়াহ কারেন্ট একাউন্ট (AWCA)
- মুদারাবা সেভিংস একাউন্ট (MSA)
- তাকুওয়া বোনাস সঞ্চয় হিসাব
- মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট একাউন্ট (MTDR)
- মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প
- মুদারাবা স্পেশাল নোটিস ডিপোজিট একাউন্ট (MSND)
- মুদারাবা মাসিক মুনাফা আমানত প্রকল্প
- মুদারাবা দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প
- তাকুওয়া সুপার মুনাফা আমানত প্রকল্প
- তাকুওয়া মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয় প্রকল্প
- তাকুওয়া স্কুল ব্যাংকিং হিসাব

বিনিয়োগ সুবিধাসমূহ

- বাই-মুরাবাহা • বাই-মুয়াজ্জাল • বাই-সালাম
- বাই-ইসতিস্না • মুশারাকা
- হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (HPSM)
- এমবিএল তাকুওয়া আবাসন (HPSM গৃহায়ন বিনিয়োগ)
- কর্জ (Qardh) • আমদানী-রপ্তানী বিনিয়োগ ইত্যাদি

অন্যান্য সেবাসমূহ

- তাকুওয়া ডেবিড কার্ড • তাকুওয়া ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড
- রেইনবো ডিজিটাল ব্যাংকিং
- দেশব্যাপী সকল শাখার সাথে অনলাইন ব্যাংকিং
- BEFTN ও RTGS

বাংলার ব্যাংক

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited
দক্ষতাই আমাদের শক্তি

১৬২২৫

www.mblbd.com facebook.com/mercantile.bd

YANMAR

ACI Motors

ধান ও গম কাটার স্মার্ট সমাধান
ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার

ঘণ্টায় ১.২৫ একর জমির ধান ও গম কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও বস্তাবন্দী করতে সক্ষম

দেশের একমাত্র
স্টিয়ারিং হুইল টাইপ
হারভেস্টার

৪০০++
সার্ভিস টিম দিয়ে
সারা দেশব্যাপী
বিক্রয়োত্তর
সেবা দেয়া হয়

ইয়ানমার হারভেস্টার ক্রয়ের
ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে
১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
সরকারি ভর্তুকি (হাওর এলাকায়
২১ লক্ষ ৭০ হাজার)

এ সি আই মটরস্ যে সব সুবিধা দিচ্ছে

- ফ্রি ড্রাইভার ট্রেনিং
- ১ বছরের ওয়ারেন্ট
- ৩ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা
- দেশব্যাপী খুচরা যন্ত্রাংশের নিশ্চয়তা

স্মার্ট অ্যাসিস্ট রিমোট (এসএআর) সম্বলিত যার মাধ্যমে ঘরে বসে মোবাইলেই মেশিনের প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
/yanmarbd

Customer Care 16533

পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিন যেমনটা আপনার চাই
আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারাবাহিকতায়
এক্সিম ব্যাংকের
আকর্ষণীয় আমানত হিসাবসমূহ
মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ আমানত
' ইহলৌকিক শান্তি-পারলৌকিক মুক্তি'
মুদারাবা হজ্জ আমানত প্রকল্প
'আপনার হজ্জ হোক স্বাচ্ছন্দ্যময়'
এক্সিম রুহামা
'তিন বছরে দ্বিগুণ'*
এক্সিম যিয়াদাহ
'পাঁচ বছরে তিনগুণ'*
শর্ত প্রযোজ্য
এক্সিম শেফা
'প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরাপত্তার আশ্বাস'
• মুদারাবা শেফা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
মুদারাবা মাসিক আয় আমানত প্রকল্প
'প্রতি মাসের মুনাফা যখন উপার্জনের সাথী'
মুদারাবা সুপার সেভিংস আমানত প্রকল্প
'দ্বিগুণ লাভে সমৃদ্ধ আগামীর পথে'
মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস
'আজকের সঞ্চয়, আগামীর আত্মবিশ্বাস'
• মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
• মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী প্রকল্প
মুদারাবা কোটিপতি আমানত প্রকল্প
'সঞ্চয়ে গাঁথা সুদিনের স্বপ্ন'
মুদারাবা দেনমোহর/ বিবাহ আমানত প্রকল্প
'আর তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের দেনমোহর সন্তষ্টচিত্তে দিয়ে দাও'
সুরা নিসা, আয়াত ২৫
আল ওয়াদিয়াহ্ চলতি আমানত
'আমানত থাকুক সুরক্ষিত'
মুদারাবা মেয়াদী আমানত
'মেয়াদ শেষ তো মুনাফা শুরু'
এক্সিম স্বপ্ন
'এগিয়ে যান স্বপ্নপূরণের পথে'
• মুদারাবা হাউজিং / অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প
এক্সিম সিনিয়র
'আমার সঞ্চয়, আমার অবলম্বন'
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক মুনাফা প্রকল্প
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প
মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত
'সঞ্চয়ের শুরু এখানেই'
মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
'মাসিক সঞ্চয়ে বার্ষিক মুনাফা'
এক্সিম কৃষি
'সঞ্চয়ের বীজে বাড়ুক সমৃদ্ধির ফসল'
• মুদারাবা কৃষি মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
**এক্সিম ব্যাংকের সকল হিসাব শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ায় মুনাফার হার কম/বেশি হতে পারে
EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
সবধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246
www.eximbankbd.com

মুজিববর্ষের স্পর্শে

স্পন্দিত রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ

রবি ঠাকুরের

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন - ঘেরা বাড়ি।

আপনার এই চিরন্তন স্বপ্নপূরণে রূপালী ব্যাংক সবসময় পাশে আছে

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন ঃ- সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগ, ৩৪ দিলকুশা, বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা - ১০০০. ফোন- ৯৫৫১৯৯০

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নপূরণে নিবেদিত একটি লাল সবুজ ব্যাংক

www.rupalibank.org

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় বা যেকোনো সংখ্যা থেকে প্রতিচিন্তার গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। এ ছাড়া বিকাশের মাধ্যমেও গ্রাহক হওয়া যাবে (বিকাশ নম্বর : ০১৯৫৫৫৫২০৬৯)। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ৪০০ (চার শ) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ১০০ (একশত) ডলার; দুই বছরের বেলায় যথাক্রমে ৮০০ (আট শ) টাকা অথবা ১৮০ (একশত আশি) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

সরাসরি পাওয়া যাবে প্রথমা প্রকাশনের সব বিক্রয়কেন্দ্রসহ প্রচলিত বইয়ের দোকানে। এ ছাড়া অনলাইনে কেনা যাবে www.Prothoma.com থেকে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬